

আর্মি অফ দাজ্জাল

শিক্ষা, চিকিৎসা, ধর্ম, অর্থনীতি ও অন্যান্য

(৩য় খণ্ড)

সংকলন ও সম্পাদনা: রুহ মাহমুদ

আর্মি অফ দাজ্জাল

শিক্ষা, চিকিৎসা, ধর্ম, অর্থনীতি ও অন্যান্য

(৩য় খণ্ড)

সংকলন ও সম্পাদনা: রুহ মাহমুদ

সূচিপত্র:

ভূমিকা:

অধ্যায়-১: (শিক্ষা ও সংস্কৃতি)

কিভাবে দাজ্জাল পুরো জাতি কে ধোঁকা দিচ্ছে:

Late marriage-দেৱীতে বিবাহের শিক্ষা:

শিক্ষা নয়, বরং মূর্খতা ও অপবিদ্যা:

নটরডেম কখন:

“আমার সোনার বাংলা” | জাতীয় সংগীত নাকি দেবীবন্দনা?

ইসলামের বিরুদ্ধে নতুন চক্রান্তঃ, কোন পথে কওমী সন্তানেরা?

শতাব্দীর সবচে বড় ফিতনা : মডারেট ইসলাম

বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড : ইতিহাস ও আমাদের করণীয়

দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার পার্থক্য:

রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর শিক্ষাদান পদ্ধতি:

শাসনের নীতি:

ইসলামে শিশু নির্যাতন হারাম:

অপসংস্কৃতি:

অপসংস্কৃতি ছড়াচ্ছে টিকটক:

Tik Tok (টিকটক/মিউজিক্যালি) একটি দাজ্জালি ফিৎনা:

ধ্বংসকারী অপসংস্কৃতি ও এর প্রতিষেধক:

অধ্যায়-২: (অর্থ ও বাণিজ্য)

৮ ঘন্টা চাকুরীর বিধান কোথা থেকে আসলো?

আধুনিক দাসত্বের প্রকৃতি ও পরিধি:

কর্পোরেট দাসত্বের সূত্রপাত:

একজন কর্পোরেট দাসের জীবনচক্র:

বনী ইসরায়েল ও মুসলমানদের দাসত্বের জীবনের প্রতি অনুরাগ:

দাজ্জালি মুদ্রা ব্যবস্থা : (ক্রিপ্টো কারেন্সি বা বিট কয়েন)

দিনার ও দিরহাম- আল্লাহর অশেষ এক নিয়ামত:

টাকায় কেন লেখা থাকে ‘চাহিবামাত্র ইহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে’

& দাজ্জালি ফেতনা:

বাণিজ্যখাত নিয়ে দাজ্জালি চক্রান্ত:

শেয়ার বাজারের ধাপ্লাবাজি:

অধ্যায়-৩: (স্বাস্থ ও চিকিৎসা)

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান দাজ্জালের ফেতনা থেকে মুক্ত নয়।

মেডিকেল ও বাণিজ্যে কাডুসিয়াস:

চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রতীক হিসেবে সাপ ও লাঠি: গ্রীক মিথলজি!

আধুনিক মেডিকেল সাইন্স নাকি উইচক্রাফট (জাদু)? চিত্র:

কী খাচ্ছি, ট্যাবলেট নাকি জাদুমন্ত্র? (চিত্র):

প্রেস্ক্রিপশনে (দাজ্জালি ব্যবস্থাপত্রে) হোরাস আই বা RX:

ফার্মা, নাকি উইচক্রাফট বা সর্স্যারিস (জাদুবিদ্যা)?

কাফেররা কেন আমাদেরকে টিকা দিতে এত তৎপর?

পোলিও টিকাতে মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয় বানরের কিডনি:

আপনার শিশুকে টিকা দিতে চান? তার আগে সত্য জানুন!

আকিকা Vs টিকা :

টিকা নিলেও সমস্যা, না নিলেও সমস্যা। করণীয় কি?

এন্তেঞ্জা, লজ্জাস্থানের রোগব্যাধির কারণ (সুন্নাহ বনাম আধুনিকতা):

মেসওয়াক (বিজ্ঞান / সুন্নাহ) VS টুথপেস্ট ও টুথব্রাশ (অপবিজ্ঞান):

অপবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার বিকল্প ইসলামিক (সুন্নাহ) চিকিৎসা:

নববী চিকিৎসা: কিছু প্রয়োজনীয় আলোকপাত

কুরআন দিয়ে নিজের চিকিৎসা করুন

রাসূল সা:- এর চিকিৎসা বিধান

ইসলামের দৃষ্টিতে শিঙ্গা ও কাপিং (হিজামা) থেরাপি:

হিজামা (حِجَامَة) একটি নববী চিকিৎসা ব্যবস্থা।

হিজামা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। এটি কি আসলে উপকারী কোন

চিকিৎসা?

মুখতাসার রুকইয়াহ শারইয়্যাহ/ সারসংক্ষেপ রুকইয়াহ শারইয়্যাহ!

যাদুটোনা থেকে নিরাময়ের উপায়

বদনজর— যা মানুষকে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে দেয়

হাদিসে বর্ণিত কিছু ঔষধি খাবার

হাদিস, আজওয়া খেজুর এবং বিজ্ঞান:

১৪০০ বছর আগে হযরত মুহাম্মদ সা: এর দেয়া চিকিৎসা পদ্ধতি:

উপসংহার:

uploaded in HD @ TunesToTube.com

Sabbatai Zevi, Isaac Luria, & Jacob Frank

Henry Makow

CHABAD MAFIA

All Roads Lead To The (Kabbalistic) Jews!

The Unholy Trinity

Jacob Frank Adam Weishaupt A.M. Rothschild

Very few have ever heard of Sabbatai Zevi, who declared himself the Messiah in 1666

By proclaiming redemption was available through acts of sin, he amassed a following of over one million passionate believers, about half the world's Jewish population during the 17th century.

They eschewed all morality preaching that good is evil and vice-versa. They believe that chaos and devastation will hasten the return of the Messiah. They went underground and prospered by intermarrying with non-Jews and assuming conventional Jewish or non-Jewish identities.

The world is in the thrall of this satanic cult. The correct paradigm is humanity versus this cult, its agents and dupes. Unfortunately these are often people society considers a 'success.'

ভূমিকা:

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য। উনার ইচ্ছাতেই ১ম ও ২য় খন্ডের পর এখন ৩য় খন্ড আপনাদের সামনে হাজির করতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ। যারা আগের দুই খন্ড পড়েননি, তারা প্রথমেই ওই দুই খন্ড পরে নিন। এতে বুঝতে সুবিধা হবে, ইনশাআল্লাহ।

লিংক: <https://toorpaahaar.blogspot.com/2021/03/pdf.html>

প্রচ্ছদ দেখেই নিশ্চই বুঝে ফেলেছেন এই খন্ডে কোন বিষয়গুলোকে একত্রিত করা হয়েছে। বরাবরের মতোই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য আর্টিকেলকে এখানে সংকলন করা হয়েছে। আমার (রুহ) নিজেরও অনেক লিখা আছে। আর টীকা তো আছেই। তাই আমার জন্য এবং অন্যান্য লেখকদের জন্য দোআ করবেন।

আর যেহেতু আমরা মানুষ। সুতরাং আমরা ভুল ত্রুটির উর্ধে নোই। সকল ভুল ত্রুটির জন্য অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। অফিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই কাজ গুলো করতে হয়। তাই অনেক অসঙ্গতি হয়তো আপনাদের দৃষ্টিগোচর হবে। সেগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এবং আমাকে জানিয়ে সংশোধন করার সুযোগ দিবেন বলে আশা করি।

আমার পেজ লিংক: <https://www.facebook.com/Rooh-Maahmood-105878831575422/>

-Rooh Maahmood-



অধ্যায়-১: (শিক্ষা ও সংস্কৃতি)

খুব প্রচলিত একটি কথা হচ্ছে, "শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড"। সুতরাং, কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে হলে শিক্ষাকে ধ্বংস করে দিতে হবে। তাহলে, ওই জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে এবং ওই জাতি পঙ্গুতে পরিণত হবে। আর দাজ্জালের বাহিনী এটা খুব ভালো করেই জানে। তাইতো ওরা উঠে পরে লেগেছে সকল জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়ার জন্য। এই অধ্যায়ে আমরা এটাই জানবো যে দাজ্জালের আর্মি কিভাবে অপসংস্কৃতি ও অপশিক্ষার মাধ্যমে মানবতাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

কিভাবে দাজ্জাল পুরো জাতি কে ধোঁকা দিচ্ছে:

দাজ্জাল সর্ব যুগে কিছু ব্যবস্থা বা পদ্ধতি (System) তৈরি করে যাতে আমরা সবাই সে ব্যবস্থায় জড়িয়ে প্রযায়ক্রমে কুকর্মে লিপ্ত হয়ে নিজের অজান্তেই

ইমানহারা হয়ে যায়। যেমন এমন একটা অর্থব্যবস্থা তৈরি করেছে যার ফলে আমরা সবাই এক রাতেই দাসে (Slave) পরিনত হয়েছি, বা এমন বিনোদন পদ্ধতি যার ফলে আমরা সবাই বাস্তবতা থেকে দূরে সরে কাল্পনিক জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছি, বা এমন রাস্ট্রব্যবস্থা যার ফলে আমরা সবাই আল্লাহ কে অস্বীকার করছি, বা এমন একটা আন্দোলন হতে পারে নারীবাদীতা যার ফলে শাহজাদী হালতে থাকা আমাদের মা, বোন, স্ত্রীরা সবাই আধুনিকতায় গা ভাসিয়ে তাদের লজ্জাশীলতা কে বিসর্জন করেছে। আমরা অবাক হোই যখন দেখি কি একটা অদ্ভুত উপায়ে এই শেষ ২ শতাব্দীতে কিছু ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে যা আমাদের অতীতের সকল system বা ব্যবস্থা কে (Replace) বদলে দিয়েছে, আমরা এটাকে রহস্যময় পরিবর্তন (Mysterious Transformation) বলতে পারি। যেমন পুরো দুনিয়ায় একই রাস্ট্রব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, নারীবাদীতা, একই শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রায় একই রকম কাপড়, খাবার ও কাজ করার পদ্ধতি এবং প্রায় একই সংস্কৃতি। এইগুলো কি এমনি এমনি হয়ে গেছে?

আরও অবাক হোই যখন দেখি কি ভাবে একটা দেশ ব্রিটিশ (British Colonialism) প্রায় পুরো বিশ্বকে দখল করে এবং বিশাল সাম্রাজ্য তৈরি করে, আর ঠিক সেই সময়ে তারা পুরো বিশ্বে উপরুক্ত System গুলো বাস্তবায়ন করে।

তারা দখলকৃত দেশে এমন সংস্থা (Organization) কায়েম করে যারা ব্রিটিশদের অনুপস্থিতিতেও তাদের মত করেই সকল কিছু পরিচালনা করে যাবো। এবং যতপর্যন্ত ব্রিটিশরা এটা নিশ্চিত হলো না যে পুরো বিশ্ব কে তাদের কার্বন-কপি বানানো হয়ে গেছে, ততপর্যন্ত তারা এই দেশ গুলোকে ছেড়ে (Decolonized) যাই নাই।

বর্তমানে আমরা ঠিক সেই রকমই দেখছি আমরা একবারও ভেবে দেখি না — কেন তারা চলে যাওয়ার পরও তাদের নিয়মেই দেশ চলছে? কেন একজন কোন তীব্র গরম দেশের মানুষ কেও তাদের মত সুট টাই পরে সভ্য হতে হবে? কেন আমাদের সকল কে একই ভাবে খেতে হবে? কেনই বা এই সকল নিয়মকেই সভ্য (Civilized) হওয়ার মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়েছে? কেন তারা পুরো দুনিয়া কে তাদের কার্বন-কপি বানিয়েছে? আর এই গুলো সকল কিছু তৈরি করার পিছনে মূলত দাজ্জালই কলকাঠি নাড়ছে।

দাজ্জালের প্রথম মিশন হল সকল মানুষকে পরীক্ষা করা, ঈমানহারা করে দেয়া। আর এটা সহজ করার জন্য তার অনুসারীরা একক ও নতুন বিশ্ব বিন্যাস (NEW WORLD ORDER)। অর্থাৎ একই নীতি, মতবাদ ও ভাষা, মুদ্রা, সংস্কৃতি, Education system সকল কিছু একই করার পরিকল্পনা নিয়েছে। আর এটার অংশ হিসেবেই আমাদের মাথায় ধর্মনিরপেক্ষবাদের (Secularism) বীজ ঢুকানো হয়েছে। অথচ আমরা একটুও খেয়াল করছি না যে এই ধর্মনিরপেক্ষবাদের শেষ গন্তব্য হলো দাজ্জাল। সকল ধর্মের পরিচয় মুছে ফেলা হচ্ছে। যাতে দাজ্জাল আসার সময় কোন ধর্ম বা মতবাদ না থাকে এবং দাজ্জাল সহজে নিজেকে আল্লাহ দাবী করে নিজের মতবাদ আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে।



Late marriage-দেরীতে বিবাহের শিক্ষা:

ইসলামের বিরুদ্ধে শতাব্দীর এক ষড়যন্ত্র!!

কাফেরা অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখলো যে, শুধু অস্ত্র দিয়ে মুসলিমদের হত্যা করে পরাজিত করা সম্ভব নয় কেননা মুসলিমরা তো আল্লাহর পথে শহীদ হওয়াকেই তাঁদের চূড়ান্ত সফলতা মনে করে। তাছাড়া যাদের একমাত্র লক্ষ্যই হচ্ছে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া আপনি তাঁদেরকে কিভাবে থামাবেন, তাই কাফেরা চিন্তা করলো মুসলিম যুবকদের নৈতিকভাবে ধ্বংস করে দিতে হবে কেননা নৈতিক তাই হচ্ছে মুসলিম যুবকদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এ অস্ত্রের জোরেই তারা আল্লাহর পথে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তাই তারা প্রথমে মুসলিম দেশগুলোতে বিবাহের উপর একটি নির্দিষ্ট সময় সীমা বেধে দিলো যে, এর আগে বিয়ে করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ যদিও একটি ছেলে এবং মেয়ে এই নির্দিষ্ট সময় সীমার অনেক আগেই বিবাহের উপযুক্ত হয়।

সেই সাথে তারা এমন শিক্ষা ব্যবস্থাও চালু করলো যে, এই শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা ছেলে চাইলেও ২৮-৩০ বছরের আগে উপার্জন ক্ষম হতে পারবেনা। যদিও একটা ছেলে ১৫ বছর বয়সেই যৌবনপ্রাপ্ত হয়। তাহলে একটা ছেলে যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার পরের ১৫ টি বছর কিভাবে পাড়ি দিবে??

N:B:(এই কুশিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা মানুষকে আধুনি দাস বা কর্পোরেট দাস বানিয়ে ফেলার ষড়যন্ত্রের আলোচনা থাকছে "অর্থ ও বাণিজ্য অধ্যায়ে")

এই জন্যে কাফেররা ব্যাপক হারে পর্ণ ছবি ছড়িলে দিলো, বিবাহপূর্ব প্রেম ভালবাসাকে ছড়িয়ে দিলো। যুবকদের যুবতীদেরকে একটা মেসেজ দিলো যে, "এই

নাও পর্ণ ছবি। এগুলো দেখো। এগুলো দেখ, উত্তেজিত হও। উত্তেজিত তো হয়েছে। কিন্তু এখন কি করবে??

বিয়ে তো করতে পারবেনা। তাহলে প্রেম করো, প্রেম করে প্রেমিকার সাথে সেক্স করো, যৌবনের চাহিদা মেটাও। আর যে যুবক প্রেম করবে, পর্ণ দেখবে, প্রেমিকার সাথে অবৈধ সেক্স করবে সেই যুবক কি কখনো আল্লাহর রাস্তায় কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার কথা চিন্তা করবে??

কমিশকালেও না।

এভাবেই কুফ্যাররা মুসলিম যুবকদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, আমাদের যুবকদের জীবনী শক্তিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

শিক্ষা নয়, বরং মূর্খতা ও অপবিদ্যা:

শিক্ষাব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক কাঠামো কুফ্যাররা এমনভাবে নির্মান করে সকলকে আটকে ফেলেছে, যে তা থেকে বেরোনোর সহজ রাস্তা নেই। একজন শিক্ষার্থী ১ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত কি শিখছে?

উচ্চমাধ্যমিকে কি শিখছে? স্নাতক নিচ্ছে কিসের উপর? যা দীর্ঘ চারবছর গিলছে তাতে আছে কি? আগের নীতি ছিল বিরাট প্রশ্ন মুখস্ত করো, এরপরে পরীক্ষার খাতায় কলম দিয়ে বমি করো। এখন অবশ্য আরো এডভ্যান্স - সৃজনশীল এসে

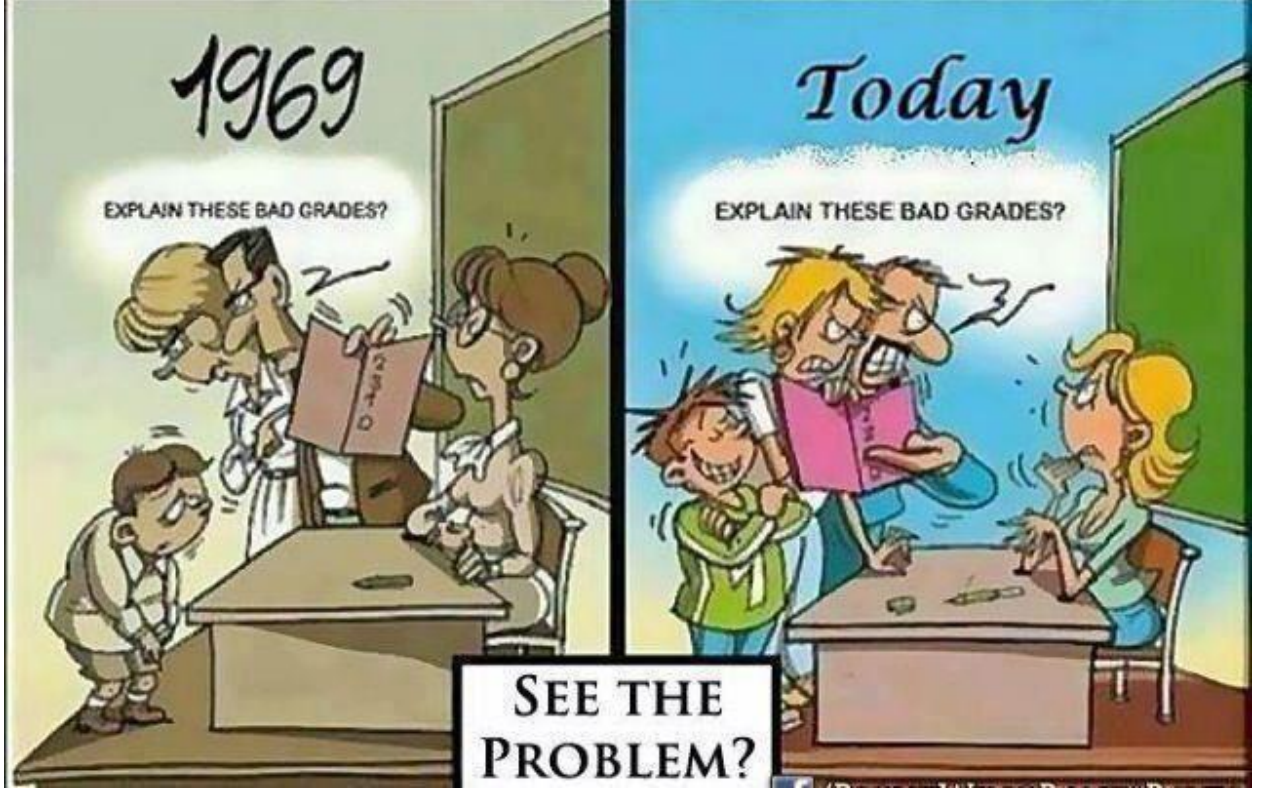
গেছে।

নিরক্ষররা মনে করে 'শিক্ষিত'রা জানি কত কি জানে! কিন্তু আসলে যে বিদ্যা এতদিন গিলেছে তা এমনই অপ্রয়োজনীয় বাতিল বিষয় যার মাঝে কোন কল্যাণ নেই। কোন শিক্ষাও নেই। কোন কবি সাহিত্যিক কি লিখেছেন, কবে লিখেছেন, কবে মরেছেন এসব জেনে কি লাভ? /! এসব অচল বিষয়বস্তু কোন কাজেই লাগে না। বিজ্ঞান বিভাগে পড়ে অনেক কিছুই গিলছে কিন্তু এর কত% প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জন করছে! ইতিহাস বিভাগেও আবর্জনাময় ইতিহাস গিলছে, এরকম প্রায় সকল বিভাগে। ওই শিক্ষাব্যবস্থা নেই যা কর্মমুখী।

আপনাকে কর্মমুখী হবার পূর্বে আরেকবার আবর্জনা খেতে হবে। মানে চাকুরী অন্বেষনে। হাজার হাজার আজীবাজে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন মুখস্ত করুন, দু চার দশটি এরকম আবর্জনা বিষয়বস্তুতে বোঝাই জিনিস দ্বারা মাথা পূর্ণ করুন। এরপরে আপনার লাখ-কোটি ভাইবোনদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষে যদি চাকরি মেলে, ঘুষ-সুপারিশ বাদ দিলাম। আপনাকে 'মেধায়' এগিয়ে যেতে হলে যা করতে হচ্ছে তা বললাম। আবর্জনাপূর্ণ মস্তিষ্কই হচ্ছে মেধা! জ্বি, একেকজন বিসিএস ক্যাডারগন এর ব্যতিক্রম নয়। তিনিও রামায়ন মহাভারতের লেখক কে, বাপের নাম কি, কোথায় থাকতেন ইত্যাদি আবর্জনা পূর্ণ করে ক্যাডার সেজেছেন। এমন কিছু শিখে মোটা অঙ্কের টাকা কামাচ্ছে যার বাস্তব জীবনে কোন

ভিত্তি নেই, কোন প্রায়োগিক অংশ নেই। নেই কোন কর্মমুখী কারিগরি শিক্ষা।

ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে "ষাড়ের বিষ্ঠা"।



বিসিএস ক্যাডারগন যে মাস্বেজাম্বে জিনিস মুখস্ত করে ক্যাডার হয়ে কাজ করছেন তা কতটুকুন তার পেশায় কাজে লাগছে! ওনার এডুকেশনাল গোটা ব্যাকগ্রাউন্ড এবং কর্মক্ষেত্র পুরোটাই তো ফ্রডুলেন্ট! শিক্ষাগত স্ট্যান্ডপয়েন্টে দেখলে ওনার চেয়ারে একজন সাধারণ লোক বসলেও দায়িত্ব পালন করতে পারে। কি মূল্য এর!! গোটা দেশের প্রায় সব কিছুই চলছে এরকম মূল্যহীন আবর্জনার উপর, যাকে মেধা বলা হয়। মেধার এই সুরতের জন্য চাকরি খাত পূর্ণ হলে মেধাধারীরা বেকার থাকে। কারন শিক্ষাটা ছিলনা কর্মমুখী, ছিলনা কোন কারিগরি

বিদ্যা। আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে একরকম নির্ভরশীলতার নীতির ফাদে আটকে দেওয়া হয়েছে। এমন এক ম্যাট্রিক্স যার বাহিরে যাবার সুযোগও নেই। যুগ যুগ চলতে থাকবে। আর ওই ক্যাটেলগুলোকে(গবাদি পশু) মেধা টাইটলে স্কুল কলেজের খোয়াড়ে আটকে রেখে মেধার নামে আজীবন ক্যাটল বানিয়ে রাখছে। এর বাহিরে চিন্তা করার সুযোগ নেই।



শিক্ষাব্যবস্থার ডিজাইনারগনও ভালভাবে জানেন কি করে শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো চ্যালেঞ্জিং-আরো বাহ্যিকভাবে ভারী দেখানো যায়। একটা ছাত্র ১০/১২ বছর ইংরেজি পড়ছে এরপরেও ইংরেজিতে শুদ্ধভাবে বলা- লেখা তো দূরের কথা উলটা ইংরেজি-ফোবিয়ায় ভুগছে! এর কারন ভাষা শিক্ষার নীতির ভন্ডামি।

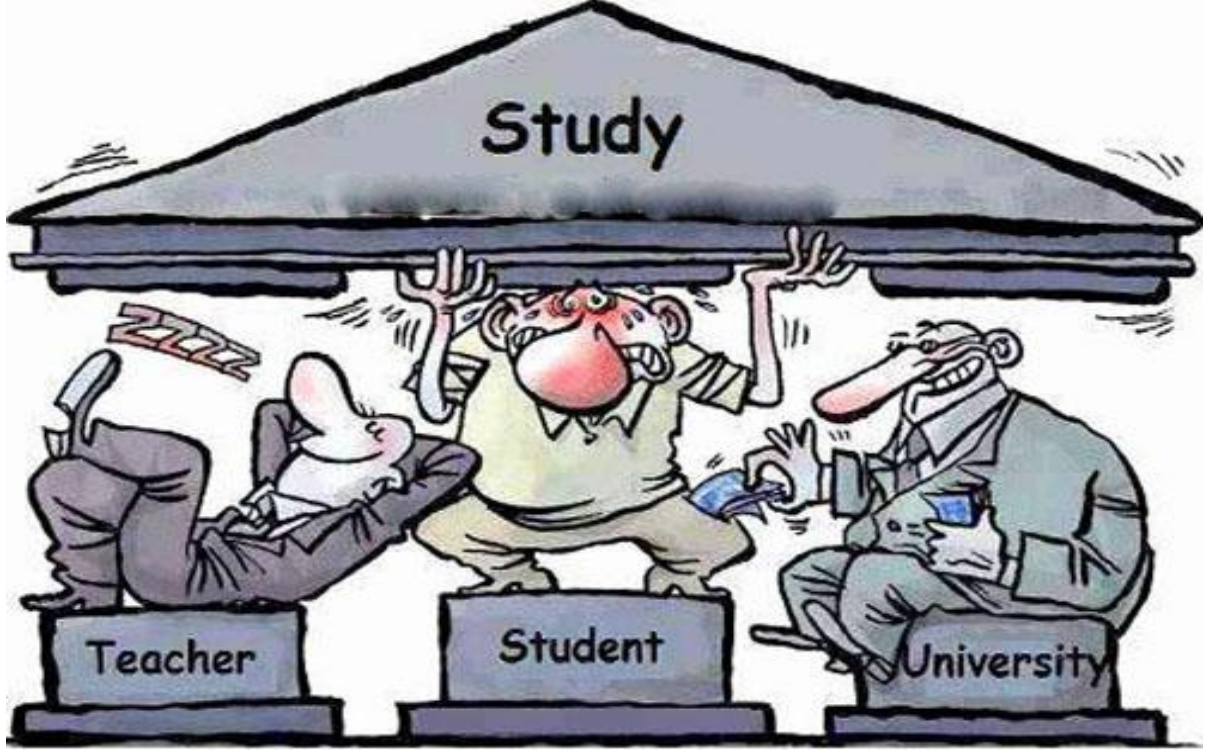
শেখাচ্ছে গ্রামার ট্রান্সলেশন- **GTM** ম্যাথড। একটা বাচ্চা ভীনদেশী ভাষা শিখছেই ব্যাকরণ দিয়ে স্টার্ট করে,যেখানে মানুষ মৌলিকভাবে ভাষায় পারদর্শী হয় ন্যাচারাল এপ্রোচ(**DM**) দ্বারা। এভাবেই প্রথম ল্যাঙ্গুয়েজ অর্জন করে। আপনি যখন বাংলা শিখেছেন আপনাকে কি প্রথমেই ব্যাকরণ খাওয়ানো হয়েছিল?!!

অথচ জিটিএম ম্যাথড দিয়ে কম্পিটেন্স চাচ্ছে ন্যাচারাল এপ্রোচের। চাকুরী ক্ষেত্রেও তাই। এজন্য সারাজীবন ইংরেজি দেখলে কাপাকাপি/দাতের পাটি খুলে যাওয়া, হীনমন্যতা। দু একজনের **LAD(language acquisition device)** উন্নত হবার জন্য সেভাষার উৎকর্ষতা সেটা কখনোই আদর্শমান হতে পারে না, এবং সবার জন্য অনুকরণীয় হতে পারে না।

উপায় নেই... সারাজীবন দৌড়াও, সংগ্রাম করো খাতা কলম আর বই নিয়ে। ৩০ বছর পার কর, অতঃপর বিয়ে কর, বাচ্চা হলে তাকেও একই খোয়াড়ে পোড়ো, বাবা তোমাকেও বিরাট অফিসার হতে হবে, লেখাপড়া করে যে গাড়িঘোড়ায় চলে সে...। সে বড় হতে হতে বৃদ্ধ হও এবং কবরে যাও। নো হায়ার পারপাজ। 😊
:) চমৎকার ম্যাট্রিক্স, তাই না! কারা তৈরি করে দিয়েছে?

এজন্য এখন যত উচ্চ শিক্ষিত দেখি তত বড় হিউম্যানয়েড গাধা দেখতে পাই। যত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তত বেশি অনুগত গবাদিপশু। খোয়াড়ের বাহিরে কোন চিন্তাই ছিল না বলে আজ সে মস্তিষ্কভর্তি গাঁদ নিয়ে এত বড় চেয়ারে বসে

আছে।এর তুলনায় তাওহীদবাদি চা-ওয়ালা, শরবত ওয়ালারা আমার কাছে অনেক
জ্ঞানী, অনেক বেশি সম্মানের।



কুফ্যারদের উন্নত দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থা দেখেছেন? কর্মমুখীতা বেশি। শিক্ষিত
হওয়া মানে শিক্ষণীয় কিছু জানে যা বাস্তব জগতে প্রডাক্টিভ। আমাদের দেশের
অমুকের জন্মসাল, কি বলেছে, করেছে সেসব নিয়ে সারাজীবন নষ্ট করায় না। যে
কেউ যেকোন বিভাগে পড়াশুনা করে ইচ্ছামত ওয়ার্কস্টিফ্যারে যেতে পারে
সেব্যপারে সর্বশেষ স্নাতকও নিতে পারে। এদেশের মত এমনটা নয় যে যে
আপনাকে কমার্স পড়ে ব্যবসায়-বানিজ্য নিয়েই থাকতে হবে। ওরা নিজেদের
বেলায় ঠিক রাখছে, কিন্তু যারা ওদের মত হতে চায় তাদেরকে একটা গ্যাডাকলে

আটকে দেয়। ওদের এজেন্টরাই লোকাল পর্যায়ে নীতিমালা বাস্তবায়ন করে।
 বিঃদ্রঃ মনে করবেন না ইংরেজী ভাষার আগ্রাসনকে সমর্থন করি, ইংরেজীর
 আগ্রাসন কুফফারদের প্রভাব প্রতিপত্তিকেই সুস্পষ্ট করে।
 শিক্ষার সকল বিভাগের সকল বিক্ষিপ্ত অংশকেই রিজেক্ট করি না। গার্বের
 মাঝেও সামান্য প্রয়োজনীয় বিষয় আছে।

ব্যক্তিগত অজ্ঞারভেশনে একটা গ্রন্থকেই কিতাবুন নূর রূপে পেয়েছি। সেটি
 আমাদের কুরআন। যাবতীয় শিক্ষা একে ঘিরেই হওয়াটা গ্রহণযোগ্য। বর্তমান
 প্রতিষ্ঠিত আর্থ-সামাজিক স্ট্রাকচার পরিবর্তন চাইলে সব কিছু ঢেলে সাজানো ছাড়া
 রাস্তা নেই। আর সেটা একটা কুরআনিক কম্পটিটিউশনে ওয়ান ওয়ার্ল্ড গভার্নমেন্টের
 দ্বারা সম্ভব। সেটা - খিলাফা আলা মিনহাজিন নাব্যুওয়্যাহ | কুফফারদের পক্ষ
 থেকেও ওয়ান ওয়ার্ল্ড অর্ডারের প্রস্তাব রয়েছে, ওদের প্রত্যাশা সেটা হবে
 দাজ্জালের নেতৃত্বে। আমরা যে সোস্যাল ইকোনমিক স্ট্রাকচারে বন্দী সেটা ওই
 ফলস মিসায়াহরই প্রতিনিধিদের গড়া।

নটরডেম কথন:

মুশরিকদের পরিচালিত ‘নটরডেম’ কলেজ নিয়ে এই জেনারেশনের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের এক প্রকার নেশাখোরদের মতো আচরণ লক্ষ্য করা যায়। এই কলেজে পড়লে নিজেদের ঈমানের ক্ষতি হলেও তারা এখানে অধ্যয়নের জন্য এক পায়ে লাফায়, যেমনটা নেশাখোররা নিজেদের ক্ষতি হবে জেনেও নেশা ছাড়তে পারে না। এই জেনারেশনের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা এই কলেজ নিয়ে এক প্রকার ফ্যান্টাসিতে ভুগে, কেননা এতে সমাজের চোখে মান-মর্যাদা ও খ্যাতি অর্জন করা যায়। তাছাড়া এখানে পড়লে শিক্ষার্থীরা টিউশনি করে মোটা অঙ্কের টাকা ঘরে নিয়ে আসতে পারে, এই কারণে যেসব অভিভাবকরা দুনিয়ার স্বার্থে নিজেদের সন্তানকে পুজি করে বুড়ো বয়সে ভালো থাকার ব্যবসা করে তাদেরও অনেক লাভ। এ কারণে তারা সহজে লোভ সামলাতে পারে না। কিন্তু এসবের বিনিময়ে তারা নিজেদের সবচেয়ে বড় সম্মান ও সম্পদ এবং আল্লাহর দেওয়া শ্রেষ্ঠ নিয়ামত ঈমানকে নষ্ট করে ফেলছে না তো?

কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা হলো ‘হলিক্রস সংঘ’(পড়ুন unholy cross, অপবিত্র ক্রুশ। ক্রুশকে পবিত্র বলা কুফর) এর ধর্মযাজকরা।

এই পর্যন্ত প্রিন্সিপলদের লিস্ট দিলাম। সবাই আল্লাহর শত্রু-

John J. Harrington, 1949–54

James L. Martin, 1954–60

Theotonius Amal Ganguly, March 1960 – October 1960

William Graham, 1960–67

John Vanden Bossche, 1967–69

Joseph S. Peixotto, 1969–70

Richard Timm, 1970–71

Ambrose Wheeler, 1971–76

Joseph S.Peixotto, 1976–1998

Benjamin Costa, 1998–2012

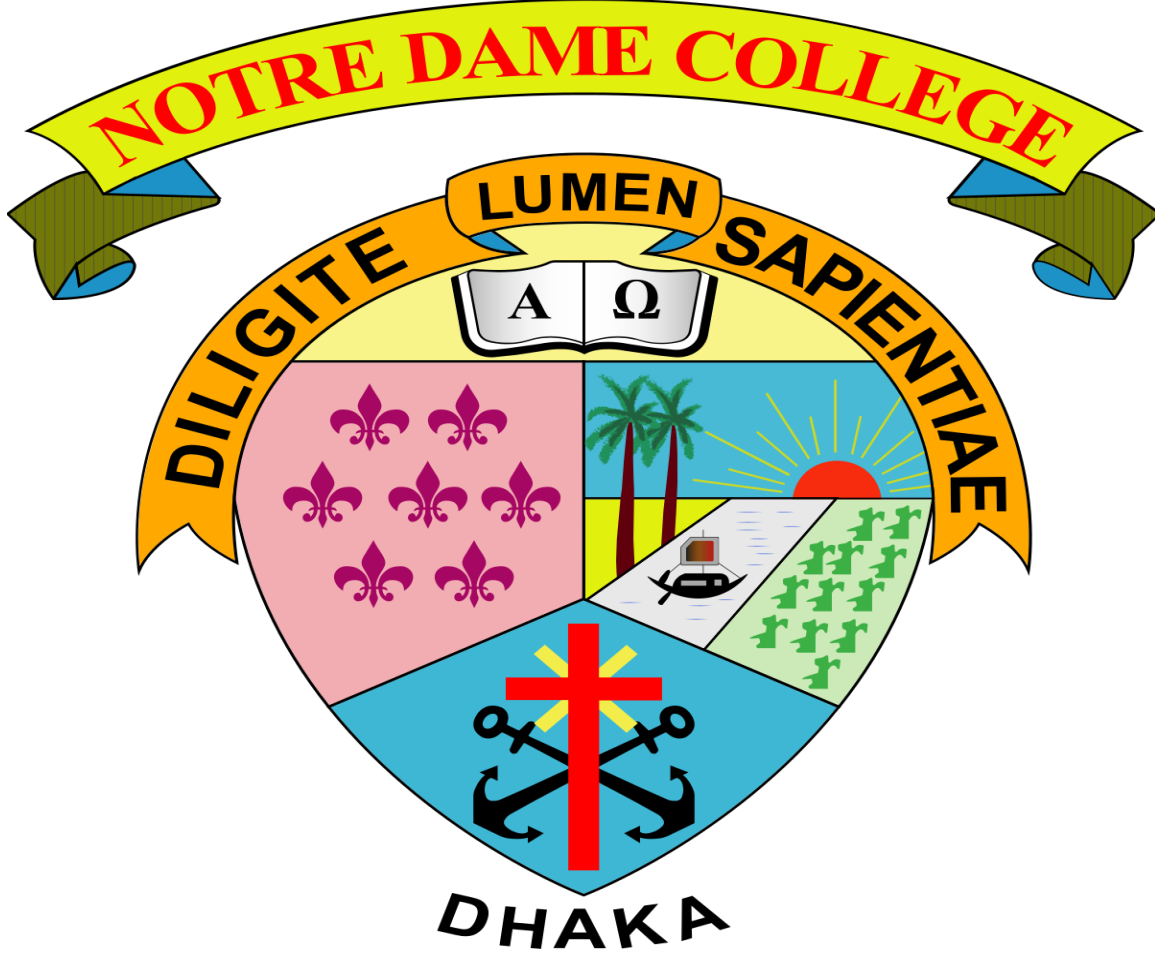
Dr. Fr. Hemanto Pius Rozario, 2012-present

নটরডেমের নামকরণ থেকে শুরু করে লোগো, কিংবা ভবনের নাম, লাইব্রেরির নাম- অর্থাৎ সবকিছুতেই এক্স আহলে কিতাব, কিন্তু এখনকার মুশরিক খ্রিস্টানদের আকিদাগত সম্পর্ক রয়েছে।

যেমন ফরাসি শব্দ নটরডেমের অর্থ হলো 'Our Lady'। ক্যাথলিকরা আওয়ার লেডি বলতে তাদের ভাষায় মেরিকে বুঝিয়ে থাকে। কলেজের নামটি রাখা হয় ম্যারিকে উদ্দেশ্য করেই।

“কলেজের মূলনীতি হলো: Diligite Lumen Sapientiae, যার অর্থ জ্ঞানের আলোকে ভালোবাসো। ক্যাথলিক ধর্মমতে, যিশুখ্রিস্টের মা ম্যারি হলেন জ্ঞানের প্রতীক। "জ্ঞান" (Sapientiae) শব্দটি কলেজের মুখ্য উদ্দেশ্য একাধারে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানের উৎস স্রষ্টাকে লাভ করার প্রতি ইঙ্গিত করে। "আলো" (Lumen) শব্দটি দ্বারা অন্ধকারকে দূরীভূত করা ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করতে পারার প্রতি ইঙ্গিত করে। আর "ভালোবাসো" (Diligite) শব্দটি দ্বারা ভালোবাসার সাথে জ্ঞান আহরণের প্রতি ইঙ্গিত করে।” (উইকি)

প্রতীকের বিবরণ- নটরডেম কলেজের প্রতীকটিতে বলতে পারেন খ্রিস্টানদের শিরকি আকীদাহ সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।



১/ প্রথমেই চোখে পড়ে একটি নোঙর ও অপবিত্র মূর্তি ক্রুশ। এর অর্থ হলো- “ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে যিশুখ্রিস্টের মৃত্যু যেমন মানব জাতিকে মুক্তি এনে দিয়েছিলেন, তেমনি ক্রুশার্পিত সেই যিশুকে নোঙরের ন্যায় আঁকড়ে ধরে পরিত্রাণ লাভ সম্ভব। নোঙর আশার প্রতীক। ক্রুশ থেকে চারদিকে যে আলো ছড়িয়ে পড়েছে, তা যিশুখ্রিস্টের আলো ও মহানুভবতার প্রতীক।” (উইকি)

এখন ভেবে দেখুন ইউনিফর্মের বুকে শিরকের সিম্বল নিয়ে সেখানে অধ্যয়ন করবেন কিনা। এতেই আপনার ঈমানের দৃঢ়তা বুঝা যাবে।

২/ এছাড়াও রয়েছে সাতটি পদ্মফুল। এই সাতটি পদ্মফুল তাদের আকীদাহ মতে

ম্যারির জীবনে সাতটি শোককে সিম্বোলাইজ করে। এজন্য তাকে তারা ‘সপ্তশোকের জননী’ উপাধি দিয়েছে।

৩/ খোলা বইয়ে লিখিত দুটি গ্রিক অক্ষর ‘আলফা’ এবং ‘ওমেগা’ দ্বারা বাইবেলের apokalyptis অধ্যায়ের তথাকথিত যীশুর একটি উক্তির দিকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইউনিফর্মে এই মনোগ্রাম পড়া বাধ্যতামূলক।

তথ্যসূত্রঃ

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Notre_Dame_College,_Dhaka

<http://notredamecollege-dhaka.com/>

I.

কুফফারদের কোনো শে’আরের সাথে সাদৃশ্যতা গ্রহণ নিঃসন্দেহে কুফরে আকবর।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

“যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের তাশাবুহ অবলম্বন করবে সে আমাদের কেউ হবে না।”(সুনানে তিরমিযি)

“যে অন্য কোন ধর্মের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

তোমরা ইহুদী এবং খৃষ্টানদের সাদৃশ্যতা গ্রহণ করো না।”(সুনানে তিরমিযি)

এছাড়াও বিস্তারিত জানতে দেখুন-

<https://islamqa.info/en/answers/21694/guidelines-concerning-imitation-of-the-kuffaar>

এই রকম অনেক প্রতিষ্ঠানই বাংলাদেশে বিদ্যমান।

এখন সিদ্ধান্ত আপনার আপনি ওই নোংরা কলেজে যুক্ত হয়ে নিজের আখিরাতকে বরবাদ করবেন কিনা।

“আমার সোনার বাংলা”। জাতীয় সংগীত নাকি দেবীবন্দনা?

আমার সোনার বাংলা’ টাইটেলের দেবীবন্দনা তো অনেকবারই শুনেছেন

ছাত্রজীবনে। কিন্তু জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃত মাত্র ১০ চরণ। বাকিগুলো সাধারণত মানুষ পড়ে না। কিন্তু বাকি চরণগুলোই স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় এটি কী, এবং এর উদ্দেশ্য কী?



পুরো সংগীতটুকু হলো-

“আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,

মরি হয়, হয় রে—

ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—

কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,

মরি হয়, হয় রে—

মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিলে রে,

তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।

তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে,

মরি হয়, হয় রে—

তখন খেলাধুলা সকল ফেলে, ও মা, তোমার কোলে ছুটে আসি ॥

ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে,

সারা দিন পাখি-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা তোমার পল্লীবাটে,

তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,

মরি হয়, হয় রে—

ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই, ও মা, তোমার রাখাল তোমার চাষি ॥

ও মা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে—

দে গো তোর পায়ের ধুলা, সে যে আমার মাথার মানিক হবে।

ও মা, গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে,

মরি হায়, হায় রে—

আমি পরের ঘরে কিনব না আর, মা, তোর ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি”

মুশরিকরা দেশকে মা বলে, তাদের অনুকরণে আমাদের শিশুদেরকেও পড়ানো হয়

দেশ হলো মায়ের মতো। শিশু বড় না হতে হতেই আপনার সন্তানের গলায় টাই

ঝুলিয়ে স্কুলে পাঠান সকালে দেবীবন্দনা পাঠ করার জন্য। প্রায় সারাটা স্কুল লাইফে

এই দেবীবন্দনা পাঠ করতে হয়। কতো বড় লজ্জার বিষয়!

আপনার সন্তানকে প্রতিদিন শিরক করতে পাঠাচ্ছেন, এ ব্যাপারে জবাবদিহিতার জন্য

প্রস্তুত থাকুন।

الْفَيْءُ اتَّخَذَ إِذَا: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ
الرَّجُلِ وَأَطَاعَ الدِّينَ، لِعَيْرٍ وَنُعْلَمَ مَعْرَمًا، وَالزَّكَاةُ مَعْنَمًا، وَالْأَمَانَةُ دُولًا،
فِي الْأَصْنَواتُ وَظَهَرَتْ أَبَاهُ، وَأَقْصَى صَدِيقَهُ، وَأَذْنَى أُمَّهُ، وَعَقَّ امْرَأَتَهُ،
مَخَافَةَ الرَّجُلِ وَأَكْرَمَ أَرْذَلَهُمْ، الْقَوْمَ زَعِيمٌ وَكَانَ فَاسِقُهُمْ، الْقَبِيلَةَ وَسَادَ الْمَسَاجِدِ،
الْأُمَّةِ هَذِهِ آخِرُ وَلَعَنَ الْخُمُورُ، وَشَرِبَتْ وَالْمَعَارِفُ، الْقَبِيلَاتُ وَظَهَرَتْ شَرُّهُ،
وَأَيَاتٍ وَقَدْفًا وَمَسْخًا وَخَسْفًا وَزَلْزَلَةً حَمْرَاءَ، رِيحًا ذَلِكَ عِنْدَ فَلْيَرْتَقِبُوا أَوْلَهَا،
فَتَتَابَعَ سِلْكُهُ قُطِعَ بِالِ كَنْظَامٍ تَتَابَعَ.

অর্থাৎ হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিজের সম্পদে পরিণত হবে, আমানতের

মাল লুটের মালে পরিণত হবে, জাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, ধর্ম বিবর্জিত শিক্ষার প্রচলন হবে, পুরুষ নিজের স্ত্রীর অনুগত হয়ে যাবে, কিন্তু মায়ের অবাধ্য হবে, বন্ধু-বান্ধবকে কাছে টানবে, কিন্তু পিতাকে দূরে ঠেলে দিবে, মসজিদে কলরব ও হট্টগোল হবে, পাপাচারীরা গোত্রের নেতা হবে, নিকৃষ্ট লোক সমাজের কর্ণধার হবে, কোনো মানুষের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তাকে সম্মান দেখানো হবে, গায়িকা-নর্তকী ও বাদ্যযন্ত্রের বিস্তার ঘটবে, মদ পান করা হবে, এ উম্মতের শেষ সময়ের লোকেরা পূর্ববর্তী মনীষীদের অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা অগ্নিবায়ু, ভূমিধস, ভূমিকম্প, চেহারা বিকৃতি ও পাথর বর্ষণের শাস্তির অপেক্ষা করো, যা একটির পর একটি এমনভাবে প্রকাশ পাবে, যেমন একটি পুঁতির মালা কেটে দিলে তা একটির একটি পড়তে থাকে । (সুনানে তিরমিজি: ৪/৬৫, হা. নং ২২১১)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখল সে তাদের অন্তর্ভুক্ত” । আবু দাউদ (৩৫১৪)
এখন ভেবে দেখেন শিরক করে মিথ্যা মূল্যবোধ দেশপ্রেমের পরিচয় দিবেন কিনা।

ইসলামের বিরুদ্ধে নতুন চক্রান্তঃ, কোন পথে কওমী সন্তানেরা?

|| বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ||

নিশ্চয়ই সকল প্রসংশা আল্লাহর জন্য । সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর ﷺ উপর এবং তার ﷺ পরিবারের উপর এবং তার ﷺ সাহাবীগণের উপর।

আজকে আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে কাফেরদের নতুন চক্রান্ত নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করবো, ইনশা আল্লাহ !



আলোচনার শুরুতেই আমি আল্লাহ তা'আলার আয়াত স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি!

আল্লাহ তায়া'লা পবিত্র কালামে মাজিদে বলেন!

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يَتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে।

[সূরা-আত তাওবাহ: আয়াত, ৩২]

যুগে যুগে কাফের'রা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের আলোকে তাওহীদের আলোকে নিবিয়ে দিতে চেয়েছে তারা নানা পদ্ধতিতে চেষ্টা

করেছে ইসলাম কে ধংস করে দিতে তারা চেষ্ঠা করেছে মুসলমানদের কে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে নিত্যনতুন উপায়ে তারা চেষ্ঠা করেছে মুসলমানদের কে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হাজারো বছর ধরে কাফের রা এই প্রচেষ্টা কে অব্যাহত রেখেছে!

এই উপমহাদেশে জন্ম নেওয়া কাদিয়ানি ফেতনা তো তাদের এই হীনো প্রচেষ্টা'রই অংশ মুসলমানদের ঈমান'কে নষ্ট করার জন্য , তাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত করার জন্য সক্রিয়ভাবে বৃটিশ কাফের'রা কাদিয়ানিদের উদ্যান ঘটিয়ে ছিলো!

আর আজও ফিরিঙ্গি কাফের'রাই কাদিয়ানিদের টিকিয়ে রেখেছে, কিন্তু যখন মুসলিম উম্মাহ কে গুমরাহ করার জন্য কাফের'রা একদিকে মির্জা গোলাম কে দাড়া করিয়ে ছিলো, তখন অন্য দিকে উম্মাহকে সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য দাড়িয়ে গিয়েছিলেন [শাহ' আতাউল্লাহ বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি'র] মতো যোগ চেষ্ঠা আলেমরা তারা ক্ষমতাসীনদের ব্যাপারে ভয় না করে আল্লাহকে ভয় করে ছিলেন! তারা সৃষ্টির ভয়কে তুচ্ছ করে ছিলেন আর শাসকদের রক্ত চক্ষুর পরোয়া না করে সত্যকে প্রকাশিত করেছিলেন। আর সত্যের পক্ষে তাদের এই অবস্থান গ্রহণের কারনেই, সত্যের পক্ষে তাদের এ ত্যাগ মেহনতের কারনেই উম্মাহ আজও তাদের প্রতি শ্রদ্ধা পরে সুরণ করে তাদের এই মেহনতের মাধ্যমেই (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) কাদিয়ানিদের ভয়াবহ ফেতনা থেকে উম্মাহ কে রক্ষা করেছিলেন ।

কিন্তু এই ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হবার পর কাফেররা থেমে যাইনি বরং মুসলিম উম্মাহ কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পথ থেকে! সাহাবাহী কেরাম

(রাঃ) আনহুমের অবস্থান থেকে বিদ্যুত করার জন্য তারা তাদের ষড়যন্ত্র কে অব্যাহত রেখেছে!

এইতো আজ থেকে ১০ বছর আগেও এই দেশের মাটিতে বসেই পশ্চিমা কাফেরদের সহযোগী নানা এনজিও গুলো গবেষণা করে ছিলো কিভাবে বাংলাদেশ থেকে কাওমী মাদরাসা গুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়, কিভাবে মাদরাসা গুলোকে চিরতরে বন্ধ করে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করা যায়, তা নিয়ে তারা সবাই মিলে আলোচনা করে ছিলো গবেষণাপত্র প্রকাশ করে ছিলো তারা চেয়ে ছিলো এই জমিন থেকে দ্বীনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর নাম নিশানা কে চিরতরে মুছে দিতে! আল্লাহর ইচ্ছাই বিপুলপ্লানীং এবং প্রশাসনিক সমর্থন থাকার সত্ত্বেও তারা তাদের এই পরিকল্পনায় সফল হয়নি!



পরবর্তীতে তারা কৌশল পরিবর্তন করে তারা বুঝতে পারে সরাসরি ইসলামের উপর আঘাত করে মুসলমানদের কে ইসলাম থেকে বিদ্যুত করা যাবে না তাই তারা এক নতুন পরিকল্পনা করে, এবার তারা টার্গেট নেই খোদ ইসলাম কেই বদলে দেবার,

ইসলামের যে বিষয়ে গুলো তাদের কাছে অপছন্দ নিও সে গুলোকে বাদ দিয়ে এক নতুন ধর্ম চালো করার, এমন এক ধর্ম যা নামে গন্ধে ইসলামের মতোই হবে বাহির থেকে যাকে দেখে ইসলামে মনে হবে, কিন্তু আসলে তা কুফর ছাড়া আর কিছুই না! আর কাফের রা তাদের তৈরি করা এই নতুন ধর্মের নাম দেই মডারেট ইসলাম বা [চিফিল ডেমকরেটিব ইসলাম] এটা হলো এমন এক ইসলাম যা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন করাকে আবশ্যক মনে করে না, কিন্তু গণতন্ত্রকে আবশ্যক মনে করে, এটা হলো এমন এক ইসলাম ইসলামী রাষ্ট্র চাইনা, কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চাই!



এটা হলো এমন এক ইসলাম যা আল্লাহর শরীয়তের অনুসরণ কথাকে প্রয়োজন মনে করে না, কিন্তু কাফেরদের বানানো আইনের অনুসরণকে ফরয মনে করে! এটা হলো এমন এক ইসলাম যা নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য কিছু করার শিক্ষা দেই না। কিন্তু সমকামীদের সমর্থনে মানববন্ধনের শিক্ষা দেই, এটা হলো এমন এক ইসলাম হিসাব নিকাশ কে তুচ্ছ ত্যাগ করে আর নারী অধিকারের নামে নারী আর পুরুষের অবাধ মেলামেশায় উৎসাহ দেই! এ হলো এমন এক ইসলাম কাফেরদের রাহে যুদ্ধ করাকে পূণ্যের কাজ মনে করে, আর আল্লাহর দ্বীনের জন্য জীবন দেওয়া কে জংগীবাদ নামে আখ্যায়িত করে।

এটা হলো এমন এক আদর্শ যা মুসলমানদের কে কাফেরদের চোখ দিয়ে কুরআনকে পড়তে শিখায়, যা মুসলিমদেরকে কাফেরদের রিদয় দিয়ে কোরআন কে বুজতে শিখায় আর তারা এ নতুন ধর্ম প্রচারের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করে, কিন্তু তারা এটাও বুঝে সুট টাই পড়া কোন ফিরিঙ্গি বাংলাদেশে এসে তাদের এই আদর্শ প্রচার করে তাহলে কখনই সাধারণ মানুষ তা গ্রহণ করবে না, তাই তারা সিদ্ধান্ত নেই এই ভূমির মাদ্রাসা'র সন্তানদের মাধ্যমেই মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী আর দ্বীনী শিক্ষাই শিক্ষিত ইমাম ও খতীবদের মাধ্যমেই তারা তাদের এই ৯০ ইসলামকেই প্রচার করবে।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তারা বিভিন্ন এনজিও মাধ্যমে মাদ্রাসা'র শিক্ষার্থী এবং জিলা ইউনিয়ন পর্যায়ের ইমাম খতীবদের নিজেদের কুফরী আদর্শে দীক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি হাতে নেই, এই ধরনের একটি এনজিও হলো [#মুভ](#) ফাউন্ডেশন জার্মানের দূতাবাসের অর্থায়নে পরিচালিত [#মুভ](#) ফাউন্ডেশন নামের এই এনজিও টি কথিত উগ্রপন্থা বিরুদ্ধী এক কর্মশালা আয়োজন করে আর এতে অংশ নেই বাংলাদেশের সুনামধন্য বেশ কিছু কওমী মাদ্রাসার ছাত্র এই কর্মশালায় গিয়ে আমাদের কওমী সন্তান রা কি করছে, তারা লজ্জা শরমের মাথা খুইয়ে [gurop work](#) এর নামে মেয়েদের গা ঘষে ঘনিষ্ট হয়ে বসছে।



তারা তাদের হাত ধরে সহনশীলতার নামে নাচানাচি করেছে দেওয়ালে দেওয়ালে
 ক্রুশ পাদ্রী পুরহিতদের ছবির সামনে দাড়িয়ে শুদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞান শিখার শপথ নিচ্ছে।
 নারী পুরুষ হাতে হাত মিলিয়ে জংগীবাদ নিপাত যাওয়ার স্লোগানে মেতে উঠেছে
 আজ ক্লাস্টার রাষ্ট্র জার্মানি অর্থায়নে পরিচালিত #মুভ ফাউন্ডেশন নামের এনজিও
 এ সংস্থাটি আমাদের কওমী পড়ুয়াদের সহনশীল ও অধুনিক বানাচ্ছে, তাদেরকে
 মডারেট ইসলামের শিক্ষা দিচ্ছে, সিভিল ডেমক্রেটিব ইসলাম শেখাচ্ছে,
 অসাম্প্রদায়িকতার চেতনা গিলাচ্ছে!

.
 আর আমাদের আকাবির দেওবন্দ অনুসারী হবার দাবীদার'রা বিশুদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞান
 শিখার শপথ দিচ্ছে,
 উপরে উঠার সিড়ি দিয়ে কতোটুকু নিচে নেমে যাচ্ছেন আমাদের ভবিষ্যতের
 আল্লামা'রা, মুভ ফাউন্ডেশন কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করা, কওমী মাদরাসা'র ছাত্রদের
 কে আমরা প্রশ্ন করতে চাই।

[সাহ সাইয়েদ আহমাদ রাহিমাতুল্লাহি আলাইহি] উনার আদর্শ কি বিশুদ্ধ ছিলো না,
 বালাকোটের বীর শহীদদের ইসলাম কি বিশুদ্ধ ছিলো না!

তিতুমীরের বাঁশের কেলা কি সঠিক ধর্মীয় জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলোনা,
 বৃটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদ কে ফরযে আইন যারা ঘোষণা দিয়েছিলেন, (সেই -সাহ
 আব্দুল আজিজ মুহাদিস ইতকলবী- আর রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহিদের) ধর্মীয় চিন্তা
 চেতনা কি বিশুদ্ধ ছিলো না, (কাসেম নানুভতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) , আর
 (আল্লামা'সাহ কাশ্মীর রহমতুল্লাহি আলাইহি'র) মতো বিচক্ষণ উলামায়ে কেরামের
 ধর্মীয় জ্ঞান কি বিশুদ্ধ ছিলো না!

একের প্রশ্নে আপোষহীন ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহি আলাইহি'র ধর্মীয় জ্ঞান কি বিশুদ্ধ ছিলো না । তাদের আদর্শ ছেড়ে, তাদের ইলমের ওয়ারিশ হবার পথ ছেড়ে, আপনারা কোন পথ ধরে হাঁটছেন!

হায় আফসোস কওমী মাদরাসা'র সন্তানদের কেউ আজকে মুভ ফাউন্ডেশনের মতো খ্রিষ্টান মিশনারীদের যেয়ে শুদ্ধ জ্ঞান শিখার শপথ নিতো বলছে!

দখলদার বিরূধী তার জন্য, আগ্রাসনের দ্বীন ও উম্মাহ'র হেফাজতের জন্য দারুলউলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?

আর আপনারা কিভাবে সেই দেওবন্দ প্রতিনিধিত্বার দাবীদার হয়ে, উম্মাহ শত্রুদের কাছে গিয়ে সহনশীলতা শিখছেন, তাদের শিখানো এই সহনশীলতা কি - নবী মুহাম্মদ (সাঃ) আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো মধ্যম পন্থা, নাকিএগুলো কুফর আর শিরকের প্রতি সহনশীলতা, গোলামের প্রতি সহনশীলতা মুসলিমদের উপরে চালানো হত্যাযজ্ঞের ব্যাপারে সহনশীলতা, যেখানে দ্বীনের স্পস্টতা পেয়ে যাহিলিয়াতের অন্ধকারে ডুবে থাকা, মুসলিম যুবকেরা নারীদের ফেতনা থেকে ফিরে আসছে, সে ক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে তালিমুল ইলম হয়ে, নবীর ওয়ারিশ হয়ে, মুখ্ জাহিলদের মতো পর্দা হীন নারীর কাছ ঘষে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসছেন!

কিভাবে তাদের হাত ধরে গুরপাক খাচ্ছেন, কাফেররা যখন মির্জা গোলামের মাধ্যমে মুসলমানদের কে গুমরাহ করার ষড়যন্ত্র করেছিল, তখন আকাবির দেওবন্দ এই ফিতনার বিরুদ্ধে আগ্রনী ভূমিকা পালন করে ছিলেন, আজ আপনারা কিভাবে কওমী মাদরাসা'র ছাত্র হয়ে ইসলাম কে বদলে দেওয়ার এই যুদ্ধে কাফেরদের আদর্শিক সৈনিক পরিনত হচ্ছেনা[লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাবিলাহ]

এখনো সময় আছে এই অধপতনের পথ থেকে ফিরে আসুন এই গোলামের পথ থেকে ফিরে আসুন, সামান্য স্বীকৃতি আর দুনিয়া অর্জনের লোভে কাফেরদের সংঘাতনুযায়ী, আধুনিক হবার লোভে নিজেদের দুনিয়া ও আখিরাত কে বরবাদ করবেন না! ক্ষমতাশীনদের ভয়ে নিজেদের অস্তিত্ব কে টিকিয়ে রাখা নিয়ে সংশ্লিষ্ট হয়ে তার দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবতীর্ণ হবেন না । দুনিয়ার লাঞ্ছনা আর আখেরাতের বরবাদি ছাড়া এই পথে আর কিছুই নেই, সামান্যের বিনিময়ে নিজেদের ইলম ঈমান কে ব্যক্তি করে দিবেন না, এখনো সময় আছে এই পথ থেকে ফিরে আসুন, আপনারা ইসলামের বিরুদ্ধে এই আগ্রাসন আর আক্রমণের মোকাবেলায় আকাবিরের দেওবন্দ রেখে যাওয়া উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের অনুসরণ করুন প্রমাণ করুন! আপনারা এই আকাবির দেওবন্দ অনুসারী, দেওবন্দ ছুঁরাতে মির্জা গোলামের অনুসারী নন ।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার আয়াত সুরণ করিয়ে দিচ্ছি!

আল্লাহ তায়া'লা পবিত্র কালামে মাজিদে ইরশাদ করেন!

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

তিনি তার রাসূল কে পেরণ করেছেন সত্য দ্বীন সহকারে যাতে করে এই দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন , যাতে করে এই জীবনব্যবস্থা কে সকল জীবন ব্যবস্থার উপর গালেব করতে পারেন বিজয়ী করতে পারেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে? আল্লাহ তা'আলা তার দ্বীনকে হেফাযত করবেন

আল্লাহ তায়া'লা এই দুইনকে গালেব করবেন এটা তার ওয়াদা আর নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য - কিন্তু সেই বিজয়ের কাফেলার অংশ হতে হলে আমাদেরকে সেই যোগ্যতা অর্জন করে নিতে হবে।

স্রোতের বিপরীতে সত্যের উপর অবিচর থাকতে হবে, হকের ব্যাপারে আবশ্যিক হতে হবে কাফেরদের আদর্শকে ফেরী করে নিছক নিজেদের কে হুক্কানি দাবী করার মাধ্যমে এই বরকতময় কাফেলায় शामिल হওয়া যাবে না!

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন! আমিন |

শতাব্দীর সবচে বড় ফিতনা : মডারেট ইসলাম



RAND পরিচিতি:

RAND Corporation | অ্যামেরিকান গ্লোবাল পলিসি থিংক ট্যাংক হিসেবে সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত পরিচিত এক নাম। **RAND Corporation** শব্দের

বিস্তারিত রূপ হলো **Research and Development Corporation**।

RAND কর্পোরেশন হলো অ্যামেরিকার একটি এনজিও প্রতিষ্ঠান। এর কাজ হলো আমেরিকার অর্থনৈতিক, সামাজিক, সমরনৈতিক, রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক নীতিনির্ধারণী বা থিংক ট্যাংক হিসেবে গবেষণা করা। এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণার ভিত্তিতেই চূড়ান্ত আলোচনা-পর্যালোচনার পর যেকোনো ধরনের মার্কিন নীতি বা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে অ্যামেরিকাকে সারাবিশ্বে একক পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জেনারেল হেনরি হাপ আর্নল্ডের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম **RAND Corporation**-এর যাত্রা সূচিত হয়। এরপর ক্রমে ক্রমে তার গ্রহণযোগ্যতা ও সুখ্যাতি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

যাত্রার শুরুর দিকেই **RAND Corporation** সফলভাবে মহাশূন্যে রকেট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে সারাবিশ্বে ব্যাপক সাড়া ফেলে দেয়। এরপর ১৯৫৭ সালে মার্কিন বিমানবাহিনী **RAND Corporation**-এর প্রযুক্তি হায়ার করে মহাশূন্যে স্পাই স্যাটেলাইট তৈরি করতে সক্ষম হয়। এর নাম দেওয়া হয়েছিল

Corona। মাত্র দুবছরের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের মোকাবেলায় এই **Corona** অ্যামেরিকার সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্রে পরিণত হয়। এরই ভিত্তিতে **Pravda** নামক সোভিয়েত পত্রিকা **RAND Corporation**-এর নাম দেয় **the academy of science and death and destruction**। এভাবেই ১৯৬০ সালের মধ্যে **RAND Corporation** বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হয়েও অ্যামেরিকাসহ সারাবিশ্বে পরিচিত হয়ে ওঠে।

এরপর সময় গড়াতে থাকে। **RAND Corporation**-এর পরিধিও বিস্তৃত হতে থাকে। তখন আর তারা শুধু যুদ্ধের জন্য প্রযুক্তি-অনুসন্ধানের মধ্যে ক্ষান্ত না

থেকে কীভাবে শত্রুপক্ষকে বিভক্ত করা যায়, কীভাবে জাতিগত দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে বিনা যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায়—এসবের গবেষণা করতে থাকে। একেক দেশ ও জাতির জন্য তারা একেক ধরনের নীতি অনুসরণ করে; যাতে করে বিনা যুদ্ধে সেই দেশ ও জাতিকে অ্যামেরিকার কর্তৃত্বাধীন করা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করা মূলত RAND-এর গবেষণার বাস্তবায়ন মাত্র। মুসলিমরাও যাতে কখনো পরাশক্তি হয়ে উঠতে না পারে, সর্বদাই যেন তারা অ্যামেরিকার অধীনস্থ থাকে—সে লক্ষ্যে RAND বিপুল গবেষণা করে বেশ কয়েকটি অনুসন্ধানী রিপোর্টই বের করেছে।^[1] অ্যামেরিকান গভর্নমেন্টের কাছে সেই অনুসন্ধানী রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর গভর্নমেন্ট তা বাস্তবায়ন করে চলছে। সেই ৬০-এর দশক থেকেই এভাবে তাদের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

র্যাণ্ডের দৃষ্টিতে মুসলমানদের প্রকার

RAND নিজেদের অ্যাজেন্ডাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাস্তবায়নের সুবিধার্থে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের চার ভাগে ভাগ করে থাকে :

1. **ফান্ডামেন্টালিস্ট মুসলিম** : অর্থাৎ মৌলবাদী ও চরমপন্থী মুসলিম। এরা হচ্ছে সে সকল মুসলিম, যারা ইসলামকে শুধু কতক আচার-অনুষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত আচার-ইবাদতের ধর্ম মনে করে না; বরং ইসলামকে মনে করে এক পরিপূর্ণ দীন এবং মানবমুক্তির বিকল্পহীন জীবনব্যবস্থা। যারা চায় আল্লাহ তাআলার নাজিলকৃত বিধান দিয়ে শাসন ও বিচারকার্য পরিচালনা করতো। চায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিসরেও ইসলামকে একচ্ছত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করতো। এককথায়, তারা বিজয়ী ধর্মকে সবক্ষেত্রেই বিজয়ী রাখতে চায়। আল্লাহর ভূমিতে আল্লাহর শাসনকে

প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এরা হলো অ্যামেরিকার সর্বপ্রধান শত্রু। যেকোনো মূল্যে এদের বিনাশ করা অ্যামেরিকার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

2. ট্রেডিশনালিস্ট মুসলিম : অর্থাৎ ঐতিহ্যবাদী মুসলিম। এরা হচ্ছে সে সকল মুসলিম, যারা ইসলামের ঐতিহ্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রেখেছে। ইলমচর্চা, ধর্মপ্রচার এবং আত্মশুদ্ধিকেন্দ্রিক কাজগুলোকেই যারা ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে আছে। মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ নিয়ে পড়ে থাকাই যাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। অ্যামেরিকা এদের ঝুঁকি মনে করে না। এরা অ্যামেরিকান সভ্যতা-সংস্কৃতির জন্য হুমকি কিংবা ক্ষতিকর নয়। হ্যাঁ, তবে এরা যদি কোনোভাবে ফান্ডামেন্টালিস্ট মুসলিমদের সঙ্গে মিলে যেতে পারে, তবে এরা অ্যামেরিকার জন্য বিপদ এবং মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ জন্য যেকোনো উপায়ে এদেরকে তাদের নিজ নিজ পরিমণ্ডলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। কোনোভাবে ফান্ডামেন্টালিস্ট মুসলিমদের সঙ্গে মিলতে দেওয়া যাবে না। বরং সাধ্যানুসারে উভয় দলের মধ্যে কোন্দল ও বিভেদ জিইয়ে রাখতে হবে।

3. মডারেট মুসলিম বা মডার্নিস্ট মুসলিম : অর্থাৎ আধুনিকতাবাদী মুসলিম। এরা আদি ও আসল ইসলামকে সেকেলে মনে করে। তাই ইসলামকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে চায়, ইসলামের পরিমার্জিত সংস্করণ বের করতে চায়। এদের এসব ব্যাখ্যার পেছনে মূল উদ্দেশ্য হলো, ইসলামকে প্রবৃত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা। ইসলামকে পাশ্চাত্য ধারার জীবনব্যবস্থা এবং তার সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করা; যাতে করে ইসলামের ইতিবাচক দিকগুলোও পালন করা যায়, আবার প্রবৃত্তিপূজার অংশ হিসেবে নেতিবাচক দিকগুলোর মধ্যেও অংশগ্রহণ করা যায়। এদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার সুবাদেই বর্তমানে অস্তিত্বলাভ করেছে সবকিছুর ইসলামি (!) ভার্সন।

ইসলামি মিউজিক, ইসলামি মদ, ইসলামি সুদ, ইসলামি জুয়া, ইসলামি পতিতালয়, ইসলামি সিনেমাহল, ইসলামি গণতন্ত্র, ইসলামি সমাজতন্ত্র প্রভৃতি।

মডারেট মুসলিমরা আল্লাহ তাআলার দীনকে পরিপূর্ণভাবে মানতে রাজি নয়; বরং তারা দীনের কেবল ততটুকু মানতে চায়, যতটুকু তাদের মনঃপুত হয়, যতটুকু মানতে তাদের কোনো কষ্ট-ক্লেশ সহিতে হয় না কিংবা ত্যাগ-তিতিক্ষা করতে হয় না। এবং তা-ও কেবল সে উপায়েই মানতে চায়, যা তাদের সমাজে প্রচলিত কিংবা তাদের পূর্বসূরি বাপ-দাদাদের থেকে প্রাপ্ত। এ ছাড়া আল্লাহ তাআলার অন্যান্য

বিধানগুলোকে তারা অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করে।

র্‌যান্ডের পলিসি সাজেশন হলো, মডারেট মুসলিমদের সাহায্য করতে হবে, এদের জন্য ফান্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। আর বিশেষভাবে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় এদের প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। যেহেতু সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এদের উল্লেখযোগ্য অবস্থান ও সবিশেষ গ্রহণযোগ্যতা নেই, তাই মিডিয়ার মাধ্যমে এদেরকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে; যাতে তাদের আহ্বান মানুষের কর্ণকুহরে পৌঁছে যায়।[2]

- **সেক্যুলারিস্ট মুসলিম :** অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মুসলিম। এরা প্রথম থেকেই অ্যামেরিকার পকেটে রয়েছে। তাই এদের নিয়ে আলাদা চিন্তা বা মাথাব্যথা নেই। এরা কারও জন্য কোনো ঝুঁকির কারণ নয়। সেক্যুলারিস্ট মুসলিমরা মূলত মুসলিমই নয়। কারণ, তারা ইসলামকে কেবল ব্যক্তিজীবনে পালনীয় ধর্ম মনে করে এবং রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে আলাদা মনে করে। এদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি থাকবে ধর্মের বলয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এরাই মূলত তারা, যাদের সম্বোধন করে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ইমান রাখো, আর কিছু অংশকে অস্বীকার

করো? তোমাদের মধ্যে যে-কেউ এমনটা করবে তার শাস্তি এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, ইহকালে তাদের জন্য থাকবে লাঞ্ছনা আর কিয়ামত দিবসে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে ভয়াবহ শাস্তির দিকে। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে উদাসীন ননা’ (সুরা বাকারাহ)

আর প্রকাশ থাকে যে, ইসলাম গ্রহণ করার জন্য দীনের প্রতিটি বিষয়ের প্রতি ইমান আনয়ন করতে হয়। কোনো একটি বিষয়ের প্রতি অস্বীকৃতি বা সংশয় থাকলে ব্যক্তি কখনো মুমিন হতে পারে না। অনুরূপভাবে একবার ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় ইসলামহারা হওয়ার জন্য দীনের প্রতিটি বিষয়কে অস্বীকার করতে হয় না, বরং যেমনিভাবে ওজু সম্পন্ন করার জন্য নিদেনপক্ষে চারটি অঙ্গ ধৌত করা লাগলেও ওজু ভঙ্গ হওয়ার জন্য ওজু ভঙ্গের কারণগুলোর মধ্য থেকে যেকোনো একটি কারণ পাওয়া যাওয়াই যথেষ্ট, একইভাবে ইসলাম নষ্ট হওয়ার জন্য দীনের অন্তর্ভুক্ত স্বীকৃত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে যেকোনো একটি বিষয়ের প্রতি অস্বীকৃতি বা সংশয় পাওয়া যাওয়াই ইসলামহারা হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

Modern Political Warfare

Current Practices and Possible Responses



April 2018

প্রেক্ষিত : মডারেট ইসলাম প্রচার

২০০৩ সালে অ্যামেরিকান গ্লোবাল পলিসি থিংক ট্যাঙ্ক RAND

Corporation একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে ঠিক কীভাবে ও কাদের সহায়তায়

অ্যামেরিকার বৈশ্বিক পলিসির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক নতুন ইসলাম প্রবর্তন করা যায়, **Civil Democratic Islam: Partners, Resources & Strategies** নামের এই রিপোর্টে তা আলোচিত হয়। অ্যামেরিকাবান্ধব এই নতুন ইসলামেরই নাম দেওয়া হয় ‘মডারেট ইসলাম’ বা **Civil Democratic Islam**। এরপর ২০০৭ সালে **Building Moderate Muslim**

Networks নামে একটি বিস্তারিত ফলোআপ রিপোর্ট প্রকাশ করে RAND। রিপোর্টগুলোতে মূলত ৩টি বিষয় আলোচিত হয় :

- ক) কেন অ্যামেরিকাবান্ধব এই নতুন ইসলামের প্রবর্তন ও প্রচার করা উচিত?
- খ) একজন মডারেট মুসলিমের বৈশিষ্ট্য কী হবে?
- গ) কীভাবে মুসলমানদের মধ্যে এই মডারেট ইসলামের প্রচার ও প্রচলন ঘটানো যায়?

RAND এর এই রিপোর্টে বেশ কিছু সম্ভাব্য পলিসি নিয়ে আলোচনা করা হয়। তার মধ্যে একটি হলো, ইসলামের ব্যাপারে পুরনো ধ্যান-ধারণাকে ভেঙ্গে দিয়ে সম্পূর্ণ নতুনভাবে ‘পশ্চিমা ইসলাম’, ‘অ্যামেরিকান ইসলাম’ ইত্যাদি ধারণাকে প্রমোট করা। তার ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ পলিসি সাজেশান ছিল, মডার্নিস্ট ও মডারেট দায়ি ও আলিমদের চিহ্নিত করা, তাদেরকে বিশ্বব্যাপী প্রমোট করা এবং তাদেরকে দিয়ে নতুন নতুন বই ও কারিকুলাম তৈরি করা। এ ছাড়াও কীভাবে আপাত রক্ষণশীলদের (**Conservatives**) এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে ব্যবহার করা যায়, তা নিয়েও রিপোর্টগুলোতে আলোচনা করা হয়।

পরবর্তীতে ২০১৩ সালে **Promoting Online Voices for Countering Violent Extremism** নামে তৃতীয় একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে RAND। এই রিপোর্টে মডারেট ইসলামের প্রচারের জন্য এবং প্রকৃত

ইসলামি শিক্ষাকে (যেটাকে **RAND** কটরপন্থা বলে) মোকাবেলার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। কটরপন্থার বিপরীতে ‘সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা’-এর শিক্ষা দেওয়া অনেক ‘মডারেট শায়খ’ এবং মুসলিম কমিউনিটি লিডার ও সংগঠনের নাম নির্দিষ্টভাবে এই রিপোর্টে আলোচিত হয়। **RAND**-এর পলিসি বাস্তবায়নে এ ধরনের ব্যক্তি ও সংগঠনের সোশ্যাল মিডিয়া উপস্থিতিকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তা নিয়েও আলোচনা করা হয় এই রিপোর্টে।



THE NEW WORLD ORDER

মডারেট ইসলামের লক্ষ্য

২০০৭ সালে **RAND Corporation** তাদের **Civil Democratic Islam** নামে যে রিপোর্টটি প্রকাশ করে, তাতে তারা লিখেছে :

‘গোটা মুসলিম বিশ্বে আজ তাদের তাদের নিজেদের মধ্যে একটি লড়াই চলছে। যে লড়াই মূলত বিশ্বাস ও মতাদর্শের লড়াই। এই লড়াইয়ের ফলাফলই নির্ধারণ করবে, মুসলিম বিশ্বের ভাগ্য কী হবে।’

মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পেন্টাগনের চতুর্মাসিক এক রিপোর্টে বলা হয়েছে :

‘যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে এমনই এক যুদ্ধে লিপ্ত, যা একই সঙ্গে সামরিক ও আদর্শিক। এ যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় কেবল তখনই অর্জিত হওয়া সম্ভব, যখন চরমপন্থীদেরকে (মুজাহিদদেরকে) তাদের স্বজাতি, পরোক্ষ সমর্থক এবং নিজেদের দেশের জনগণের চোখে খারাপ ও কলঙ্কিত করে তোলা যাবে।’

ইউ এস নিউজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্টে রয়েছে :

‘৯/১১-এর আক্রমণের পর বারবার ভুল পদক্ষেপ নিলেও ওয়াশিংটন এখন ঠিকই লক্ষ্যভেদী পাল্টা আক্রমণ হেনে যাচ্ছে। স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের চেয়েও আরও ব্যাপক রাজনৈতিক যুদ্ধের প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। সামরিক মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ এবং সি.আই.এ-এর গোপন অভিযান পরিচালনাকারী দলগুলো মিডিয়া এবং বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবীদের প্রকাশ্যে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া আরম্ভ করেছে। ওয়াশিংটন মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে যাচ্ছে এমন এক প্রচারণায়, যার উদ্দেশ্য কেবল মুসলিম সমাজকেই প্রভাবিত করা নয়; বরং স্বয়ং ইসলামকেই বিকৃত করে ফেলা।

‘ওয়াশিংটন গোপনে কমপক্ষে দুই ডজন দেশে অর্থ-সাহায্য দিয়ে আসছে। মডারেট ইসলামকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে রেডিও-টেলিভিশনে ইসলামি অনুষ্ঠান (!) প্রচার করা, মুসলিম স্কুলে বিভিন্ন কোর্স চালু করা, রাজনৈতিক কর্মশালা করা, মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের ক্রয় করা, মসজিদ নির্মাণ, কুরআন ছাপা, ইসলামি স্কুল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ-সাহায্য দিয়ে আসছে’



মডারেট মুসলিমের বৈশিষ্ট্য

1. একজন মডারেট মুসলিমকে গণতন্ত্রমনা হতে হবে। গণতন্ত্রমনা বলতে সেই গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল হতে হবে, উদারনৈতিক পশ্চিমা ঐতিহ্যে গণতন্ত্র হিসেবে যা পরিচিত। গণতন্ত্রের সমর্থককে ইসলামি রাষ্ট্র-ধারণার বিরোধী হতে হবে। কোনো দল নিজেদের গণতান্ত্রিক দল দাবি করার অধিকার রাখবে না, যদি গণতন্ত্রকে তারা নিছক ক্ষমতায় আরোহণ ও সরকার গঠনের মাধ্যম মনে করে।

যেমন : মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমিন (মুসলিম ব্রাদারহুড)।

2. একজন মডারেট মুসলিমের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, অসাম্প্রদায়িক (ধর্মনিরপেক্ষ) আইন গ্রহণ করে নেওয়া। চরমপন্থী (প্রকৃত) মুসলিম এবং মডারেট মুসলিমের মধ্যে আসল পার্থক্য হলো শরিয়াহ আইনের বাস্তবায়ন চাওয়া এবং না চাওয়া।

3. নারী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকারের (!) প্রতি সম্মান প্রদর্শন। সুতরাং হিজাব বাধ্যতামূলক করা নারী অধিকারে হস্তক্ষেপ করার নামান্তর। অমুসলিমদের ওপর জিযয়া কর আরোপ করা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

4. সন্ত্রাসবাদ ও অবৈধ সহিংসতাবিরোধী হতে হবে।

এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তারা একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করেছে। যার উত্তরের ভিত্তিতে তারা নির্ণয় করবে, কে মডারেট মুসলিম আর কে প্রকৃত মুসলিম।

প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ :

- এই ব্যক্তি বা দল কি সহিংসতা (জিহাদ)-কে সমর্থন করে বা সেটাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে? এখন সমর্থন না করলেও কি অতীতে কখনো সমর্থন করেছে বা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছে?
- তারা কি গণতন্ত্রকে সমর্থন করে? করলে কি পশ্চিমা উদার গণতান্ত্রিক মানদণ্ডে নির্ধারিত ব্যক্তি অধিকারকে সমর্থন করে?

- তারা কি (কুফফার গোষ্ঠী রচিত) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ডকে সমর্থন করে?
- এসব ক্ষেত্রে তারা কি কোনো ব্যতিক্রম করতে চায়? যেমন : ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে?
- তারা কি বিশ্বাস করে যে, ধর্ম পরিবর্তন করা ব্যক্তিগত অধিকার?
- তারা কি বিশ্বাস করে যে, শরিয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত ফৌজদারি দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা উচিত?
- তারা কি মনে করে যে, তাদের রাষ্ট্রে শরিয়াহ বহির্ভূত পছন্দমাত্রিক অন্য কোনো আইনে বিচারপ্রার্থনার সুযোগ থাকা উচিত?
- তারা কি বিশ্বাস করে যে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকারও (!) একজন মুসলিম নাগরিকের সমান? তারা কি বিশ্বাস করে যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরাও মুসলিম দেশে মুসলিম নাগরিকদের মতো সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পেতে পারে?
- তারা কি বিশ্বাস করে যে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা মুসলমানদের শাসিত দেশগুলোতে তাদের ধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে পারে?
- এই ইসলামি রাষ্ট্র কি অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত কোনো আইনি ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে?

সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলামের প্রস্তাবনা

1. মডারেট মুসলিমদের লেখা বই-পুস্তক, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদি ভর্তুকি দিয়ে প্রকাশ করা।

2. সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে যুবক শ্রেণির জন্য বইপত্র রচনা করতে মডারেট মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করা।
 3. মডারেট মুসলিমদের মতাদর্শকে ইসলামি শিক্ষার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা।
 4. সংশ্লিষ্ট দেশের শিক্ষা-সিলেবাস ও প্রচারমাধ্যমে তাদের ইসলামপূর্ব জাহিলি সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে এর চর্চাকে উৎসাহিত করা।
 5. মুসলিম জনগণের মধ্যে সুফিবাদকে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করে তোলা।
 6. বেআইনি অবৈধ দলসমূহ ও তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে নিজেদের অবস্থান প্রকাশ করা।
 7. তাদের সহিংস (জিহাদি) কর্মকাণ্ডগুলোর পরিণাম জনসমক্ষে তুলে ধরা।
 8. মৌলবাদী, চরমপন্থী ও সন্ত্রাসীদের (মুজাহিদদের) প্রতি কোনো রকম সম্মান প্রদর্শন করা কিংবা তাদের কোনো প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
 9. তাদেরকে জনগণের সামনে মানসিক বিকারগ্রস্ত এবং কাপুরুষ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে; প্রতিপক্ষের বীরযোদ্ধা হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না।
 10. মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী (মুজাহিদ) ব্যক্তি ও সংগঠনের দুর্নীতি কপটতা ও অনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে তদন্ত করে (মিথ্যার প্রলেপ লাগিয়ে) তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা।
- প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ইউ এস নিউজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট আরও বলেছে যে, ‘বিভিন্ন দেশে সিআইএ বর্তমানে বেশ কিছু অভিনব কার্যকরী পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো, মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে জঙ্গি (মুজাহিদ)

সংগঠনের সদস্য সংগ্রহকারী ও অ্যামেরিকাবিদ্বেষী আলিম-উলামাদের নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া’

আলিম-উলামা পরিচয়ধারী লোকদের ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা আরেক জঘন্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে। তারা প্রস্তাব করেছে, ‘তোমরা যদি দেখতে পাও যে, রাস্তার এক প্রান্তে মোল্লা ওমর একটি কাজ করছে, তাহলে রাস্তার অপর প্রান্তে তোমরা মোল্লা ব্র্যাডলিকে বসিয়ে দাও তার বিরুদ্ধাচারণ করার জন্য’



1. মৌলবাদীদের মধ্যে দলাদলি ও বিভাজন সৃষ্টি করা।

আমাদের করণীয়

এ পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কী হতে পারে, এ ব্যাপারে সুন্দর দিকনির্দেশনা দিয়েছেন শহিদ আনওয়ার আওলাকি (রাহিমাহুল্লাহ) তার এক বক্তৃতায়।

1. অ্যামেরিকা যদি প্রকাশ্যে নির্লজ্জের মতো ঘোষণা দেয় যে, তারা ইসলামকে বিকৃত করতে বদ্ধপরিকর, তাহলে আমাদেরও উচিত, নিজেদের দীন ও আদর্শকে এই কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা। যার যা কিছু আছে, তা নিয়েই শয়তানদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া।

ইসলামের যেসব বিষয়কে এরা অপপ্রচারের মাধ্যমে বিতর্কিত করে ফেলেছে, আমাদের উচিত সেসব ব্যাপারে ইসলামের সঠিক বক্তব্যকে আপোষহীনতার সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা। ইসলামি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ও তা

প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি গোটা বিশ্ববাসীর কাছে ব্যাপকভাবে উপস্থাপন করা।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শরিয়াহভিত্তিক শাসন তথা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রকাশ্যে ও ব্যাপকভাবে কথা বলা। কুফফার গোষ্ঠীর ল্যাবরেটরিতে উদ্ভাবিত সম্পূর্ণ কুফরি মতাদর্শ গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি জনগণের সামনে তুলে ধরা এবং ইসলামি শুরাব্যবস্থার সুফল ও কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করা। ইসলামি দণ্ডবিধি, হদ-কিসাস, ইসলামি ফৌজদারি আইন, বহুবিবাহ, নারী অধিকার ও মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য এবং আমাদের অবস্থান আপোষহীনভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা।

মুসলিম জনসাধারণ যেন পশ্চিমা কুফফার মিডিয়ার চক্রান্তের শিকার না হয়, তাদের মিথ্যাচার ও প্রোপাগান্ডার দ্বারা প্রতারণিত না হয়, সে জন্য এসব ব্যাপারে সততা, স্বচ্ছতা ও আমানতদারির সঙ্গে আপোষহীনভাবে হৃদয়গ্রাহী করে ইসলামের আদর্শ তুলে ধরা এবং তা প্রচার করা।

- অ্যামেরিকার যাবতীয় বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। কারণ, তারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যেকোনো উপায়-উপকরণ ব্যবহার করতে পিছপা হবে না। ইউএস নিউজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট তাদের নিবন্ধে লিখেছে, ‘মুসলিমদের পথভ্রষ্ট করার জন্য সম্ভাব্য যেকোনো উপায় অবলম্বন করতে হবে। এমনকি মিউজিক, কৌতুক, কবিতা, ইন্টারনেট ইত্যাদি সবকিছুর মাধ্যমে অ্যামেরিকার দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণযোগ্যভাবে গোটা আরব তথা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে’

অতএব তাদের যেকোনো ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

- এই কুফফার গোষ্ঠী যেহেতু সত্যিকার মুসলিমদের হেয়-প্রতিপন্ন করতে এবং তারা যে সত্যের পথে লড়াই করছে, সেই শুভ্রোজ্জ্বল পথকে বিতর্কিত করতে বন্ধপরিষ্কার, এ জন্য আমাদের ওপর আবশ্যিক যে, আমরা সত্যপন্থী আলিম-উলামা ও দায়ীদের পক্ষাবলম্বন করব এবং তাদের বক্তব্য বেশি বেশি প্রচার করব। তারা যদি আমাদের চিরন্তন আদর্শকে নস্যাৎ করতে চায়, তাহলে আমাদের উচিত হবে নিজেদের আদর্শের প্রচার-প্রসার ও তা প্রতিষ্ঠায় আরও বেশি আত্মনিয়োগ করা।
- সত্যের বাণীসমৃদ্ধ যাবতীয় উপায়-উপকরণ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। সত্যের মুখপত্র বই-পুস্তক, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, পত্র-পত্রিকা, অডিও-ভিডিও, ওয়েবসাইট তথা যেকোনো উপায়-উপকরণকে নিজেদের অর্থ ব্যয় করে বেশি থেকে বেশি প্রচার করা উচিত।
- নিদেনপক্ষে আমাদের কথা ও সম্পদের জিহাদে অংশগ্রহণ করা উচিত। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘তোমরা সম্পদ, প্রাণ এবং কথার মাধ্যমে জিহাদ করো’ সঠিকভাবে সত্যের প্রচারও জিহাদের একটি অংশ। ...আল্লাহ তাআলা আমাদের বিজয় দান করবেন—এ কথা মনে করে আমাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই। বরং আমাদের উচিত সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। ‘আত-তায়িফাতুল মানসুরা’ বা ‘আল-ফিরকাতুন নাজিয়া’র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা প্রয়োজনা কারণ, বিদআতের প্রসারে এখন আর শুধু স্বল্প সামর্থ্যবান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলোই নিয়োজিত নয়; বরং খোদ অ্যামেরিকা এবং তার দোসররা বিদআতের প্রচার-প্রসারে ব্যাপক অর্থায়ন শুরু করে দিয়েছে। অতএব হক ও বাতিলের এই আদর্শিক যুদ্ধে গোটা বিশ্ববাসীর সামনে সত্যকে তুলে ধরা সত্যপন্থীদের নৈতিক দায়িত্ব।



[1] উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য :

1. In Their Own Words, Voices of Jihad-
http://www.rand.org/pubs/monographs/2008/RAND_MG602.pdf
- Civil Democratic Islam. Partners, Resources, and Strategies
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1716/MR1716.pdf
- Maritime Terrorism Risk and Liability
http://www.rand.org/pubs/monographs/2006/RAND_MG520.pdf
- Counterinsurgency in Afghanistan
http://www.rand.org/pubs/monographs/2008/RAND_MG595.pdf
- Radical Islam in East Africa
http://www.rand.org/pubs/monographs/2009/RAND_MG782.pdf
- Beyond al Qaeda. Part one. The Global Jihadist Movement
http://www.rand.org/pubs/monographs/2006/RAND_MG429.pdf
- Beyond al Qaeda. Part two. the Outer Rings of the Terrorist Universe
http://www.rand.org/pubs/monographs/2006/RAND_MG430.pdf
- The Muslim World After 9/11
http://www.rand.org/pubs/monographs/2004/RAND_MG246.pdf

[2] মডারেট মুসলিমদের সম্পর্কে র্‌যান্ডের বিস্তারিত গবেষণা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য দ্রষ্টব্য :

1. Civil Democratic Islam
2. Building Moderate Muslim Networks

বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড : ইতিহাস ও আমাদের করণীয়

পৃথিবীর শুরু লগ্ন থেকেই হক বাতিলের লড়াই চলছে। যুগে যুগে নবী-রাসূলদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুরা যেমন সশস্ত্র যুদ্ধ করেছে তেমনি চিন্তার যুদ্ধও করেছে।

সেই ধারাবাহিকতায় হুযুর (স.) যখন রাসূল হিসেবে প্রেরিত হন, তখন মক্কার কাফিররা তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। হুযুর (স.) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)'র বিরুদ্ধে তারা সশস্ত্র তৎপরতার পাশাপাশি চৈতিক তৎপরতাও চালায়। এজন্য তারা অনেকগুলো ঘৃণ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যেমন- ইসলাম সম্পর্কে জনমনে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করা, ইসলামের অপব্যখ্যা করা, মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়ানো, বিদ্রূপ করা, হাস্যকর ও উদ্ভট দাবি পেশ করা, মুনাফিকি করা ইত্যাদি।

খেলাফতে রাশেদার যুগেও চৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ চলেছে; সংঘটিত হয়েছে জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিন এর মত অনভিপ্রেত ঘটনা।

উমাইয়া ও আব্বাসী শাসনামলেও বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ ছিল। কিন্তু সেই সময়কার মহা-মনীষীগণ দক্ষতা ও বীরত্বের সাথে এ সকল ফেতনার সফল প্রতিরোধ করেছেন।

ইতিহাসের এই সুদীর্ঘ সময়ে ইসলামের বিরুদ্ধে যারাই বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে, তারা সবাই শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছে। এর অন্যতম কারণগুলো ছিল আল্লাহ

রাসূল ও কুরআন-সুন্নাহ'র সাথে মুসলমানদের গভীর সম্পর্ক। সেসময় মুসলিম উম্মাহ ছিল গভীর জ্ঞানের অধিকারী, রাজনৈতিক পরাক্রমশালী; শাসকরা ছিল ইসলামের ব্যাপারে সজাগ ও সতর্ক। মুসলমানদের কৃতিত্ব ও আচরণ দেখে অমুসলিমরা স্বেচ্ছায়, সোৎসাহে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিত।



বর্তমান সময়েও বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ চলছে। বরং তা অতীতের চেয়ে আরো ভয়াবহ আকারে এবং ব্যাপক পরিসরে। ইসলামের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধকে পরিচালনা করছে পশ্চিমা বিশ্ব। পশ্চিমা বিশ্ব যখন দেখল তাঁরা মুসলমানদের ওপর যতই ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে, মুসলমানরা ততই ইসলামের প্রেরণায় দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে ওঠে দাঁড়াচ্ছে।

পুনরায় বিপুল শক্তিতে ইসলামের নবজাগরণ ঘটছে।
কোনভাবেই ইসলামকে নিভিয়ে ফেলা এবং মুসলমানদেরকে
নিঃশেষ করা সম্ভব হচ্ছে না। তখন তাঁদের বুঝতে বাকি
রইলনা ইসলাম যতোদিন নির্ভেজাল সত্তায় তাঁর নিখুঁত
কাঠামো ও মৌলিকত্ব নিয়ে টিকে থাকবে; ততদিন তাঁরা
সর্বাত্মক ও স্থায়ীভাবে মুসলমানদের পরাজিত করতে পারবে
না। তাই তাঁরা ইসলামের বিরুদ্ধে তাঁর প্রাণশক্তি ও
মৌলিকত্বকে ধ্বংসকল্পে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের আয়োজন করে।
পশ্চিমা বিশ্ব পরিচালিত বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের শেকড়
অনুসন্ধান করলে দেখা যায়- হিজরী পঞ্চম শতাব্দী অর্থাৎ
একবিংশ শতাব্দীতে যে ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু হয়েছিল সেখান
থেকেই এর উৎপত্তি।

যুদ্ধে যখন তারা বারবার হেরে যাচ্ছিলো তখন সপ্তম ও
অষ্টম ক্রুসেডের জনক সেন্ট লুইস গভীর চিন্তা ভাবনার পর
সিদ্ধান্ত নেন মুসলমানদের স্থায়ীভাবে পরাজিত করতে হলে
তাদের ওপর প্রথমে বুদ্ধিবৃত্তিক বিজয় অর্জন করতে হবে এ
জন্য তিনি চারটি সুপারিশ পেশ করেন-

এক : মুসলিম শাসকদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি
করা।

দুই : দৃঢ় ঈমান ও আকিদার অধিকারী কোন
গোষ্ঠীকে মাথা তুলে দাঁড়াতে না দেওয়া।

তিন : মুসলিম সমাজকে নৈতিক ও

অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করে দেওয়া।

চার : বর্তমান সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও ইসরাইল নিয়ে একটি বিস্তৃত সম্মিলিত ইউরোপীয়ান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।

ক্রুসেড যুদ্ধগুলোর পরিণতিতে ইউরোপের চিন্তা ভাবনায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক রণাঙ্গনে লড়াই করার জন্য জ্ঞানগত হাতিয়ার তৈরীর কাজ শুরু করে দেয়। এভাবেই সূচিত হয় বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের নতুন অধ্যায়।

বর্তমানে তারা প্রধানত চারটি ক্ষেত্রে চিন্তা ও মতাদর্শগত যুদ্ধ পরিচালনা করছে।



প্রথমত: ইসতিশরাক (প্রাচ্যতত্ত্ব) :

পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীরা ধর্মীয় উগ্রবাদীতার শিকার হয়ে ইসলামী

সংস্কৃতি, ধর্মমত, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও সভ্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ও বিকৃতি সাধন করে ইসলামের প্রাণশক্তি দুর্বল করে দিচ্ছে এবং তার শ্রেষ্ঠত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। পাশাপাশি মুসলমানদের বিভিন্ন গোত্র, রাষ্ট্র ও শ্রেণীর মাঝে ঝগড়া ও যুদ্ধ বাঁধিয়ে রাখছে। উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে মুসলমানদের পারস্পরিক মতানৈক্যে লিপ্ত রাখা এবং রাজনৈতিকভাবে কখনো এক ও সম্মিলিত শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে না দেওয়া।

3.

দ্বিতীয়ত: সাম্রাজ্যবাদ;

পশ্চিমারা মুসলিম বিশ্বের যাবতীয় বিষয়-আশয় নিয়ন্ত্রণ করছে। ভিতরগত দখলদারিত্ব কায়েম করে রেখেছে। এই সুযোগে তারা ব্যবসা ও অর্থনীতিতে একচেটিয়া রাজত্ব করছে এবং স্থানীয় পুঁজিগুলোকে অনায়াসে লুট করছে। তাদের এই কর্তৃত্ব ও লুটপাটকে বাকি রাখতে নিজেরা যেমন যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে, তেমনি পরস্পরকেও যুদ্ধে জড়িয়ে রাখছে। আবার কোন কোন রাষ্ট্রে গৃহ যুদ্ধের আগুনও উস্কে দিচ্ছে। সেখানে তারা নিজেদের এজেন্ট ও পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করছে ইত্যাদি।

4.

তৃতীয়ত: বিশ্বায়ন;

এটি এমন একটি আন্দোলন, যার লক্ষ্য

হলো- অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, জাতীয় ও দেশ ভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস করে পুরো পৃথিবীকে পশ্চিমা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা অর্থাৎ মুসলিম বিশ্বকে পশ্চিমা নির্ভর করে ফেলা। এ- লক্ষ্যে তারা জাতিসংঘ, ওগঙ্কা ও বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। বিশ্বব্যাপী মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ছড়িয়ে দিয়েছে। পশ্চিমা সভ্যতার প্রসার ঘটিয়েছে। অবাধ যৌনাচার ও সমকামিতার বৈধতা দিয়েছে।

চতুর্থত: ধর্মচ্যুত করা;

এ লক্ষ্যে তারা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছে-

এক : মুসলমানদের আকিদা ও আমল বিনষ্ট করা।

দুই : মুসলমানদের ধর্মীয় বলয় থেকে বের করে নেয়া।

তিন : মুসলমানদের সরাসরি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা।

ইহুদিবাদী ও খ্রিস্টবাদী দোসররা আমাদের অগোচরে এভাবেই একের পর এক বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ করে চলেছে। মূল থেকে শেকড়কে কেটে দিচ্ছে।

তাদের এই সবগুলো মতাদর্শ ও জীবন ব্যবস্থার লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য হলো-

ক. যা- কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাতে বিশ্বাস এবং যা

কিছু ইন্দ্রিয়াতীত তাতে অবিশ্বাস ও সংশয়।

খ. ধার্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি অনাগ্রহ ও নিরাশক্তি এবং পার্থিব ও জাগতিক বিষয়ের প্রতি নোংরা প্রতিযোগিতা ও চরম আশক্তি।

গ. জাতীয়তাবাদী মানসিকতা।

চরম অপ্রিয় সত্য হল, আমাদের গাফলতি ও উদাসীনতার কারণে এইসব দর্শন ও মতবাদ ইতোমধ্যেই ইসলামী বিশ্বে জেঁকে বসেছে। সেই সুযোগে আমাদের কোমল বোধকে নীল করছে এবং আকিদা-বিশ্বাসে চির ধরাচ্ছে। এসব ছাড়াও আরো বহু বিপর্যয়ের সম্মুখীন করছে। যেমন-

১. ধর্মীয় অনুভূতির বিলুপ্তি।
২. উদর ও বস্তু পূজা।
৩. নীতি ও নৈতিকতার ধ্বস।
৪. উদ্যমহীনতা ও আরামপ্রিয়তা।



মুফাক্কিরে ইসলাম আল্‌মা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. বলেন, "ইউরোপের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের আবরণে ইসলামী দুনিয়ায় এমন এক ইরতিদাদের অভ্যুদয় ঘটেছে ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী অস্বীকারই যার মূল বক্তব্য। যার সারবস্তুই হলো, রবের অস্বীকৃতি, মৃত্যুর পর পুনঃজীবন, জান্নাত, জাহান্নাম ও আখিরাতে অস্বীকৃতি; নবুওয়াত ও রিসালাতের অস্বীকৃতি, আসমানী বিধি-বিধানের অস্বীকৃতি এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অস্বীকৃতি। এর বিষক্রিয়া ইসলামী বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কোন রাষ্ট্র নেই, যা এর হামলা থেকে রক্ষা পেয়েছে। তা মুসলিম যুবক ও

শিক্ষিত শ্রেণীর মস্তিষ্ক বিকৃত করে ফেলেছে। তাদের চিন্তা-চেতনায় সংশয়-সন্দেহ, ধর্মহীনতা, নাস্তিকতা, ভন্ডামি ও প্রতারণার বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছে। নড়বড়ে করে দিয়েছে ধর্মীয় বিষয়ে তাদের ঈমান, আকিদা ও বিশ্বাস।"

আজ অধিকাংশ মুসলমানদের ওপর এসব বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা ও পাশ্চাত্য জীবনদর্শন প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে, যা সম্পূর্ণ নাস্তিকতা নির্ভর। এই অধর্ম বিশ্বাস গ্রহণ করে আজও ইসলামী বিশ্বের হাজারো লাখো মুসলমান নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে।

এতকিছুর পরও আমাদের হতাশ হলে চলবে না; কারণ, হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় ভেতর-বাইরের শত্রুদের মুহূর্মুহু আক্রমণ ও অস্তিত্ববিনাশী সব ষড়যন্ত্রের প্রবল বিপর্যয় কাটিয়েই স্বমহিমায় আজো টিকে আছে ইসলাম, ইসলামের চিরন্তন আদর্শ। বরং আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার স্বপ্ন নিয়ে রণাঙ্গনে অবতরণ করতে হবে।

প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে প্রথমে নিজেদের দুর্বলতা ও শক্তিমত্তা এবং তাদের দুর্বলতা ও শক্তিমত্তার জায়গাগুলো চিহ্নিত করতে হবে। এরপর আমাদেরকেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে সক্রিয় হতে হবে। কাজ করতে হবে।

১. পূর্ণ ঈমান ও আমলের দিকে দাওয়াত।

২. রাজনীতিকে ইসলাম মেনে পরিচালনা।
৩. অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের প্রচার।
৪. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধিকরণ ও সেগুলোর উন্নতি সাধন।
৫. মসজিদ ও খানকাহ আবাদ।
৬. ধর্মীয় পরিবেশে ও মানসম্মত পদ্ধতিতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান পাঠদানের উপযোগী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
৭. আধুনিক শিক্ষালয়, স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির ছাত্র, শিক্ষক ও পরিচালকদের দ্বীনের কাছাকাছি নিয়ে আসা।
৮. সেবামূলক কর্মকান্ডকে ব্যাপক, বিস্তৃত করা।
৯. মিডিয়া।
১০. শরীয়তের সীমারেখার ভেতরে থেকে খেলাধুলা, বিনোদন এবং হৃদয়গ্রাহী ও তথ্যসমৃদ্ধ প্রোগ্রাম বেশি বেশি আয়োজন করা।
১১. বাণিজ্য ও অর্থনীতিকে ইসলামের সীমারেখার ওপর পরিচালনা করা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ করা ইত্যাদি।
আমরা আশাবাদী, ইসলামের তরুণ শিক্ষার্থীরা চৈত্তিক, মতাদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সবগুলো অঙ্গনে চৌকস, সক্ষম ও যোগ্য সৈনিক হিসেবে গড়ে ওঠবে। অন্ধকার, হতাশা ও অন্যায় দু'পায়ে পিষে রচনা করবে ইসলামের বিজয়

দাস্তান। দিগন্তে ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে বিজয়ের নতুন সূর্যের
রূপালী আভা ।

দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার পার্থক্য:

শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার মাধ্যমে হযরত আদম আ.
ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ
তার রবকে চিনতে পারে, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা এবং হক-
বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। উন্নতি-অগ্রতি এবং উভয়
জাহানের শান্তি-সফলতা ও কামিয়াবীর সোপানে আরোহণ করতে
পারে। শিক্ষার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ “দ্বীনী ইলম অর্জন করা প্রত্যেক
মুসলমানের উপর ফরয।” (সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস নং ২২৪)

আমাদের দেশের অনেক বিজ্ঞজন (?) এই হাদীসে উল্লেখিত ইলম
বা বিদ্যা দ্বারা ব্রিটিশ সিলেবাস তথা দুনিয়াবী শিক্ষা উদ্দেশ্য নিয়ে
থাকেন, যা স্পষ্টই ভুল। কারণ যে শিক্ষার দ্বারা মানুষ নিজের রবকে
চিনতে পারে না, যে শিক্ষার দ্বারা মানুষ প্রকৃত অর্থে মানুষ হতে
পারে না, যে শিক্ষা গুনাহ থেকে বাঁচতে শিখায় না তাকে ইলম
বলে না। দুনিয়াবী শিক্ষা তো দূরের কথা, দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত
হওয়ার পরও কেউ যদি গুনাহ থেকে বেঁচে না থাকে, নিজেকে প্রকৃত

মানুষ হিসেবে গড়তে না পারে, তাহলে তার শিক্ষাকেও শরীয়াতের দৃষ্টিতে ইলম বলা হবে না। কারণ আল্লাহ তা‘আলা কুরআন মাজীদে বলেছেনঃ ‘নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে কেবল আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে’ (সূরা ফাতিরঃ২৮)। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, প্রকৃত আলেম তথা শিক্ষিত তারাই যারা আল্লাহকে ভয় করে। অতএব, ইলম তথা শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হতে হবে খোদা ভীতির উপর আর দ্বীনী শিক্ষার ভিত্তিও হলো খোদা ভীতির উপর। তাই হাদীসে বর্ণিত ইলম দ্বারা যে খালেস দ্বীনী শিক্ষা উদ্দেশ্য তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে তাহলে দুনিয়াবী বিদ্যা হাসিল করা কি জাযিয় নেই?

এর উত্তর হলো: ফরয পরিমাণ ইলম অর্জনের পরে কেউ যদি দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন করে, চাই দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ হাসিলের জন্য করুক বা দ্বীনের খেদমতের নিয়তে করুক, তাতে কোনো সমস্যা নেই; বরং শরীয়ত মোতাবেক চলে দ্বীনের খেদমতের উদ্দেশ্যে যদি কেউ দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন করে তাহলে তাতে সে সাওয়াবেরও আশা করতে পারে। কারণ হাদীসে এসেছে ‘কর্মের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভর করে’ (বুখারী হা. নং ১)

কিন্তু বাস্তব কথা হলো, স্কুল-কলেজে ফরয পরিমাণ ইলম শিক্ষা দেয়া হয় না এবং সেখানে শরীয়ত মোতাবেক চলতে উৎসাহিত করা হয় না; বরং সেখানে এমন অনেক মতবাদ শিক্ষা দেয়া হয় যা ঈমানের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনেক স্কুলের পরিবেশই এমন যে, কেউ চাইলেও শরীয়ত মোতাবেক চলতে পারে না। এমতাবস্থায় দুনিয়ার

৬০- ৭০ বছরের যিন্দেগীর কল্পিত সুখ- শান্তির আশায় নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে নৈতিকতা বিবর্জিত দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত করা উচিত হবে নাকি পরকালের অশেষ- অসীম যিন্দেগীর সুখ- শান্তি অর্জনের আশায় নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করা উচিত হবে ? এর ফয়সালার ভার সুবিবেচকের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হলো।

আজকাল লাখো মানুষ দ্বীনের সঠিক বুঝ না থাকার কারণে নিজের বুঝকে সঠিক মনে করে নিজের প্রাণপ্রিয় সন্তানকে দু- চার পয়সার লোভে কিংবা দুনিয়াবী সম্মানের আশায় দ্বীনী ইলম শিক্ষা না দিয়ে দুনিয়াবী শিক্ষা নামের ব্রিটিশদের তৈরি করা শিক্ষা কারিকুলাম পড়াচ্ছে।

আবার কেউ কেউ তো দ্বীনী শিক্ষার ব্যাপারে নিম্নোক্ত মন্তব্য করতেও কুষ্ঠা বোধ করে না।

১. ‘(কওমী) মাদরাসার বিদ্যা ফকীরি বিদ্যা’ (নাউযুবিল্লাহ) । অথচ কুরআন- হাদীসের ইলমের ব্যাপারে এমন মন্তব্য করার কারণে ঐ লোকের ঈমান ধ্বংস হওয়ার যথেষ্ট আশংকা রয়েছে।

২. ‘মাদরাসায় লেখা- পড়া করলে না খেয়ে মরবে’। অথচ দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত কোনো লোক না খেয়ে মরেছে এর কোন প্রমাণ বা উদাহরণ তারা দেখাতে পারে না এবং পারবেও না ইনশাআল্লাহ। কারণ আল্লাহ তা‘আলা তার প্রিয় বান্দাদেরকে না খাইয়ে মারবেন না।

৩. কিছু দ্বীনদার (?) লোক মনে করে সন্তানকে (কওমী) মাদরাসায় পড়ানোর দরকার নেই। স্কুল- কলেজে পড়াবো। তারপর

সন্তান বড় হলে তাকে দ্বীনের রাস্তায় মেহনত করার সুযোগ করে দিয়ে দ্বীনদার বানিয়ে নিব। অথচ স্কুলে পড়ে সে বদ্বীন হবেনা তার গ্যারান্টি কে দিবে? অথবা দ্বীনদার হওয়ার সুযোগ পাওয়ার আগেই সে মারা গেলে তার পরিণতি কী হবে? তা মোটেও ভেবে দেখে না।

মানুষ যাতে দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার পার্থক্য বুঝতে পেরে নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারে, তাই নিয়ে দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার মধ্যে বাস্তব কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হলো:

১. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর মহামানব তথা নবী-রাসূলগণের ওয়ারিশ অর্থাৎ তারা ‘নায়েবে নবী’। কেননা নবী-রাসূলগণ শুধু ইলমের ওয়ারিশ বানানকড়ির নয়। আর এরাও -অর্থ, পয়সার জন্য নয়।-টাকা, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইলম শিখে (৫২৩ নং.মাজমাউয যাওয়েদ হা))

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা ঐ শিক্ষার সিলেবাস যারা তৈরি করেছে তাদের ওয়ারিশ। নবী-রাসূলগণের ওয়ারিশ নয়, কেননা তারা শিক্ষা অর্জনই করে টাকা-পয়সা কিংবা কোনো পদ হাসিলের জন্য।

২. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদেরকে নবীগণের বাস্তব ওয়ারিশ বানানোর জন্য তাদেরকে ঈমান, আমল, দাওয়াত, তা’লীম, তায়কিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীদেরকে কীভাবে দুনিয়া উপার্জন করা যাবে তা শিক্ষা দেওয়া হয়। ঈমান- আমল সেখানে গুরুত্বহীন বিষয়।

৩. যারা দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয় তাদের সম্মানার্থে ফেরেশতারা নিজেদের নূরের পাখা বিছিয়ে দেয়। (আবু দাউদ হা. নং ৩৬৪১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার ছাত্রদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের পাখা বিছানোর কোনো হাদীস নেই।

৪. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা যেহেতু ইবাদত-বন্দেগী করে থাকে, তাই তাদের দ্বারাই আল্লাহ তা‘আলার দুনিয়াতে মানুষ পাঠানোর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়াতে মানুষ পাঠিয়েছেন তার ইবাদত করার জন্য। (সূরা যারিয়াতঃ ৫৬)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার দুনিয়ায় মানুষ পাঠানোর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে না। কারণ তারা সাধারণত আল্লাহর নির্দেশ মতো চলে না। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি উলামায়ে কেরামের সুহবতে আসে বা দাওয়াতের কাজে জুড়ে থাকে সেটা ভিন্ন কথা।

৫. খালেস দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কেউ বেকার থাকে না। তাদের কারণে দেশের বেকারত্ব বাড়ে না; বরং তারা একদিকে নিজ দেশে দ্বীনের খেদমত করছেন অন্য দিকে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইমাম, মুয়ায্যিন, মাদরাসার শিক্ষক হয়ে কিংবা অন্য কোন খেদমত করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছেন, যার দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের অনেকেই বেকার থাকছে। কারণ দুনিয়াবী শিক্ষাটা হলো ‘কর্মমুখী শিক্ষা’ অর্থাৎ এ শিক্ষায় শিক্ষিতরা দুনিয়ার বিভিন্ন কর্ম করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে কর্মের

সুযোগ কম থাকায় আর কর্মের প্রার্থী বেশি হওয়ায় অনেক বড় বড় ডিগ্রিধারীরাও বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষ অবধি বেকারত্বের কারণে কেউ অর্থ উপার্জনের অনৈতিক পথ বেছে নিচ্ছে, আবার কেউবা ছিনতাই রাহাজানির মতো ভয়ংকর পথ বেছে নিতে দ্বিধা করছে না।

৬. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষাকেন্দ্র কওমী মাদারেসে দ্বীনী শিক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজন পরিমাণ বাংলা, অংক, ইংরেজী ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হয়। আর এখানে সরকারের কোন অনুদান নেয়া হয় না। যার কারণে সরকার নিজের খেয়াল- খুশি মোতাবেক এখানকার সিলেবাস পরিবর্তন করতে পারে না।

পক্ষান্তরেঃ স্কুল- কলেজে প্রয়োজন পরিমাণ দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া হয় না। আর স্কুল- কলেজ সরকারী হওয়ায় বা এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সরকারের অনুদান গ্রহণ করায় সরকার চাইলেই নিজের খেয়াল- খুশি মোতাবেক সিলেবাস পরিবর্তন করতে পারে। আর এতে যে কী পরিমাণ ক্ষতি হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৭. কওমী মাদারেসে ফরযে আইন এবং ফরযে কেফায়া উভয় প্রকারের ইলম শিক্ষা দেয়া হয়, যার দ্বারা এখানকার শিক্ষার্থীরা নিজেকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতা থেকে বাঁচাতে পারে আবার সাধারণ মানুষকেও সিরাতে মুস্তাকীম এর উপর পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষা কেন্দ্র স্কুল- কলেজে ইলমের কিছু তো নেই- ই; বরং তাদের সিলেবাসে ঈমান বিধ্বংসী অনেক মতবাদ রয়েছে। যার একটি মানাই ঈমান ধ্বংস হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যেমনঃ জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে বাংলাদেশের মূল সমস্যা বলে আখ্যায়িত করা।

৮ দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদেরকে প্রকৃত অর্থে মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়। তাদেরকে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, গুরুজন, প্রতিবেশী এমনকি প্রাণীর হকও শিক্ষা দেওয়া হয়। যার ফলে তারা প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে উঠে।

পক্ষান্তরেঃ স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদেরকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয় না। পত্রিকা খুললেই স্কুল, কলেজ ও ভার্শিটির ছাত্রদের কীর্তি (?) দেখে চোখ ঝাঁদিয়ে যায়। আজকাল তো তারা বিশেষভাবে শিক্ষকদের পিটাতে বেশ দক্ষতা অর্জন করেছে। তাছাড়া ওখানকার ছাত্ররাই তো পথে-ঘাটে ইভ-টিজিং করে বেড়াচ্ছে।

৯. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা নিজ পিতা-মাতার জানাযা নামায পড়ানোর যোগ্যতাও অর্জন করে এবং কেবল তারাই সহীহভাবে পিতা-মাতার রুহে সাওয়াব রেসানী করতে পারে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত কোন লোকেরই এই যোগ্যতা নেই যে, সে ঐ বিদ্যা দিয়ে পিতা-মাতার জানাযা নামায পড়াবে বা তাদের রুহে সাওয়াব রেসানী করবে কিংবা তাদের মৃত্যুর পরের হকগুলো আদায় করবে।

১০. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা নিজ পিতা-মাতার জন্য সদকায়ে জারিয়া স্বরূপ। অর্থাৎ পিতা-মাতা মৃত্যুর পরও কিয়ামত পর্যন্ত আলেম তথা নেক সন্তানের নেক আমলের সওয়াব পেতে থাকবে। (তিরমিযী হা. নং ১৩৭৬)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকেই নিজ পিতা-মাতার জন্য গুনাহে জারিয়া স্বরূপ। অর্থাৎ পিতা-মাতা মৃত্যুর পরও তাদের বদ আমলের ভাগীদার হতে থাকে। কারণ তারা তাদেরকে কোনো

নেক আমল শিক্ষা দেয়নি এবং জীবিত অবস্থায় তাদেরকে গুনাহের কাজ করতে নিষেধ করেনি।

১১. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা দুনিয়ার মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার পথ দেখায় এবং জান্নাতের রাহবারী করে। এজন্যই তারা বিভিন্ন মাদরাসা- মসজিদে, মাঠে- ময়দানে কুরআন- হাদীসের কথা জনসাধারণকে শুনিয়ে থাকে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকেই মানুষকে জাহান্নামের পথ দেখায়। যেমনঃ তারা নাটক, সিনেমা ইত্যাদি তৈরি করে তা দেখার জন্য মানুষকে প্রেক্ষাগৃহে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। অনেকে লেখনীর মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করে। তাছাড়া আরো অগণিত উদাহরণ আপনি ভাবলেই পেয়ে যাবেন।

১২. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা যখন শিক্ষা অর্জনের জন্য বসে তখন ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয় এবং তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়। (জামিউ বয়ানিল ইলম হা. নং ৪৫)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো ফযিলত নেই; বরং তারা তো শিখতে বসে ক্লাস রুমেও অনেক গুনাহের কাজ করে। যেমনঃ ছেলেদের মেয়েদেরকে দেখা, মেয়েদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করা।

১৩. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা ইসলাম ধর্ম টিকিয়ে রাখছে। কারণ ইলম শিক্ষার ধারা বন্ধ হয়ে গেলে ধীরে- ধীরে পৃথিবী থেকে ইসলাম উঠে যাবে। আর সাধারণ মানুষ যে যতটুকুই দ্বীন পালন করছে বা দ্বীনের চর্চা করছে তা এদের উসিলায় করছে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজদের অনুকরণ করে এবং তাদের অর্থে পরিচালিত এনজিওগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে ইসলাম ধর্মের অস্তিত্ব মিটিয়ে দিতে সাহায্য করছে। বাংলাদেশে দিন দিন খৃষ্টানদের সংখ্যা বেড়ে চলাই এর প্রমাণ বহন করে। সামান্য অর্থের লোভে বাংলাদেশী ছেলে-মেয়েরাই তো এসব এনজিওতে কাজ করছে।

১৪. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শেষ পরিণাম কল্যাণকর হবে। কারণ আল্লাহ তা‘আলা যার কল্যাণ চান তাকেই দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন। (জামেউ বয়ানিল ইলম হা. নং ৮০.)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের শেষ পরিণাম অজানা; বরং বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তাদের শেষ পরিণাম সুখকর হবে না। যারা আল্লাহর হুকুম মানবে না তাদের শেষ পরিণতি খারাব হওয়াই স্বাভাবিক।

১৫. হাদীসের ভাষ্য মোতাবেক ‘দুনিয়ার গোটা সৃষ্টিজগত দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীর জন্য দু‘আ করে’। (আবু দাউদ হা. নং ৩৬৪১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা এ দু‘আ থেকে বঞ্চিত থাকে।

১৬. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা আল্লাহর বন্ধু। কারণ তারা আল্লাহর হুকুম মোতাবেক জীবন যাপন করে। আর তারা শয়তানের শত্রু কারণ তারা শয়তানের বিরুদ্ধাচরণ করে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা যদি কোনোভাবে দ্বীন না শিখে, চাই উলামায়ে কেরামের সুহবতে এসে হোক কিংবা অন্য কোনোভাবে হোক, তাহলে এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।

কারণ তখন তারা না জানার কারণে বা আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন না করার কারণে স্বাভাবিকভাবেই শয়তানের পথে পরিচালিত হবে।

১৭. প্রকৃত দ্বীনী শিক্ষার প্রকৃত শিক্ষার্থীরা মুসলমানদের সর্বক্ষেত্রে ইমাম হওয়ার (নেতৃত্ব দেয়ার) যোগ্যতা রাখে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা মুসলমানদের প্রতি দিনের আমল পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের ইমামতীটুকু করার যোগ্যতা রাখে না।

১৮. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা দুনিয়ার অর্থের লোভে নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় না।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা এক দুই টাকার লোভেও নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে কুণ্ঠা বোধ করে না। দুর্নীতিতে বাংলাদেশের বারবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হওয়াই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১৯. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা আল্লাহ তা'আলার নির্বাচিত বান্দা (সৈনিক)। এদের মাধ্যমে তিনি নিজ দ্বীনের হেফাজত করছেন।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা ইংরেজদের মানস সন্তান। কারণ তারা তাদের চিন্তা-চেতনাই লালন করে।

২০. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী, হক্কানী আলেম-উলামা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। কারণ গোমরাহীর অন্ধকারে মানুষ তাদের মাধ্যমে সুপথ পেয়ে থাকে। (মাজমাউযযাওয়ায়িদ হা. নং ৪৮৯)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের কোনো ফযিলত নেই; বরং তাদের কারো কারো মাধ্যমে পৃথিবী গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। তবে কেউ ব্যক্তিগতভাবে দ্বীনদার হলে সেটা ভিন্ন কথা।

২১. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের উসিলায় আল্লাহ তা‘আলা সারা দুনিয়ার মানুষকে রিযিক দিচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন এবং পরাচ্ছেন। (তাহযীবে তারীখে দামেস্ক ৫/ ৪৩৮)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্য থেকে অনেকের ভয়ানক গুনাহের কারণে দুনিয়ার মানুষকে আযাবে এবং দুর্ভিক্ষে পড়তে হয়।

২২. খালেস দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা (কওমী মাদরাসার ছাত্ররা) ইসলামের ইউনিফর্ম পরে থাকে। যেকেউ তাদেরকে দেখলেই খাঁটি মুসলিম মনে করতে বাধ্য হয়।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা বিধর্মীদের ইউনিফর্ম পরে থাকে। ফলে সে মুসলিম না কাফের বাহ্যিকভাবে তা বুঝার কোনো উপায় থাকে না।

২৩. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর ‘হায়াত’। যত দিন তারা দ্বীন চর্চায় লিপ্ত থাকবে ততদিন আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়াকে বহাল রাখবেন। কিয়ামাত ঘটাবেন না। (মুসলিম হা. নং ১৪৮)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা যত বড় ডিগ্রিধারীই হোক না কেন, তাদের কারণে আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়াকে টিকিয়ে রাখবেন না; বরং দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা যত বাড়বে পৃথিবী ততই কিয়ামাতের দিকে এগিয়ে যাবে।

২৪. দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিতরা মৃত্যু পর্যন্ত দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে থাকেন, অবসর গ্রহণ করেন না।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের অনেকে তো চাকুরিই পায় না। আর পেলেও ৩০- ৩৫ বছর পর অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

২৫. দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে হাশরের ময়দানে প্রচন্ড রোদের মাঝে যখন আল্লাহ তা'আলার আরশের ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, তখন তাদেরকে আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেওয়া হবে। (তিরমিযী হা. নং ২৩৯১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের জন্য এ ধরনের কোনো ওয়াদা বা আশ্বাস কুরআন- হাদীসের কোথাও বর্ণিত হয়নি; বরং তারা সংশোধন না হলে, হাশরের ময়দানে তাদেরকে ভয়ানক অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে।

২৬. দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিতদের লকব বা সনদ চিরস্থায়ী। বেহেশতে প্রবেশ করেও তারা এ উপাধিতে ভূষিত হবেন।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের সনদ একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। অবসর গ্রহণের পরই তাদের সনদ অনেকাংশে অকেজো হয়ে পড়ে। আর মরার পর কবরে ও হাশরে এ সনদের কোনো মূল্যায়নই হবে না।

২৭. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের পিতা- মাতা বা অন্য যে কেউ যত টাকা খরচ করে তাতে সে বে- হিসাব সাওয়াব পায়। (সহীহ ইবনে হিব্বান হা. নং ৪৬২৯)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য টাকা খরচ করলে সাওয়াব হবে এমন কোনো কথা কুরআন- হাদীসে নেই; বরং অনেক ক্ষেত্রে তাদের পিছনে টাকা ব্যয় করলে গুনাহ হয়। যেমনঃ অভিনয়,

নাচ- গান, প্রাণীর ছবি আঁকা ইত্যাদি শিখার ক্ষেত্রে যে টাকা ব্যয় করা হয় তাতে গুনাহ হয়।

২৮. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থী যদি ইলম শিক্ষা করা অবস্থায় ইন্তেকাল করে তাহলে সে শহীদে মর্যাদা লাভ করে। (আবু দাউদ হা. নং ৩৬৪১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থী শিক্ষাকালীন অবস্থায় মারা গেলে এ মর্যাদা পাবে না; বরং গুনাহের কোনো কিছু শিক্ষারত অবস্থায় মারা গেলে খারাব পরিণতির আশংকাই প্রবল।

২৯. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা মহান আল্লাহ তা'আলার পরিবারের সদস্য। সুতরাং পরকালে তাদের বিশেষ পাওয়ার থাকবে। (মুসনাদে আহমাদ ৩/ ১২৮)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা আল্লাহর পরিবারের সদস্য হওয়া তো দূরের কথা তারা অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহর শত্রু সাব্যস্ত হয়ে যায়।

৩০. সর্বোপরি দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের মাঝে খোদাভিরতা, নম্রতা, ভদ্রতা, এবং চারিত্রিক উৎকর্ষতার গুণ থাকার কারণে তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং বিভিন্ন ফেতনায় জর্জরিত সমাজকে জাহিলিয়াতের অতল গহবর থেকে উঠিয়ে হেদায়েতের আলোকে উদ্ভাসিত করতে পারে। আদর্শ, সুশীল সমাজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। যা দেশ ও জাতির জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষণ।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের দ্বারা অসামাজিক কার্য-কলাপ। যেমনঃ হত্যা, লুণ্ঠন, রাহাযানী, ধর্ষণ, ইভ-টিজিং,

গাড়ী ভাংচুর, মারা-মারি, কাটা-কাটি, নেশা-মদ্যপান ইত্যাদি জঘন্য কর্মকান্ড সংঘটিত হওয়ার কারণে আদর্শ সমাজও বর্বর যুগের অসভ্য সমাজে পরিণত হতে বাধ্য। আজ নৈতিকতা বিবর্জিত, ধর্মহীন শিক্ষার কারণেই দেশজুড়ে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। তারপরও কি আমরা সন্তানদেরকে দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত করার দুঃসাহস দেখাতে পারি!

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার এবং নিজ অধীনস্থদের উক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর শিক্ষাদান পদ্ধতি:

নবী মুহাম্মদ (সা.) সূচনা করে ছিলেন তার নবুওয়তি জীবনের। একটি সভ্য ও সুন্দর পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে আল্লাহতায়ালার যুগে যুগে মানব জাতির শিক্ষকরূপে নবীদেরকে প্রেরণ করেন।

প্রথম নবী হজরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হজরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সব নবীই ছিলেন শিক্ষার আলোয় আলোকিত এবং সু-শিক্ষার ধারক ও বাহক। মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সে ধারার সর্বশেষ ও সর্বোত্তম প্রেরিত পুরুষ। তার

মাধ্যমে ঐশী শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে। তিনি তার কার্যকর ও বাস্তবমুখী শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির মাধ্যমে আরবের মূর্খ ও বর্বর একটি জাতিকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করান এবং ইসলামের মহান বার্তা ছড়িয়ে দেন পৃথিবীর আনাচে কানাচে।

হজরত রাসূল (সা.) - এর শিক্ষা মিশন সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা কোরআনে কারিমে বলেন, ‘তিনিই সেই পবিত্র সত্ত্বা। যিনি নিরক্ষর লোকদের মধ্য থেকে একজনকে নবী করে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদেরকে তার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন, তাদেরকে পবিত্র করবেন, তাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও প্রজ্ঞা। যদিও ইতোপূর্বে তারা ভ্রান্তিতে (অজ্ঞতায়) মগ্ন ছিলো। ’ - সূরা জুমা : ০২

তিনি নিজেই বলেন, ‘নিশ্চয় আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি। ’ - সুনানে ইবনে মাজাহ : ২২৯

তার অনুপম শিক্ষানীতি ও পদ্ধতিতে মুগ্ধ ছিলেন তার পুণ্যাত্মা সাহাবি ও শিষ্যগণ। হজরত মুয়াবিয়া (রা.) বলেন, ‘তার জন্য আমার বাবা ও মা উৎসর্গিত হোক। আমি তার পূর্বে ও পরে তার চেয়ে উত্তম কোনো শিক্ষক দেখিনি। আল্লাহর শপথ! তিনি কখনো কঠোরতা করেননি,

কখনো প্রহার করেননি, কখনো গালমন্দ করেননি। ’ - সহিহ মুসলিম

আর কেনোই বা তিনি শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক হবেন না, যখন স্বয়ং আল্লাহতায়ালা তাকে সর্বোত্তম শিক্ষা ও শিষ্টাচার শিখিয়েছেন। রাসূল (সা.) বলেন, ‘আমাকে আমার প্রভু শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং আমাকে তিনি সর্বোত্তম শিক্ষা দিয়েছেন। আমার প্রভু আমাকে শিষ্টাচার শিখিয়েছেন সুতরাং তিনি সর্বোত্তম শিষ্টাচার শিখিয়েছেন। ’

তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাফল্যের জন্য সর্বোত্তম শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। নিম্নে রাসূল (সা.) - এর অনুসৃত কয়েকটি শিক্ষাপদ্ধতি তুলে ধরা হলো।

উপযুক্ত পরিবেশে শিক্ষাদান :

শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ অপরিহার্য। কোলাহলপূর্ণ বিশৃঙ্খল পরিবেশ শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষক উভয়ের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশের অপেক্ষা করতেন। হজরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। ‘নিশ্চয় বিদায় হজের সময় রাসূল (সা.) তাকে বলেন, মানুষকে চুপ করতে বল। অতপর তিনি বলেন, আমার পর তোমরা কুফরিতে ফিরে যেয়ো না । ’ - সহিহ বোখারি : ৭০৮০

অর্থাৎ রাসূল (সা.) শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে স্থির হওয়ার এবং মনোসংযোগ স্থাপনের সুযোগ দিতেন। অতপর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলে শিক্ষাদান শুরু করতেন।

থেমে থেমে পাঠদান :

রাসূলুল্লাহ (সা.) পাঠদানের সময় থেমে থেমে কথা বলতেন। যেনো তা গ্রহণ করা শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ হয়। খুব দ্রুত কথা বলতেন না যেনো শিক্ষার্থীরা ঠিক বুঝে উঠতে না পারে আবার এতো ধীরেও বলতেন না যাতে কথার ছন্দ হারিয়ে যায়। বরং তিনি মধ্যম গতিতে থেমে থেমে পাঠ দান করতেন। হজরত আবু বাকরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, ‘তোমরা কী জানো- আজ কোন দিন? . . . এটি কোন মাস? . . . এটি কী জিলহজ নয়? . . . এটি কোন শহর?’ - সহিহ বোখারি :

১৭৪১

প্রতিটি প্রশ্নের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) চুপ থাকেন এবং সাহাবারা উত্তর দেন আল্লাহ ও তার রাসূল ভালো জানেন।

ভাষা ও দেহভাষার সমন্বয় :

রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো বিষয়ে আলোচনা করলে, তার দেহাবয়বেও তার প্রভাব প্রতিফলিত হতো। তিনি দেহ-মনের সমন্বিত ভাষায় পাঠ দান করতেন। কারণ, এতে বিষয়ের গুরুত্ব, মাহাত্ম্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে শ্রোতা শিক্ষার্থীগণ সঠিক ধারণা লাভে সক্ষম হয় এবং বিষয়টি তার অন্তরে গেঁথে যায়। যেমন, তিনি যখন জান্নাতের কথা বলতেন, তখন তার দেহে আনন্দের স্ফূরণ দেখা যেতো। জাহান্নামের কথা বললে ভয়ে চেহারার রঙ বদলে যেতো। যখন কোনো অন্যায় ও অবিচার সম্পর্কে বলতেন, তার চেহারায় ক্রোধ প্রকাশ পেতো এবং কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যেতো। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘রাসূল (সা.) যখন বক্তব্য দিতেন- তার চোখ লাল হয়ে যেতো, আওয়াজ উঁচু হতো এবং ক্রোধ বৃদ্ধি পেতো। যেনো তিনি (শত্রু) সেনা সম্পর্কে সতর্ককারী।’ - সহিহ মুসলিম : ৪৩

গল্প বলার মিষ্টি ভঙ্গি :

গল্প- ইতিহাস জ্ঞানের সমৃদ্ধ এক ভাণ্ডার। শিক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষককে অনেক সময় গল্প- ইতিহাস বলতে হয়। রাসূল (সা.) ও পাঠদানের সময় গল্প বলতেন। তিনি গল্প বলতেন অত্যন্ত মিষ্টি করে। এমন মিষ্টি ভঙ্গি গল্প- ইতিহাস স্বপ্রাণ হয়ে উঠতো। জীবন্ত হয়ে উঠতো শ্রোতা- শিক্ষার্থীর সামনে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ‘দোলনায় কথা

বলেছে তিনজন। হজরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) . . . ।
 হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি (মুগ্ধ হয়ে)
 রাসূল (সা.) - এর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তিনি আমাকে
 শিশুদের কাজ সম্পর্কে বলছিলেন। তিনি তার মুখে আঙুল
 রাখলেন। এবং তাতে চুমু খেলেন। ’ - মুসনাদে আহমদ :
 ৮০৭১

অর্থাৎ তিনি শিশুদের মতো ঠোঁট গোল করে তাতে আঙুল
 ঠেকালেন।

শিক্ষার্থীর নিকট প্রশ্ন করা :

রাসূল (সা.) পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীদের নিকট প্রশ্ন
 করতেন। যেনো তারা প্রশ্ন করতে এবং তার উত্তর খুঁজতে
 অভ্যস্ত হয়। কেননা নিত্যনতুন প্রশ্ন শিক্ষার্থীকে নিত্যনতুন
 জ্ঞান অনুসন্ধানে উৎসাহী করে। হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল
 (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)
 জিজ্ঞেস করেন, হে মুয়াজ! তুমি কী জানো বান্দার নিকট
 আল্লাহর অধিকার কী? তিনি বলেন, আল্লাহ ও তার রাসূল
 ভালো জানেন। রাসূল (সা.) বলেন, তার ইবাদত করা
 এবং তার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক না করা। ’ - সহিহ
 বোখারি : ৭৩৭৩

বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা :

বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা থাকলে শিক্ষার্থী শ্রেণী কক্ষে অনেক বেশি মনোযোগী হয়। একাগ্র হয়ে শিক্ষকের আলোচনা শোনে। রাসূল (সা.) পাঠদানের সময় বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলতেন। হজরত সাঈদ ইবনে মুয়াল্লা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) তাকে বলেন, ‘মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে আমি তোমাদেরকে কোরআনের সবচেয়ে মহান সূরাটি শিক্ষা দেবো। তিনি বলেন, আমি যখন বের হওয়ার ইচ্ছে করলাম রাসূল (সা.) আমার হাত ধরে বললেন, তোমাকে বলিনি! মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে তোমাকে কোরআনে সবচেয়ে মহান সূরা শিক্ষা দেবো। অতপর তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ’

- সহিহ বোখারি : ৪৪৭৪

অর্থাৎ রাসূল (সা.) তাকে সূরা ফাতেহা শিক্ষা দেন।

আগ্রহী শিক্ষার্থী নির্বাচন :

রাসূলুল্লাহ (সা.) বিশেষ বিশেষ শিক্ষাদানের জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থী নির্বাচন করতেন। যেনো শেখানো বিষয়টি দ্রুত ও ভালোভাবে বাস্তবায়িত হয়। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, আমার উম্মতের মধ্য

থেকে কে পাঁচটি গুণ ধারণ করবে এবং তার ওপর আমল করবে? তিনি বলেন, আমি বলি, আমি হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি আমার হাত ধরলেন এবং হাতে পাঁচটি বিষয় গণনা করলেন। - মুসনাদে আহমদ : ৮০৯৫

উপমা দিয়ে বোঝানো :

নবী করিম (সা.) অনেক সময় কোনো বিষয় স্পষ্ট করার জন্য উপমা ও উদাহরণ পেশ করতেন। কেননা উপমা ও উদাহরণ দিলে যে কোনো বিষয় বোঝা সহজ হয়ে যায়। হজরত সাহাল ইবনে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘আমি ও এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে এমনভাবে অবস্থান করবো। হজরত সাহাল (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) তার শাহাদত ও মধ্যমা আঙুলের প্রতি ইঙ্গিত করেন। ’ - সহিহ বোখারি : ৬০০৫

শিক্ষার্থীর প্রশ্নগ্রহণ এবং প্রশ্নের জন্য প্রসংশা করা :

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের আলোচনা শুনে শিক্ষার্থীর মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। এসব প্রশ্নের সমাধান না পেলে অনেক সময় পুরো বিষয়টিই শিক্ষার্থীর নিকট অস্পষ্ট থেকে যায়। সে পাঠের পাঠোদ্ধার করতে পারে না। আর প্রশ্নের উত্তর দিলে বিষয়টি যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি শিক্ষার্থী জ্ঞানার্জনে আরো আগ্রহী হয়। রাসূল (সা.) শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থীর প্রশ্ন

গ্রহণ করতেন এবং প্রশ্ন করার জন্য কখনো কখনো প্রশ্নকারীর প্রশংসাও করতেন। হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত। ‘এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) কে প্রশ্ন করে, আমাকে বলুন! কোন জিনিস আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দিবে এবং কোন জিনিস জাহান্নাম থেকে দূরে সড়িয়ে নিবে। নবী করিম (সা.) থামলেন এবং তার সাহাবাদের দিকে তাকালেন। অতপর বললেন, তাকে তওফিক দেওয়া হয়েছে বা তাকে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে।’ –সহিহ মুসলিম : ১২

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, রাসূল (সা.) প্রশ্নটি শুনেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেননি। বরং তিনি চুপ থাকেন এবং সাহাবিদের দিকে তাকিয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং প্রশ্নকারীর প্রশংসা করেন। যাতে প্রশ্নটির ব্যাপারে সকলের মনোযোগ সৃষ্টি হয় এবং সকলেই উপকৃত হতে পারে।

আমলের মাধ্যমে শিক্ষাদান :

শিক্ষার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হলো প্রাক্টিক্যাল বা প্রয়োগিক শিক্ষা। রাসূল (সা.) অধিকাংশ বিষয় নিজে আমল করে সাহাবিদের শেখাতেন। শেখাতেন হাতে-কলমে। এজন্য হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো কোরআন। রাসূল (সা.) বলেন, ‘তোমরা

নামাজ আদায় কর, যেমন আমাকে আদায় করতে দেখো। ’
- সুনানে বায়হাকি : ৩৬৭২

বিবেকের মুখোমুখি করা :

বিবেক মানুষের বড় রক্ষক। বিবেক জাগ্রত থাকলে মানুষ নানা অপরাধ থেকে বেঁচে যায় এবং বিবেকলুপ্ত হলে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তাই মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার একটি সহজ উপায় হলো- মানুষের বিবেক ও মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলা। রাসূল (সা.) বিবেক ও মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলার মাধ্যমেও মানুষকে শিক্ষাদান করেছেন। যেমন- এক যুবক রাসূল (সা.) কে বললো। হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ব্যভিচারের অনুমতি দিন। তার কথা শুনে উপস্থিত লোকেরা মারমুখি হয়ে উঠলো এবং তিরস্কার করলো। রাসূল (সা.) তাকে কাছে ডেকে নিলেন এবং বললেন, তুমি কী তোমার মায়ের ব্যাপারে এমনটি পছন্দ কর? সে বললো, আল্লাহর শপথ না। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন। রাসূল (সা.) বললেন, কেউ তার মায়ের ব্যাপারে এমন পছন্দ করে না। এরপর রাসূল (সা.) একে একে তার সব নিকট নারী আত্মীয়ের কথা উল্লেখ করেন এবং সে না উত্তর দেয়। এভাবে রাসূল (সা.) তার বিবেক জাগ্রত করে তোলেন। - মুসনাদে আহমদ : ২২২১১

রেখাচিত্রের সাহায্যে স্পষ্ট করা :

কখনো কখনো কোনো বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য রাসূল (সা.) রেখাচিত্র ও অঙ্কনের সাহায্য নিতেন। যেনো শ্রোতা ও শিক্ষার্থীর স্মৃতিতে তা রেখাপাত করে। হজরত আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘রাসূল (সা.) একটি চারকোণা দাগ দিলেন। তার মাঝ বরাবর দাগ দিলেন। যা তা থেকে বের হয়ে গেছে। বের হয়ে যাওয়া দাগটির পাশে এবং চতুষ্কোণের ভেতরে ছোট ছোট কিছু দাগ দিলেন। তিনি বললেন, এটি মানুষ। চতুষ্কোণের ভেতরের অংশ তার জীবন এবং দাগের যে অংশ বের হয়ে গেছে সেটি তার আশা। ’ - সহিহ বোখারি : ৬৪১৭

এভাবে রাসূল (সা.) রেখাচিত্রের সাহায্যে মানুষের জীবন ও জীবনের সীমাবদ্ধতার বিষয় স্পষ্ট করে তুললেন।

বার বার পাঠে উদ্বুদ্ধকরণ :

রাসূলে আকরাম (সা.) শিক্ষার্থীদের মেধা ও স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর না করে বার বার পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ করতেন; বরং বার বার পাঠ করে কঠিন বিষয়কে আয়ত্ত্ব করতে বলতেন। হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, ‘তোমরা কোরআনের ব্যাপারে

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হও। সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার
জীবন তা উটের চেয়ে দ্রুত স্মৃতি থেকে পলায়ন করে। ’ –
সহিহ বোখারি : ৫০৩৩

আশা ও ভয়ের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি :

রাসূলে আকরাম (সা.) শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের অনাগত
জীবন সম্পর্কে যেমন আশাবাদী করে তুলতেন, তেমনি তার
চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতেন। যেমন-
হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘রাসূল
(সা.) একটি ভাষণ দিলেন। আমি এমন ভাষণ আর
শুনিনি। তিনি বলেন, আমি যা জানি তা যদি তোমরা
জানতে তবে অল্প হাসতে এবং বেশি কাঁদতে। ’ - সহিহ
বোখারি : ৪৬২১

হজরত আবু জর গিফারি (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল
(সা.) বলেন, যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাহ’ বললো এবং
তার ওপর মৃত্যুবরণ করলো, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ
করবে। আমি বললাম, যদি সে ব্যভিচার করে এবং চুরি
করে? রাসূল (সা.) বলেন, হ্যাঁ। যদি সে ব্যভিচার করে
এবং চুরি করে। ’ - সহিহ বোখারি : ৫৪২৭

মুক্ত আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান :

মুক্ত আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে বহু জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয় সহজ হয়ে যায় এবং উত্তম সমাধান পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও বহু বিষয় মুক্ত আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান করতেন। সমাধান বের করতেন। যেমন, হুনায়েনের যুদ্ধের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন নিয়ে আনসার সাহাবায়ে কেরামের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিলে রাসূল (সা.) তাদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা করেন। একইভাবে বদর যুদ্ধের বন্দিদের ব্যাপারে সাহাবিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। - সহিহ বোখারি ও মুসলিম

গুরুত্বপূর্ণ কথার পুনরাবৃত্তি :

রাসূল (সা.) তার পাঠদানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ তিন বার পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করতেন। হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘রাসূল (সা.) তার কথাকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন যেনো তা ভালোভাবে বোঝা যায়। ’ - শামায়েলে তিরমিজি : ২২২

ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষাদান :

রাসূলুল্লাহ (সা.) ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন। হজরত আবু মাসউদ আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর নিকট অভিযোগ করে যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি

নামাজে অংশগ্রহণ করতে পারি না। কারণ অমুক ব্যক্তি নামাজ দীর্ঘায়িত করে ফেলে। আমি উপদেশ বক্তৃতায় রাসূল (সা.) কে সেদিনের তুলনায় আর কোনোদিন বেশি রাগ হতে দেখিনি। রাসূল (সা.) বলেন, ‘হে লোক সকল! নিশ্চয় তোমরা অনীহা সৃষ্টিকারী। সুতরাং যে মানুষ নিয়ে (জামাতে) নামাজ আদায় করবে, সে তা যেনো হাক্কা করে (দীর্ঘ না করে)। কেননা তাদের মধ্যে অসুস্থ, দুর্বল ও জুল-হাজাহ (ব্যস্ত) মানুষ রয়েছে। - সহিহ বোখারি : ৯০

শাস্তিদানের মাধ্যমে সংশোধন :

গুরুতর অপরাধের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো তার শিষ্য ও শিক্ষার্থীদের শাস্তি প্রদান করে সংশোধন করতেন। তবে রাসূল (সা.) অধিকাংশ সময় শারীরিক শাস্তি এড়িয়ে যেতেন। ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেন। যেমন উপযুক্ত কারণ ব্যতীত তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করায় হজরত কাব ইবনে মালেক (রা.) সহ কয়েকজনের সঙ্গে রাসূল (সা.) কথা বলা বন্ধ করে দেন। যা শারীরিক শাস্তির তুলনায় অনেক বেশি ফলপ্রসূ ছিলো।

রাসূল (সা.) - এর শিক্ষাদান পদ্ধতির সামান্য কিছু দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা হলো। এ বিষয়ে প্রাজ্ঞ পণ্ডিতদের দীর্ঘ কলেবরের স্বতন্ত্র বই রয়েছে।

শিক্ষাদান পদ্ধতিতে রাসূল (সা.) - এর সাফল্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত থেকে। তাহলো, ‘স্মরণ করো! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। যখন তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু। অতপর আল্লাহতায়ালা তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা সঞ্চার করলেন। তার অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাইয়ে পরিণত হলে। প্রকৃতার্থে তোমরা অবস্থান করছিলে অগ্নিকুণ্ডের প্রান্ত সীমায়। অতপর আল্লাহ তোমাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করলেন। এভাবে আল্লাহতায়ালা তোমাদের জন্য তার নিদর্শন স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পাও। - সূরা আল ইমরান : ১০৩

অর্থাৎ রাসূল (সা.) পতনুখ একটি জাতিকে তার কার্যকর শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করান। তার শিক্ষা ও সাফল্য শুধু ইহকালীন সাফল্য বয়ে আনেনি; বরং তার পরিব্যাপ্তি ছিলো পরকালীন জীবন পর্যন্ত। সুতরাং মুসলিম উম্মাহকে যদি তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে হয় এবং উভয় জগতের সাফল্য অর্জন করতে হয়, তবে অবশ্যই রাসূল (সা.) - এর শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

শাসনের নীতি:

ইসলামের সকল শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ এবং সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য পূর্ণ কল্যাণকর। তা'লীম- তরবিয়তের ক্ষেত্রেও ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ দিক- নির্দেশনা রয়েছে। তাতে যেমন নম্রতা ও সহনশীলতার নির্দেশনা আছে, তেমনি আছে শাস্তি ও শাসনের বিধান। তরবিয়তের ক্ষেত্রে শাস্তির কোনো প্রয়োজন নেই- এটা যেমন অবাস্তব কথা তেমনি শাস্তিকে তরবিয়তের প্রধান উপায় মনে করাও মূর্খতা। বস্তুত শাস্তি হচ্ছে ঔষধের মতো। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যেমন ঔষধের প্রয়োজন তেমনি তা'লীম- তরবিয়তের ক্ষেত্রে প্রয়োজন শাস্তি ও শাসনের।

তবে একথা বলাই বাহুল্য যে, সুস্বাস্থ্যের মূল উপাদান ঔষধ নয়। সুস্বাস্থ্যের জন্য মূল উপাদান হল পুষ্টিকর খাবার, পরিমিত শরীরচর্চা, প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপন ইত্যাদি। এরপর অসুখ-বিসুখ হলে প্রয়োজন হয় চিকিৎসা ও ঔষধ ব্যবহারের। অতএব এর প্রয়োজনীয়তা বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সীমাবদ্ধ। আর এ ক্ষেত্রেও রোগ- নির্ণয়, ঔষধ নির্বাচন, ব্যবহারের নিয়ম ও মাত্রা ইত্যাদির জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হয়। তরবিয়তের ক্ষেত্রে শাস্তির বিষয়টিও এখান থেকে অনুমান করে নেওয়া যায়।

মূলপন্থা নম্রতা ও সহনশীলতা:

শিশুদের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব শাসন এড়িয়ে চলা উচিত। ধৈর্য্য ও সহনশীলতা সঙ্গে তাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। যখন শাসনের প্রয়োজন হয় তখন পূর্ণ সংযম ও দূরদর্শিতার পরিচয় না দিলে শিশুর উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়।

আল্লামা ইবনে খালদুন রাহ. “আলমুকাদিমা”-য় লিখেছেন যে, ‘শিশুর সঙ্গে যদি অতিরিক্ত দুর্ব্যবহার ও কঠিন আচরণ করা হয় তাহলে তারা ভীৰু, অলস ও পলায়নপর হয়ে যায়। তাদের উদ্যম ও প্রফুল্লতা বিনষ্ট হয়ে যায় এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।

‘শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা মিথ্যাচার ও তোষামোদ রপ্ত করে ফেলে। একসময় এগুলোই তাদের স্বভাবে পরিণত হয় এবং আত্মমর্যাদা, সৎসাহস ও উন্নত চিন্তা ইত্যাদি গুণাবলি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। এরপর শাস্তি ও চাপের পরিবেশ থেকে মুক্তি লাভ করলেও ওই সব গুণাবলি আর তার মধ্যে সৃষ্টি হয় না।’

ইমাম গাযালী রাহ. শিশুদের তরবিয়ত-সংক্রান্ত এক দীর্ঘ আলোচনায় বলেন, ‘শিশু যখন কোনো ভালো কাজ করে তখন তাকে বাহবা দেওয়া উচিত এবং অন্যদের সামনে তাকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করা উচিত। পক্ষান্তরে কখনো যদি বিপরীত কিছু দেখা যায় তাহলে তা না দেখার ভান করে এড়িয়ে যাওয়া উচিত। বিশেষত শিশু যখন নিজেই তা লুকিয়ে রাখতে সচেষ্ট। আর তাকে সর্বদা ধমক দেওয়া উচিত নয়। কেননা এতে সে ভৎসনা শুনতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। পিতা তাকে মাঝে মাঝে ভৎসনা করবেন। আর মা তাকে

পিতার ভয় দেখিয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবেন।’- ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন-

শিশুর মনোদৈহিক বিকাশে তার চারপাশের পরিবেশ কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আরেকটি বক্তব্য থেকে বোঝা যায়।

(শিশুর স্বভাব- চরিত্রের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। লক্ষ্য রাখতে হবে, তাকে যেন চরম ক্রোধ, প্রচণ্ড ভীতি, কিংবা দুঃখ- বেদনা ও রাত্রি জাগরণের মুখোমুখি না হতে হয়। তার চাহিদা ও পছন্দের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে যেন সেগুলো পূরণ করা যায় আর তার অপসন্দগুলোও লক্ষ্য করতে হবে যেন সেগুলো থেকে তাকে দূরে রাখা যায়। এর ইতিবাচক প্রভাব তার শরীর ও মন উভয় ক্ষেত্রেই পড়ে থাকে। কেননা, শিশুর মন যদি ভালো থাকে তাহলে তার স্বভাব ও আচরণও সুন্দর হবে। আর উত্তম স্বভাব ও আচরণ যেমন শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করে তেমনি মানসিক সুস্থতাও)।

বলাবাহুল্য যে, উপরোক্ত মনীষীদের বক্তব্য সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত। কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তিই এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করবেন না।

আমরা যদি একদম গোড়ায় যাই এবং জগতের সর্বোত্তম শিক্ষক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর আদর্শ লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে, শিশুদের সঙ্গে তাঁর আচরণ কত কোমল ছিল।

হাদীস শরীফ থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে দিচ্ছি :

১. হযরত বুয়ায়দা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে হাসান ও হুসাইন

মসজিদে প্রবেশ করল। তাদের পরনে ছিল লাল রংয়ের জামা। তারা দৌড়ে আসছিল এবং পড়ে যাচ্ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন খুতবা শেষ না করেই মিম্বর থেকে নেমে এলেন এবং তাদেরকে কোলে তুলে নিলেন। এরপর বললেন, ‘তোমাদের সম্পদ ও সন্তান তোমাদের জন্য পরীক্ষার বিষয়।’ আমি শিশু দু’টিকে দেখলাম যে, তারা দৌড়ে আসছে এবং পড়ে যাচ্ছে। তখন আমার পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ করা সম্ভব হল না।’- জামে তিরমিযী ২/ ২১৮

২. হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমি দীর্ঘ নামাযের ইচ্ছা নিয়ে নামায আরম্ভ করি, কিন্তু যখন কোনো শিশুর ক্রন্দনের আওয়াজ শুনি তখন নামায সংক্ষিপ্ত করে দেই। কেননা, আমি জানি, শিশুর ক্রন্দনে মার অবস্থা কেমন হয়!’- সহীহ বুখারী, হাদীস ৭০৯
প্রসঙ্গত, শিশুদের তা’লীম- তরবিয়তের দায়িত্বে নিয়োজিত সম্মানিত উস্তাদগণের জন্য এখানে চিন্তার উপকরণ রয়েছে। শিশুদের শাসনের সময় আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর অনুসরণে চিন্তা করতে পারি যে, এ অবস্থাটা যদি তার মার সামনে হয় তাহলে তাঁর কেমন লাগবে?

৩. হযরত আনাস রা. কয়েকজন শিশুর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম দিলেন। এরপর বললেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে শিশুদের সালাম দিয়েছেন।’- সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬২৪৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১৬৮

৪. ইমাম মুসলিম রাহ. বর্ণনা করেন, লোকেরা তাদের প্রথম ফল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর কাছে নিয়ে আসত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হাতে নিয়ে দুআ করতেন- ‘ইয়া আল্লাহ, আমাদের ফলফলাদিতে বরকত দিন, আমাদের শহরে বরকত দিন, আমাদের ছা’ তে বরকত দিন, আমাদের মুদে বরকত দিন।’ এরপর কোনো শিশুকে ডেকে তা দিয়ে দিতেন।-

সহীহ মুসলিম ১/ ৪৪২

শিশুদের সঙ্গে কোমল আচরণই ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর আদর্শ।

পরবর্তী সময়ের মনীষীগণ যতই গবেষণা করেছেন ততই তার সুফল প্রকাশিত হয়েছে। শিশুর মনোদৈহিক বিকাশে কোমল ব্যবহারের বিকল্প নেই।

এজন্য শিশুর তরবিরের ক্ষেত্রে মূল পন্থা হল, কোমলতা ও সহনশীলতা। যে কোনো ভুল- ত্রুটি নজরে পড়লেই শাস্তির কথা ভাবা উচিত নয়। প্রথমে ক্ষমার কথা চিন্তা করা উচিত। ইমাম নববী রাহ. বলেন, ‘তাকে (ছাত্রকে) আপন সন্তানের মতো মমতা করবে এবং তার অন্যায় আচরণ ক্ষমা করে দিবে। কখনো কোনো বে- আদবী প্রকাশ পেলে ক্ষমা করে দিবে। কেননা, মানুষমাত্রই ভুল করে থাকে।’

এরপর কোমলতার সঙ্গে সংশোধনের চেষ্টা করবে।

শিশুর মন- মানস এবং স্বভাব- প্রকৃতির দিকে লক্ষ রাখা কখনো শাস্তির প্রয়োজন হলে ঔষধ নির্ণয়ের মতো শাস্তির ধরন ও পরিমাণ নির্ণয়ে অত্যন্ত বিচক্ষণ হতে হবে। আমাদের ভুলে গেলে

চলবে না যে, শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য ক্রোধ চরিতার্থ করা নয়; উদ্দেশ্য হল শিশুর সংশোধন। এজন্য শাস্তির বিষয়ে অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সংযমের পরিচয় দেওয়া কর্তব্য।

সব শিশু প্রকৃতিগতভাবে এক ধরনের নয়। কেউ সামান্য তাস্বীহ দ্বারাই ঠিক হয়ে যায় আবার কাউকে শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কেউ শাস্তির দ্বারা সংশোধিত হয়, কেউ আরো বিগড়ে যায়। এ বিষয়গুলো আগে থেকেই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্থির করা উচিত এবং যার জন্য যে পরিমাণ তাস্বীহ প্রয়োজন তার জন্য তা-ই প্রয়োগ করা উচিত।

তাস্বীহ ও শাস্তির ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রম অনুসরণ করা

অনেকে বেত ও শাস্তিকে সমার্থক মনে করে থাকেন। যেন বেত ছাড়া শাস্তির কোনো উপায় নেই। অথচ এটা হল সর্বশেষ ব্যবস্থা। পূর্বের ব্যবস্থাগুলো পরীক্ষা না করে চূড়ান্ত ব্যবস্থা প্রয়োগ করা কোনোভাবেই সমীচীন নয়।

ইবনে মাছকইয়াহ বলেন, ‘শিশুর প্রথম ভুল ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। পুনরায় ওই ভুল হলে পরোক্ষভাবে তাস্বীহ করবে। যেমন তার উপস্থিতিতে বলা হল, ‘এই কাজ করা ঠিক নয়। কেউ যদি তা করে থাক তবে সাবধান হয়ে যাও। এরপর সরাসরি তাস্বীহ করা যায়। এরপরও যদি ওই ভুল হয় তাহলে হালকা প্রহার করা যায়। এই সবগুলো পর্যায় অতিক্রম করার পরও যদি দেখা যায় সে সংশোধিত হয়নি তাহলে কিছুদিন তাকে আর কিছু বলবে না। এরপর আবার প্রথম থেকে আরম্ভ করবে।

এ প্রসঙ্গে তিনি ইমাম মাওয়ারদী রাহ. - এর একটি নির্দেশনা উল্লেখ করেছেন। তা এই যে, ‘শিশুকে সংশোধন করা মুরব্বীর জন্য কঠিন হয়ে গেলে এবং অব্যাহত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তার মধ্যে আনুগত্য সৃষ্টি না হলে করণীয় হচ্ছে কিছু সময় তাকে অবকাশ দেওয়া। এরপর নতুনভাবে প্রচেষ্টা আরম্ভ করা।’- আততারবিয়াতু ওয়াত তা’লীম ফিলফিকরিল ইসলামী #

ইসলামে শিশু নির্যাতন হারাম:

শিশুরা পবিত্রতার প্রতীক। শিশুরা নিষ্পাপ। শিশুরা আনন্দের উপকরণ ও প্রেরণার উৎস। তাই শিশুদের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করা জরুরি। কোরআন মজিদে বর্ণিত হয়েছে: ‘আল্লাহ তোমাদের থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উত্তম জীবন উপকরণ দিয়েছেন। (সূরা-১৬ নাহল, আয়াত: ৭২)। শিশু মানবজাতির অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শৈশবেই মানুষের জীবনের গতিপথ নির্ধারিত হয়। তাই শৈশবকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে বেড়ে ওঠার জন্মগত অধিকার রয়েছে। শিশুদের জন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা

আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু দেখা যায়, আমাদের সমাজে শিশুরা অহরহ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

শিশুদের শারীরিক শাস্তি একটি সামাজিক ব্যাধি

শিশুদের শারীরিক শাস্তি আমাদের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে অঘোষিতভাবে অনুমোদিত হয়ে রয়েছে। এটি পারিবারিক নেতিবাচক মূল্যবোধ থেকে সৃষ্ট ও সামাজিক নৈতিক অবক্ষয়ের কুফল। শিশুর পিতা, মাতা ও অভিভাবকেরা নিজেরা এর সঙ্গে সরাসরি জড়িত এবং তাঁরা শিক্ষকসহ অন্যদের এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান ও সহযোগিতা দান করে থাকেন। আমাদের সমাজে অনেক শিশু শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। সমাজের সব স্তরের মানুষের একটি বড় অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর সঙ্গে জড়িত না থাকলে এত শিশু শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হওয়ার কথা নয়। শিশুদের শারীরিক শাস্তি ও মানসিক নির্যাতন বর্তমানে একটি সামাজিক ব্যাধিরূপে আবির্ভূত হয়েছে। এটি অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়; এর আশু নিরসন প্রয়োজন। শিশুদের শারীরিক শাস্তির মতো বর্বর সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন সামাজিক উদ্যোগ।

শিশুদের সুশাসন বনাম শারীরিক নির্যাতন

ইসলামের বিধানগুলো যৌক্তিক ও মানবিক। শিশুর সুনাগরিক হয়ে গড়ে ওঠার জন্য পিতা, মাতা, শিক্ষক ও অভিভাবকের সুশাসন অবশ্যই সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু শাসনের নামে নির্যাতন ইসলাম অনুমোদন করে না। এটি অমানবিক জুলুমা। শিশুরা বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন রকম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। সাধারণত শারীরিক শাস্তিটা পরিবারে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই বেশি হয়। গড়ে শিশুর ৩ বছর থেকে ১৩ বছর বয়সের মধ্যে শারীরিক শাস্তি বেশি দৃশ্যমান হয়ে থাকে; এর মধ্যে বয়স ৭ বছর থেকে ১১ বছর সময়ে শারীরিক শাস্তিটা বেশি

পরিলক্ষিত হয়। নাবালেগ মাসুম (নিষ্পাপ) শিশুদের শাসনের নামে এমন শাস্তি প্রদান যাতে শরীরের কোনো অংশ কেটে যায়, ফেটে যায়, ছিঁড়ে যায়, ভেঙে যায়, ফুলে যায়, ক্ষত হয়, বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয় অথবা মানসিক ক্ষতি হয়; ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক, কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে এবং ফিকহের বিধানমতে সম্পূর্ণরূপে হারাম, নাজায়েজ, অবৈধ, অনৈতিক, অমানবিক ও বেআইনি এবং কবিরী গুনাহ বা বড় পাপ; যা তওবা ছাড়া মাফ হবে না। তা সত্ত্বেও ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নাবালেগ মাসুম শিশুদের শারীরিক শাস্তির হার সর্বাধিক। শিশুর পিতা, মাতা বা অভিভাবকের অনুমতি বা নির্দেশক্রমেও শিশুদের শারীরিক শাস্তি প্রদান শিক্ষক বা অন্য কারও জন্য জায়েজ নয়। কারণ পিতা, মাতা বা অভিভাবক নিজেই তাঁর নিজের নাবালেগ সন্তানকে (শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হতে পারে এমন প্রচণ্ড ও কঠিন আঘাতের মাধ্যমে) শাস্তি দানের অধিকার রাখেন না। সুতরাং, তিনি অন্যকে এই অধিকার দিতে পারেন না। (ফাতাওয়ায়ে শামি, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি)

নিজ ঘরে শিশুদের শারীরিক শাস্তি নিবারণ

নিজের ঘর শিশুর সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। মাতৃকোল শিশুর পরম শান্তির নিবাস। মায়ের যথাযথ শিক্ষা না থাকায় এখানেই শিশু প্রথম বঞ্চনা ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। কুসংস্কার ও অজ্ঞতার কারণে শাল দুধ ফেলে দিয়ে শিশুর ক্ষতি করা হয়। অভাবের সংসারে এবং অনেক মা কর্মব্যস্ততার কারণে মেজাজ বিগড়ে গেলে শিশুদের মারধর করেন। কর্মজীবী বা শ্রমজীবী পিতারা শিশুদের খেলাধুলা ও চঞ্চলতার জন্যও মেরে থাকেন, যা আদৌ কাম্য হতে পারে না। সুশিক্ষা, সচেতনতা সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে এ পর্যায়ে শিশুর শারীরিক শাস্তি ও জুলুম বন্ধ করা সম্ভব।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশুদের শারীরিক শান্তি নিবারণ

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। সুশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই, যা আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে, তা—ই শিক্ষা। শিক্ষা তথা সুশিক্ষার জন্য রয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কিন্তু আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে যাঁরা শিক্ষা প্রদানে ব্যাপৃত থাকেন, তাঁরা নিজেরাই অনেক ক্ষেত্রে তেমন শিক্ষিত নন বা প্রশিক্ষিত নন। কোথাও শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের আদর্শ অনুপাত যেখানে ১: ১০ থেকে ১: ২০-এর মধ্যে (প্রতিজন শিক্ষকের জন্য ১০ থেকে ২০ জন শিক্ষার্থী) হওয়ার কথা, সেখানে দেখা যায় এই অনুপাত ১: ৫০ থেকে ১: ১০০ (শিক্ষকপ্রতি শিক্ষার্থী ৫০ জন থেকে ১০০ জন) পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ না থাকা ও যথাযথ শিক্ষা উপকরণের অভাব, শিক্ষার্থীদের বয়সের তারতম্য, মেধা ও রুচির পার্থক্য, পারিবারিক বিভিন্ন স্তরের শিশুর অসম অবস্থানসহ নানা প্রভাবক শিক্ষককে শিশুদের শারীরিক শান্তি প্রদানে প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ করে।

এর সমাধানের জন্য প্রয়োজন গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষক, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর গড় অনুপাত আদর্শ অনুপাতের কাছাকাছি আনা, শিক্ষকদের বিনোদনের সুযোগ প্রদান, শিক্ষকদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদা পূরণ ও মানসম্মত জীবনযাত্রা নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষকদের আধুনিক আন্তর্জাতিক বিশ্বশিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

কর্মক্ষেত্রে শিশুদের শারীরিক শান্তি নিবারণ

কর্মক্ষেত্রে শিশুরা অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, অবহেলার শিকার হয়; এমনকি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। শিশুশ্রমিক বা শ্রমজীবী শিশুরা কম বয়সেই বেশি নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হয়। এ ক্ষেত্রে গৃহকর্মী শিশুরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত ও বঞ্চিত হয়ে থাকে। এই গৃহকর্মীরা প্রায় কন্যাশিশু। এদের বয়স ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে গৃহকর্ত্রী ও গৃহমালিকের সন্তানদের

দ্বারাই বেশি শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি প্রয়োজন।

জালিম ও মজলুমকে সাহায্য করো

যাদের দ্বারা নির্যাতন (জুলুম) সংঘটিত হয়, তারা জালিমা যারা নির্যাতিত হয়, তারা মজলুমা হাদিস শরিফে রয়েছে, হজরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন: ‘উনছুর আখাকা জালিমান আও মাজলুমানা’ অর্থাৎ তোমরা তোমার ভাইকে (সব মানুষকে) সাহায্য করো; হোক সে জালিম বা মজলুমা এক সাহাবি বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.), যখন কেউ মজলুম হবে, আমরা তার সাহায্য করব; কিন্তু জালিমের (নির্যাতনকারীর) সাহায্য করব কীভাবে? রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, জালিমকে জুলুম থেকে বিরত রাখবে, এটাই তাকে সাহায্য করা। (বুখারি, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিজি)।

আদর্শ শিখনপদ্ধতি

আমরা নিরন্তর শিখছি, শিশুরাও শিখছে অহরহ, অবিরত। শিশুদের শিক্ষা নিয়ে আমরা সদা উদগ্রীব থাকি। আমরা ভাবি, আমরা যা শেখাই (যা বলি), শিশুরা তা শেখে। আসলে শিশুরা আমাদের শেখানোটা (বলাটা) হয়তো শেখে; কিন্তু শিশুরা আমাদের দেখে দেখে (আমাদের আচরণ থেকে) তার চেয়ে বেশি শেখে। কারণ, শিশুরা অনুকরণপ্রিয়; তারা যা দেখে তা আত্মস্থ করে। আমাদের জীবনের প্রতিচ্ছবি তাদের কোমল মনে স্থায়ীভাবে রেখাপাত করে। এর প্রতিফলন ঘটে তাদের কর্মক্ষেত্রে বা কাজে-কর্মে, সারা জীবনের আচার-আচরণে। যেমন ধৈর্য বা সহিষ্ণুতার উপদেশ যদি আমরা অসহিষ্ণুভাবে উপস্থাপন করি; তবে শিশু এখান থেকে দুটো বিষয় শিখবে: এক. ধৈর্য বা সহিষ্ণুতার বাণী বা বুলি; দুই. অধৈর্য বা অসহিষ্ণু

আচরণ। এখন আমাদের ঠিক করতে হবে, আমরা শিশুদের কী শেখাতে চাই।
আমাদের সেভাবে আচরণ করতে হবে।

অপসংস্কৃতি:

সংস্কৃতি মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আজ বিশ্বের দিকে দিকে চলছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির যুদ্ধ। কোনো সংস্কৃতি যখন ইসলামী কার্যকলাপে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং নৈতিকতা বিবর্জিত হয় তখন তা অপসংস্কৃতি বলে চিহ্নিত হয়। এই অপসংস্কৃতির প্রভাবে জাতি তার নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে এবং তরুণ সমাজ হয় বিপদগামী। মুসলমান জাতি আজ ইহুদী, খৃষ্টানদের চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবন নির্বাহের যাবতীয় রীতিনীতি অন্ধভাবে অনুকরণ করে যাচ্ছে।

সংস্কৃতির বিকৃত রূপই হল অপসংস্কৃতি। ধর্মগ্রন্থ আল কুরআন ও হাদীসের সাথে, আত্মা ও আচরণের সাথে, জীবন বোধ ও নৈতিকতার সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই, যা মানব জীবনকে কলুষময় করে এবং জীবনের ভয়াবহ পরিণতির ডেকে আনে তাই অপসংস্কৃতি। তরুণ সমাজকে আজ অসত্যের ধুম্রজালে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সঠিক পথের দিশা পাচ্ছে না তারা।



মাঝিবিহীন নৌকার মতো জীবনের লক্ষ্য হারিয়ে মাঝ দরিয়ায় খাবি খাচ্ছে। এভাবে মুসলমান তার ধর্মীয় স্বকীয়তা হারাচ্ছে। আজ অনেক মেয়ের চাল চলনে বুঝা যায় তারা ইসলামী বিধি-বিধানের ব্যাপারে খুবই অজ্ঞ। ইহকালই যেন তাদের সব। পরকালের চিন্তা করার সুযোগই পায় না। বেপর্দা ও অর্ধনগ্নতা মহামারির আকার ধারণ করছে। তাদের অনেকেই অধিকার আদায়ের জন্য পাশ্চাত্যের নারীদের মতো রাস্তায় নেমে প্লোগান দিচ্ছে আর এই অধিকারে নামেই নারীদের শিক্ষা দিচ্ছে লজ্জাহীনতা এবং টেনে নিচ্ছে জাহেলী যুগের নারীদের অবস্থানে।

ইন্ডী, খৃস্টানরা অপসংস্কৃতির বিকাশে বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করছে। তার মধ্যে একশ্রেণীর মিডিয়া হচ্ছে মূল হাতিয়ার। এই মিডিয়া উস্কানিদাতা ও সন্ত্রাসীর ভূমিকায় নেমেছে। ইন্ডী নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া যা চায় তাই হচ্ছে। এমনকি এর মাধ্যমে জাতির ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ নাশ

করার গতি ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। গানের সুর-তরঙ্গে থাকে এক প্রকারের মাদকতা যা শ্রোতাকে মাতাল করে দেয়। বিষ দেহকে হত্যা করে, জীবনের অবসান ঘটায়। আর নাচ বা নৃত্য মানুষকে আচ্ছন্ন করে। অশ্লীল গান মুনাফেকী সৃষ্টি করে যেমনিভাবে পানি শস্য উৎপন্ন করে।

কুরআন মজীদে সঙ্গীত গান-বাজনা নৃত্যকে ‘লাহওয়াল হাদীস’ বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ হল এমন কথা যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে, দায়িত্ব ও কর্তব্যে তাকে গাফেল ও অসতর্ক বানিয়ে দেয়। বিজাতিরা আসল ধর্ম পরিত্যাগ করে ক্রীড়া ও কৌতুককেই ধর্মাচার হিসেবে গ্রহণ করেছে। মহান প্রভু আল্লাহ তাআলা সূরা আনআমের ৭০ নং আয়াতে তাদেরকে ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, (তরজমা) তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। দীর্ঘকালের ধারাবাহিকতায় আমাদের চিন্তা-চেতনা ও কাজে কর্মে যে অপসংস্কৃতির বিষ ঢুকে পড়েছে তা সহজেই দূর করা যাবে না।

আজ পুরো পৃথিবীতে অপসংস্কৃতির স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

আমাদের সমাজের রন্ধে রন্ধে যে অসততা ও অপসংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছে।

ফিল্ম বর্তমানে অশ্লীল, নির্লজ্জ ও নৈতিকতা বিবর্জিত দৃশ্যাবলির প্রদর্শনীর কাজে ব্যবহার হচ্ছে। তা দর্শকদের বিশেষত তরুণ-তরুণীদের মন-মগজ ও চরিত্রের উপর অত্যন্ত খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে। এ থেকে ধরা ছোয়ার বাইরের বিষয়কে ধরতে বা ছুঁয়ে দেখতে ও অব্যক্ত কল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করতে তরুণরা পাগল পারা হয়ে যায়।

অনেকে তাস, দাবা, জুয়াকে বিনোদন মনে করে। আর অনেকে এসব খেলায় মেতে গিয়ে আল্লাহর সুরণ ও পরকালের কর্ম, শরীয়ত অনুসরণ, ঘর-সংসার ও যাবতীয় দায়-দায়িত্ব ভুলে যায়। তাদের সামনে জীবনের বৃহত্তর লক্ষ্য উদ্দেশ্য উপস্থিত থাকে না। আর যে জাতি এ সমস্ত রোগে আক্রান্ত সে জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যত ঝঞ্ঝাবিস্ফুরক ও সমস্যা সংকুল।

অপসংস্কৃতি ছড়াচ্ছে টিকটক:

বর্তমান সময়ের তরুণ-তরুণীদের কাছে সবচেয়ে আলোচিত অ্যাপের নাম টিকটক। অ্যাপটি দিয়ে ভিডিও তৈরি ও শেয়ার করা যায়। তাই তরুণ প্রজন্ম মেতেছে ভিডিও অ্যাপস টিকটকে। নানা গানের, সংলাপের সাথে তাল মেলাচ্ছেন তারা। টিকটক ভিডিও থেকে বাদ যাচ্ছেনা ইসলামিক ওয়াজও। বাংলা ওয়াজের মজার অংশ উঠে আসছে টিকটকের ভিডিওতে।



টিকটকের এসব ভিডিও সমাজে অপসংস্কৃতি ছড়াচ্ছে। অল্প বয়সের ছেলে-মেয়েরা টিকটকে আসক্ত হয়ে পড়ছেন। এবং সারাদিন মোবাইলের দিকে তাক করেই বসে রয়েছেন। বর্তমান সমাজে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার সাথে টিকটকের বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ কনটেন্ট

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পরছে। বিশেষত আঞ্চলিক ভাষায় এর প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ।

চীনা অ্যাপ টিকটিক বেশকিছু দিন আগে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। তাদের প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করে অনেক অশালীন কুরুচিপূর্ণ ভিডিও শেয়ার বা তৈরি করা হলেও তারা সেসব নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেনি। কিন্তু শুধু টিকটিকই না বেশ কিছু কম জনপ্রিয় অ্যাপ এই একই উপায়ে বিপুল অর্থউপার্জন করছে। এদের মধ্যে বেশির ভাগ অ্যাপ ফ্রিতে ডাউনলোড করা যায়। কিন্তু কোন বিশেষ ফিচার ব্যবহার করতে হলে তা একটি নির্দিষ্ট মূল্যে কিনতে হয়ে অ্যাপটি থেকে।

হট বিগো প্লে স্টোরে থাকা এরকমই একটি অ্যাপ, প্রায় ১০০০০০ বার ডাউনলোড করা হয়েছে এই অ্যাপটিকে। এই লাইভ স্ট্রিমিং অ্যাপটির থাম্বনেইল এ এশিয়ার মেয়েদের বিভিন্ন অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ছবি দিয়ে লেখা থাকে, এ কালেকশন অফ বিগো স্ট্রিমিং ভিডিওস, লাইভ হট।

ভিগো ভিডিও নামের অন্য একটি অ্যাপ প্রায় এক মিলিয়ন বার ডাউনলোড হয়েছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে ইউজাররা, অন্য ভিডিও মেকারদের ফলো করতে পারবে, তাদের সাথে কথা বলতে পারবে, প্রাইভেট মেসেজ পাঠাতে পারবে,

ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক যোগ করে ভিডিও শট ও তা সোশ্যাল মিডিয়ার শেয়ার করতে পারবে।

এই সব অ্যাপ এখনো খুব বেশি সংখ্যক মানুষ ব্যবহার না করলেও, এর মাধ্যমে তৈরি ভিডিও ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ও ইনস্টাগ্রামে অনেকেই দেখেছে এবং তা শেয়ার করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কমবয়সীরা খুব কম দিনেই এই ধরনের অ্যাপের নেশায় পরে যায় ফলে নিয়মিত তারা যদি কোন ভাবে এইসব অশালীন ভয়ংকর ভিডিও দেখে বা কোনভাবে তা যদি শেয়ার করে তাহলে তারা সাইবার ক্রাইমের আওতায় আসবে।

মূলত কোন মানুষ এইসব কন্টেন্টগুলো মডারেট করেনা ফলে, অ্যাপের প্রোগ্রামিং এর দ্বারা এইসব ভিডিওগুলো অনিয়ন্ত্রিত থেকে যায়। মানুষ হিসাবে আমাদের নিজেদের সচেতন হওয়া উচিত এই ধরনের অ্যাপের ভিডিও শেয়ার করার ক্ষেত্রে যা আমাদের সমাজ জীবন ও ব্যক্তি জীবন ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলছে।

ভাইরাল হওয়া মজার মজার নাচ ও ঠোঁট মেলানো হাস্যকৌতুকের ভিডিও তৈরি ও শেয়ার হয় এই টিকটক অ্যাপে। অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের কাছে এই অ্যাপ খুবই জনপ্রিয়। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীর চাহিদা মতো যে কোন কিছুর সাথে নিজের ঠোঁট মিলিয়ে ছোট ছোট ভিডিও তৈরি

করে তা শেয়ার করা যায়।

আবার এর সাহায্যে নিজের পছন্দের গানের সাথে নাচ বা নানা ধরনের কমেডিও তৈরি করা সম্ভব। স্টিকার, ফিল্টার ও অগম্যান্টেড রিয়েলিটিও ব্যবহার করা যায় এসব ভিডিওতে। ফ্রি এই অ্যাপটিকে ভিডিও শেয়ারিং অ্যাপ ইউটিউবের ছোটখাটো সংস্করণ বলা চলে।

টিকটক ব্যবহারকারিরা এখানে এক মিনিট লম্বা ভিডিও পোস্ট করতে পারেন এবং এখানকার বিশাল তথ্যভাণ্ডার থেকে গান ও ফিল্টার বাছাই করতে পারেন।

টিকটক দিয়ে অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরা পরিচিত ফিল্মী ডায়লগ বা গানের সঙ্গে নিজেরা অভিনয় করে মজার মজার ভিডিও তৈরি করে থাকে। একজন ব্যবহারকারীর যখন এক হাজারের বেশি ফলোয়ার হয় তখন তিনি তার ভক্তদের জন্য লাইভে আসতে পারেন। শুধু তাই নয়, এখানে তিনি ডিজিটাল উপহারও গ্রহণ করতে পারেন যা অর্থের সাথেও বিনিময় করা যায়।

একজন ব্যবহারকারী যাকে অনুসরণ করেন তিনি তার ভিডিও দেখতে পারেন। এছাড়াও তিনি আগে যেসব বিষয়ে ভিডিও দেখেছেন তার ওপর ভিত্তি করেও তিনি নতুন নতুন ভিডিও

দেখতে পারেন। ব্যবহারকারীরা নিজেদের মধ্যেও ব্যক্তিগত বার্তা আদান প্রদান করতে পারেন এই অ্যাপের মাধ্যমে। যারা কিছুটা অভিনয় করেন বা কমেডি করতে পারেন, তাদের নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার জন্য এই টিকটক একটি নতুন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে উঠে এসেছে।

তরুণদের কাছে টিকটকের জনপ্রিয়তার পেছনে কারণগুলো হচ্ছে- এসব ভিডিও আকারে ছোট, ব্যবহার করা সহজ, সবসময় এতে যুক্ত হয় নতুন নতুন ফিচার, ভিডিওতে নিজের কণ্ঠ মেলানো যাকে বলা হয় লিপ সিঙ্ক, ভিডিওতে অন্যের কণ্ঠ ব্যবহার।

২০১৯ সালের শুরু থেকেই ডাউনলোড চার্টের শীর্ষের কাছাকাছি অবস্থান করছে টিকটক। গত বছর ইন্সটাগ্রাম ও স্ন্যাপচ্যাটকে টপকে বিশ্বের চতুর্থ সর্বোচ্চ ডাউনলোডকারী অ্যাপে পরিণত হয় এটি। এই কোম্পানির মূল্য দাঁড়িয়েছে ৭৫ বিলিয়ন ডলার যা রাইড শেয়ারিং অ্যাপ উবারের চেয়েও বেশি।

করোনাভাইরাস সঙ্কটের সময় টিকটকের জনপ্রিয়তা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। লকডাউনের কারণে ঘরবন্দী মানুষের তীব্র আগ্রহ তৈরি হয় এই অ্যাপের প্রতি। বলা হচ্ছে, টিকটক ও তার সহযোগী অ্যাপ দোইনের মোট ব্যবহারকারির সংখ্যা

প্রায় ৮০ কোটি। দোইন অ্যাপটি শুধু চীনেই ব্যবহার করা যায়।

জাতীয় নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ভারতে টিকটক নিষিদ্ধ করার আগে এটি সেখানে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেদেশে দশ কোটিরও বেশি মানুষ ইতোমধ্যে টিকটক ডাউনলোড করেছে।

২০১৮ সালে আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি ডাউনলোড করা অ্যাপ ছিলো এই টিকটক। ইকোনমিক টাইমস পত্রিকা লিখছে, প্রতিমাসে গড়ে প্রায় দুই কোটি মানুষ টিকটক ব্যবহার করছে।

টিকটকের যাত্রা শুরু হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন তিনটি অ্যাপ হিসেবে। প্রথমটি ছিলো মার্কিন একটি অ্যাপ যার নাম মিউজিক্যাল ডট লি। এটি শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালে।

প্রযুক্তি বিষয়ক চীনা কোম্পানি বাইটড্যান্স ২০১৬ সালে একই ধরনের একটি অ্যাপ চালু করে যার নাম দোইন। পরে বাইটড্যান্স টিকটক নাম নিয়ে সারা বিশ্বে তার প্রসার ঘটাতে শুরু করে এবং ২০১৮ সালে মিউজিক্যাল ডট লিকে কিনে নিয়ে তাকেও টিকটকের সাথে একীভূত করে ফেলে।

বাইটড্যান্স তার অ্যাপগুলোকে চীনা মালিকানা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। এরই অংশ হিসেবে ডিজনির শীর্ষস্থানীয় একজন কর্মকর্তা কেভিন মায়ারকে টিকটকের প্রধান নির্বাহী হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

একজন ব্যবহারকারী যখন টিকটক ব্যবহার করেন তখন তার প্রচুর ডাটা খরচ হয়। ডাটার এই খরচ যেসব বিষয়ের ওপর নির্ভর করে- কোন ভিডিও দেখা হচ্ছে এবং মন্তব্য করা হচ্ছে, ব্যবহারকারীর লোকেশন বা অবস্থানের ডাটা, ফোনের মডেল এবং কোন অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা হচ্ছে, লোকজন যখন টাইপ করে তখন তার কীস্ট্রোক রিদম কেমন অর্থাৎ ব্যবহারকারীর টাইপ করার ধরন।

অ্যাপটির কিছু কিছু ডাটা খরচের ধরন দেখে অনেকেই অবাক হয়েছেন। খুব সম্প্রতি জানা গেছে এটি ব্যবহারকারীর কপি ও পেস্ট নিয়মিত মনে রাখে। রেডিট, লিঙ্কডিনসহ আরো বহু অ্যাপেও এরকমটা হয়ে থাকে।

টিকটকের এই ডাটা খরচকে তুলনা করা যেতে পারে ফেসবুকের মতো সোশাল নেটওয়ার্কের সাথে। এই অ্যাপটিও প্রচুর ডাটা খরচ করে থাকে। টিকটক কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে বহু প্রশ্ন আছে। ডাটা সংরক্ষণ থেকে শুরু করে এর এলগরিদম নিয়েও রয়েছে অনেক রহস্য।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও অভিযোগ করেছেন যে যারা টিকটক ব্যবহার করেন শেষ পর্যন্ত তাদের সব তথ্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টির হাতে গিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু টিকটক কর্তৃপক্ষ সবসময় বলে আসছে, ব্যবহারকারীর কাছ থেকে তারা যেসব তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলো চীনের বাইরে সংরক্ষণ করা হয়।

তারা বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের ডাটা যুক্তরাষ্ট্রেই সংরক্ষণ করা হয়। তার ব্যাকআপ রাখা হয় সিঙ্গাপুরে। ইউরোপের গোপনীয়তা সংক্রান্ত ইউনিটও সম্প্রতি আয়ারল্যান্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে। ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকায় টিকটকের নীতি নির্ধারণ বিষয়ক প্রধান থিও বেরট্রাম বলেছেন, ব্যবহারকারীরা চীনা কমিউনিস্ট সরকারের আঙ্গুলের নিচে চলে যাবে এই ধারণা মিথ্যা।

তবে তাত্ত্বিকভাবে বলা যেতে পারে যে ছয়াওয়ার মতো টিকটকেরও বিদেশি ব্যবহারকারীর তথ্যের ব্যাপারে চীনা সরকার হয়তো বাইটড্যান্সের ওপর চাপ তৈরি করতে পারে।

চীনে ২০১৭ সালে যে জাতীয় নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে সে অনুযায়ী দেশটির যেকোন সংগঠন অথবা নাগরিক রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে সাহায্য সহযোগিতা করতে বাধ্য। বেরট্রাম বলেছেন, টিকটকের কাছে চীন সরকার যদি কখনো

ব্যবহারকারীর তথ্য চাইতো, তাহলে আমরা অবশ্যই তাদেরকে না বলে দিতাম।

তবে কমিউনিস্ট পার্টিকে অসন্তুষ্ট করলে তার পরিণতি কী হতে পারে সে বিষয়টি বাইটড্যান্সকে মনে রাখতে হবে। এই কোম্পানির নিজের জনপ্রিয় সংবাদ বিষয়ক অ্যাপ টুটিয়াওকে ২০১৭ সালে একবার ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

চায়না মর্নিং পোস্টের খবর অনুসারে, অ্যাপটি প্রচারণাধর্মী ও অশালীন বিষয় ছড়াচ্ছে- বেইজিং ইন্টারনেট ইনফরমেশন অফিস এই অভিযোগ আনার পর অ্যাপটি কিছু সময়ের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

এছাড়াও গোয়েন্দা বিভাগের কথা মতো কাজ করতে অস্বীকৃতি জানালে এই কোম্পানি ও তার নেতৃত্বের ওপরেও তার বড় রকমের প্রভাব পড়তে পারে। আরেকটি উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে সেন্সরশীপ। চীনে ইন্টারনেট সার্ভিস সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত। অনেক ওয়েবসাইট চীনের ভেতরে যাতে দেখা না যায় সেজন্য আছে গ্রেট ফায়ারওয়াল অত্যন্ত কুখ্যাত।

ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ান গত বছর রিপোর্ট করেছিল যে রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর কিছু বিষয়ের ব্যাপারে টিকটকে

কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছিল। তার মধ্যে রয়েছে তিয়েনানমেন স্কয়ারের প্রতিবাদ এবং তিব্বতের স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন।

মার্কিন সংবাদপত্র ওয়াশিংটন পোস্টও টিকটকের সাবেক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে বলেছে, কোন ভিডিও অনুমোদন পাওয়ার ব্যাপারে চীনে এর কর্মকর্তাদের বক্তব্যই চূড়ান্ত। কিন্তু বাইটড্যান্স বলছে, এধরনের গাইডলাইন ধীরে ধীরে বাতিল করা হয়েছে। তার পরেও কারো কারো সন্দেহ যে অ্যাপটি পরিচালনার ক্ষেত্রে টিকটক হয়তো চীনা রাষ্ট্রেরই পক্ষ নিচ্ছে।

এদিকে দেশে ভিডিও তৈরির অ্যাপ ‘টিকটক’ থেকে অশালীন কন্টেন্ট সরিয়ে ফেলতে এবং এসব কন্টেন্ট তৈরিতে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে একটি লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

লিগ্যাল নোটিশে বলা হয়েছে ‘নোটিশ প্রাপ্তির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ নেয়া হবে।’

আজ বুধবার (৫ আগস্ট) সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. মনিরুজ্জামান লিংকন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আইসিটি বিভাগের সচিব বরাবর ই-মেইলের মাধ্যমে নোটিশটি পাঠিয়েছেন।

নোটিশের বিষয়ে আইনজীবী মো. মনিরুজ্জামান লিংকন বলেন, ‘আমরা ইদানিং লক্ষ্য করছি ‘টিকটক’ অ্যাপ দিয়ে অশালীন ভিডিও কনটেন্ট তৈরি করছে এবং তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে। এক্ষেত্রে অনেক শিশু-কিশোর ও যুবক বিপথগামী হচ্ছে এবং নানারকম অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছে। তাই আমাদের কিশোর-তরুন প্রজন্মকে বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষার জন্য এখনই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর সে বিবেচনায় আজ আমি এই লিগ্যাল নোটিশটি পাঠিয়েছি।’

Tik Tok (টিকটক/মিউজিক্যালি) একটি দাজ্জালি ফিৎনা:

মহানবী (সাঃ) বলেন শেষ জামানায় দাজ্জালের সবচেয়ে বেশি অনুসরনকারী হবে নারীরা। এমনকি তাদের বাপ-ভাইয়েরা তাদের দড়ি দিয়ে বেঁধেও দাজ্জালের অনুসরন করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না।

দাজ্জাল এখনো আসেনি, তবে দাজ্জালের ফিৎনা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। এই **Tik tok** নামক সোশ্যাল এপসটিকে দাজ্জালের ফিৎনার সাথে তুলনা করলাম কারন এটি আমাদের মা-বোনদের কে ঘরের ভেতরে রেখেই সুকৌশলে নর্তকী বানিয়ে দিচ্ছে! আর আমাদের মা-বোনরা ও এই ফাঁদে পা দিয়ে নিজের অজান্তে

দাজ্জালকে অনুসরণ করে চলেছে, দাজ্জালের আগমনের পথকে সুগম করে দিচ্ছে।
কারণ এমন একটা পৃথিবীতে দাজ্জালের আগমন ঘটবে যখন চারিদিকে অশ্লীলতা
মহামারী আকার ধারণ করবে, মা-বোনেরা পর্দা থেকে বেরিয়ে আসবে।

প্রিয় বোন! আপনি কি জানেন আপনার আপলোডকৃত ভিডিওটি কতো পুরুষ
লালায়িত দৃষ্টিতে দেখে? আপনি কি জানেন কতো পুরুষ আপনাকে চোখ দিয়ে
ধর্ষন করে?

যারা সস্তা সেলিব্রিটি হওয়ার আশায় নেচে নেচে ভিডিও আপলোড করেন তাদের
স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আপনি মারা গেলেও কিন্তু ইন্টারনেটে আপনার ভিডিওটি
থেকে যাবো তখন যতোজন এই ভিডিও দেখবে কবরে আপনার আযাব ততোই
বাড়তে থাকবে!

সুতরাং এখনই ভেবে দেখুন, যে কোনো মূহুর্তে মালাকুল মউত আপনার সামনে
হাজির হয়ে যাবো তখন কিন্তু খুব দেরী হয়ে যাবো।

=====

☞ যারা মানুষকে **Love story** শিখিয়েছে, তার শাস্তি তারা জাহান্নামে পাবো।

=====

☞ যারা অশ্লীল ও বেহায়াপনা মেয়েদের ছবি/ভিডিও **upload** করেছে, তাদের
বিরুদ্ধে সাক্ষী **Liker ও commenter** দিবো।

=====

☞ যারা অনইসলামীক গান বাজনার প্রচার ও প্রসার করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে
সাক্ষী ঐ পোস্টের **Liker ও commenter**

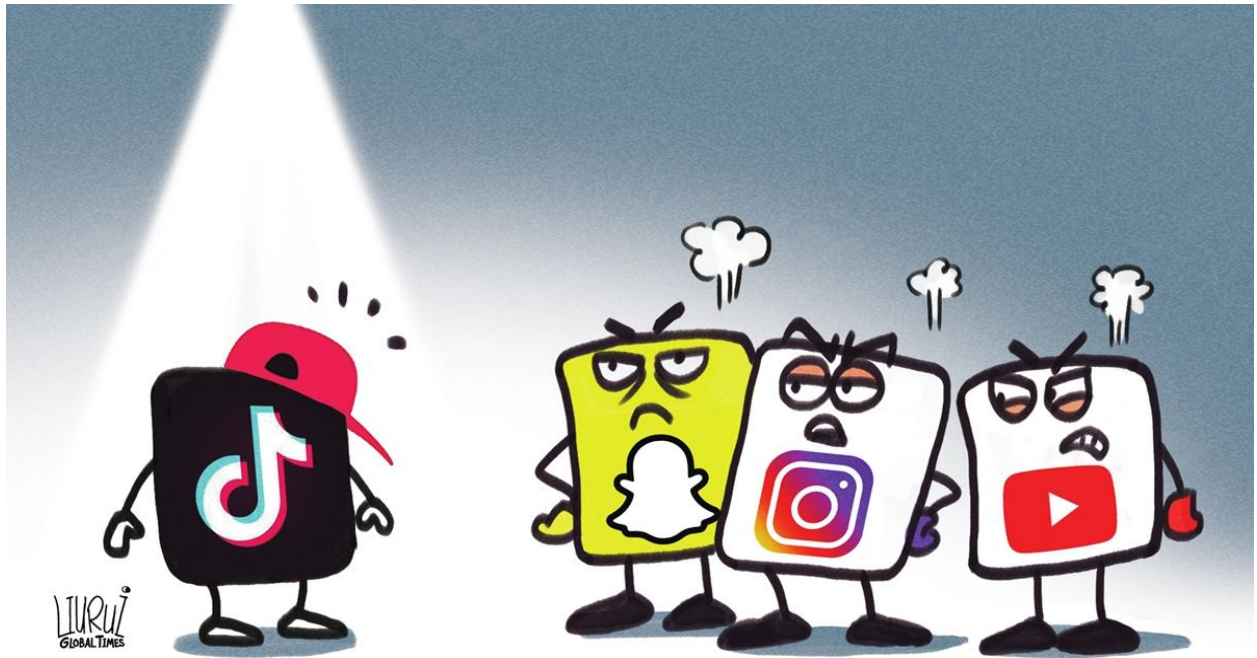
=====

☞ যারা ইসলাম ধর্মের নামে মিথ্যা, ভুল, বানোয়াট বিষয়কে ইসলাম ধর্ম হিসাবে প্রচার করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী ঐ পোস্টের **Liker ও comment**

=====

☞ আর যারা অনলাইনে আল্লাহর বাণী ও ইসলাম প্রচারের মাধ্যম বানিয়েছে তাদের পুরস্কার আল্লাহ দিবেনা

=====



Tik tok যাদের অশ্লীল ছবি আপলোড দেওয়া থাকবে মৃত্যুর পরও তার পাপের বোঝা বাড়তে থাকবে। তার কবরে অনন্ত কাল ধরে পাপ পৌছাতে থাকবে। **Tik tok** ভার্চুয়াল দুনিয়া হলেও এর হিসাব ও দিতে হবে কারন এতে আপনি বাস্তব জীবনের সময়েই নষ্ট করছেন। আর কেউ আল্লাহ ও তার রাসুলের বানী প্রচার করলে, তার জন্য সদকায়ে জারিয়া পেতেই থাকবে, কেয়ামত পর্যন্ত।

=====

((((((((((((50:17 সূরা ক্বাফ))))))))))

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

যখন ডানে ও বামে বসা দু'জন লিপিবদ্ধকারী পরস্পর গ্রহণ করবে।

যখন তার ডানে ও বামে বসা দু'জন ফেরেশতা পরস্পর (তার আমল লিখার জন্য) গ্রহণ করে [১] ;

[১] يتلقى শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা, নেয়া এবং অর্জন করে নেয়া।

المتلقيان বলে দুইজন ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে, যারা প্রত্যেক মানুষের সাথে সদাসর্বদা থাকে এবং তার ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করে।

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ

অর্থাৎ তাদের একজন ডান দিকে থাকে এবং সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করে। অপরজন বাম দিকে থাকে এবং অসৎকর্ম লিপিবদ্ধ করে। قعيد শব্দটির অর্থ উপবিষ্ট। [বাগভী, কুরতুবী]

(((((((((50:18 সূরা ক্বাফ))))))))))

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

সে যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে।

=====

(((((((((59:18 সূরা হাশর))))))))))

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আর প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করে দেখা সে আগামীকালের জন্য কি প্রেরণ করেছে; তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

=====

(((((((((50:16 সূরা ক্বাফ)))))))))))

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسَّوَسُ بِهِ ۖ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি জানি। আর আমি* তার গলার ধমনী হতেও অধিক কাছে।

* ইবনে কাসীর বলেন, এখানে نحن বলে আল্লাহর ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

আর অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমরা জানি। আর আমরা তার গ্রীবাস্থিত ধমনীর চেয়েও নিকটতর [১]।

[১] এখানে نحن বা ‘আমরা’ বলে ফেরেশতাদেরকে বোঝানো হয়েছে। যাতে পরবর্তী আয়াতের সাথে অর্থের মিল হয়। তখন ঐ সমস্ত ফেরেশতাই উদ্দেশ্য হবে যারা মানুষের প্রাণ হরনের জন্য বান্দার কাছে এসে থাকে। আমার ফেরেশতাগণ তাদের ঘাড়ের শিরার কাছেই অবস্থান করছে। তারা আমার নির্দেশ মোতাবেক যে

কোন সময় তাদেরকে পাকড়াও করবো ফেরেশতাগণ সদাসর্বদা মানুষের সাথে সাথে থাকো তারা মানুষের প্রাণ সম্বন্ধে এতটুকু ওয়াকিবহাল, যতটুকু খোদ মানুষ তার প্রাণ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়। [ইবন কাসীর]

=====

((((((((((4:123 সূরা নিসা))))))))))))

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيٍّ أَهْلُ الْكِتَابِ ۖ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

না তোমাদের আশায় এবং না কিতাবীদের আশায় (কাজ হবে)। যে মন্দকাজ করবে তাকে তার প্রতিফল দেয়া হবে আর সে তার জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

((((((((((4:124 সূরা নিসা))))))))))))

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

আর পুরুষ কিংবা নারীর মধ্য থেকে যে নেককাজ করবে এমতাবস্থায় যে, সে মুমিন, তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি খেজুর বীচির আবরণ পরিমাণ যুলমও করা হবে না।

=====

((((((((((99:7 সূরা যিলযাল))))))))))

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

অতএব, কেউ অণু পরিমাণ ভালকাজ করলে তা সে দেখবে,

[১] এ আয়াতে **خير** বলে শরীয়তসম্মত সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে; যা ঈমানের সাথে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কেননা, ঈমান ব্যতীত কোন সৎকর্মই আল্লাহ্ কাছে সৎকর্ম নয়। কুফার অবস্থায় কৃত সৎকর্ম আখেরাতে ধর্তব্য হবে না যদিও দুনিয়াতে তার প্রতিদান দেয়া হয়। তাই এ আয়াতকে এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয় যে, যার মধ্যে অণু পরিমাণ ঈমান থাকবে, তাকে অবশেষে জাহান্নাম থেকে বের করে নেয়া হবে। কেননা, এ আয়াতের ওয়াদা অনুযায়ী প্রত্যেকের সৎকর্মের ফল আখেরাতে পাওয়া জরুরী। কোন সৎকর্ম না থাকলেও স্বয়ং ঈমানই একটি বিরাট সৎকর্ম বলে বিবেচিত হবে। ফলে মুমিন ব্যক্তি যতবড় গোনাহগারই হোক, চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। কিন্তু কাফের ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন সৎকর্ম করে থাকলে ঈমানের অভাবে তা পণ্ডশ্রম মাত্র। তাই আখেরাতে তার কোন সৎকামই থাকবে না।

(((((((((99:8 সূরা যিলযাল))))))))))

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

আর কেউ অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করলে তাও সে দেখবে।

[১] প্রত্যেকটি সামান্যতম ও নগণ্যতম সৎকাজেরও একটি ওজন ও মূল্য রয়েছে এবং অনুরূপ অবস্থা অসৎকাজেরও। অসৎকাজ যত ছোটই হোক না কেন অবশ্যি তার হিসেব হবে এবং তা কোনক্রমেই উপেক্ষা করার মতো নয়। তাই কোন ছোট সৎকাজকে ছোট মনে করে ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ এই ধরনের অনেক সৎকাজ মিলে আল্লাহ্ কাছে একটি অনেক বড় সৎকাজ গণ্য হতে পারে।

অনুরূপভাবে কোন ছোট ও নগণ্য অসৎকাজও না করা উচিত; কারণ এই ধরনের অনেকগুলো ছোট গোনাহ একত্র হয়ে একটি বিরাট গোনাহের স্তূপ জমে উঠতে পারে। [দেখুন; কুরতুবী, সা‘দী] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো-তা এক টুকরা খেজুর দান করার বা একটি ভালো কথা বলার বিনিময়েই হোক না কেন” [বুখারী: ৬৫৪০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন: “কোন সৎকাজকেও সামান্য ও নগণ্য মনে করো না, যদিও তা কোন পানি পানেচ্ছু ব্যক্তির পাত্রে এক মগ পানি ঢেলে দেয়াই হয় অথবা তোমার কোন ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করাই হয়।” [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৬৩] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, “হে মুসলিম মেয়েরা! কোন প্রতিবেশী তার প্রতিবেশিনীর বাড়িতে কোন জিনিস পাঠানোকে সামান্য ও নগণ্য মনে করো না, তা ছাগলের পায়ের একটি খুর হলেও।” [বুখারী: ৬০১৭, মুসলিম: ১০৩০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেন, “হে আয়েশা! যেসব গোনাহকে ছোট মনে করা হয় সেগুলো থেকে দূরে থাকো। কারণ আল্লাহ দরবারে সেগুলো সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবো।” [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৭০, ৫/১৩৩, ইবনে মাজহ: ৪২৪৩] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: “সাবধান, ছোট গোনাহসমূহ থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কারণ সেগুলো সব মানুষের ওপর একত্র হয়ে তাকে ধ্বংস করে দেবো।” [মুসনাদে আহমাদ: ১/৪০২] [ইবন কাসীর]

=====

(((((((((6:132 সূরা আন-আম))))))))))

وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا^ع وَمَا رَبُّكَ بِغَفْلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

আর তারা যা করে, সে অনুসারে প্রত্যেকের মর্যাদা রয়েছে এবং তোমার রব তারা যা করে সে সম্পর্কে গাফিল নন।

=====

((((((((49:13 সূরা হুজুরাত))))))))

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারা। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।

হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে [১], আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার [২]। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশী মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশী তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।

[১] আল্লাহর এ বাণীটিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বিভিন্ন বক্তৃতা ও উক্তি আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। যেমন-মক্কা বিজয়ের সময় কাবার তাওয়াফের পর তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে বলেছিলেনঃ “সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের দোষ-ত্রুটি ও

অহংকার দূর করে দিয়েছেন। হে লোকেরা! সমস্ত মানুষ দু' ভাগে বিভক্ত। এক, নেককার ও পরহেজগার যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মর্যাদার অধিকারী। দুই, পাপী ও দুরাচার যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট। অন্যথায় সমস্ত মানুষই আদমের সন্তান। আর আদম মাটির সৃষ্টি” (তিরমিয়ী: ৩১৯৩]

অনুরূপভাবে, বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বক্তৃতা করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, “হে লোকজন! সাবধান তোমাদের আল্লাহ একজন। কোন অনারবের ওপর কোন আরবের ও কোন আরবের ওপর কোন অনারবের কোন কৃষগঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের ও কোন শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষগঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই আল্লাহভীতি ছাড়া। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু সেই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাবান। আমি কি তোমাদেরকে পৌঁছিয়েছি? তারা বলল, আল্লাহর রাসূল পৌঁছিয়েছেন। তিনি বললেন, তাহলে যারা এখানে উপস্থিত আছে তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে এ বাণী পৌঁছিয়ে দেয়।” [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৪১১]

অন্য হাদীসে এসেছে, “তোমরা সবাই আদমের সন্তান। আর আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল। লোকজন তাদের বাপদাদার নাম নিয়ে গর্ব করা থেকে বিরত হোক। তা না হলে আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা নাক দিয়ে পায়খানা ঠেলে এমন নগণ্য কীট থেকেও নীচ বলে গণ্য হবে।” [মুসনাদে বায্যার: ৩৫৮৪]

আর একটি হাদীসে তিনি বলেছেনঃ “আল্লাহ তা’আলা কিয়ামতের দিন তোমাদের বংশ ও আভিজাত্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। তোমাদের মধ্যে যে বেশী আল্লাহভীরু সে-ই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী”। [ইবনে জারীর: ৩১৭৭২] আরো একটি হাদীসের ভাষা হচ্ছেঃ “আল্লাহ তা’আলা তোমাদের চেহারা-

আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজ-কর্ম দেখেন।”

[মুসলিম: ২৫৬৪, ইবনে মাজাহ: ৪১৪৩]

=====

(((((17:14 সূরা বনী ইসরাঈল))))))

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

পাঠ কর তোমার কিতাব, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশকারী হিসেবে যথেষ্ট।

‘তুমি তোমার কিতাব পাঠ করো, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসেব-নিকেশের জন্য যথেষ্ট [১]

[১] হাসান বসরী রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ ‘আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি তোমার হিসাবের ভার তোমার কাছেই অর্পণ করেছেন তিনি অবশ্যই তোমার সাথে সবচেয়ে বড় ইনসাফের কাজ করেছেন।’ [ইবনকাসীর] কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ সেদিন সবাই তাদের আমলনামা পড়তে পারবে। যদিও সে দুনিয়াতে নিরক্ষর ছিল। [তাবারী।]

এবার আপনি চিন্তা করুন, আপনি কি করবেন?

সিদ্ধান্ত আপনার বিবেকের উপর!

কেয়ামত কিন্তু সন্নিকটে...!

ধ্বংসকারী অপসংস্কৃতি ও এর প্রতিষেধক:

সংস্কৃতি মানে জীবনের পথ বা চলার পদ্ধতি। আজকের বিশ্বে অপসংস্কৃতির আগ্রাসনে মানবসমাজ বিশেষ করে যুবসমাজ ধ্বংসের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে। যে গহ্বর থেকে উঠে আসার একটাই পথ খোলা আর তা হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি।

আগে জানা যাক অপসংস্কৃতি কী, কোথা থেকে এর উৎপত্তি। মূলত মুসলিম উম্মাতের অভ্যন্তরে বিজাতীয় যেকোনো জাতির আচার-আচরণ, পোশাক ইত্যাদিসহ সব ধরনের সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটা অপসংস্কৃতি। বাংলাদেশ মুসলিমপ্রধান দেশ হলেও আজ অপসংস্কৃতির আগ্রাসনে মুসলমান তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ভুলে বিজাতীয় সংস্কৃতির চর্চায় সুনাম কুড়াতে তৎপর। বিজাতীয় সংস্কৃতি ধারণ করার ভয়াবহ পরিণতি রাসূল সা: আমাদের আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, ‘যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাদৃশ্য ধারণ করল সে তাদেরই দলভুক্ত হলো।’ (সুনানে আবু দাউদ : ৪০৩১)

অতএব, আমরা মুসলিম জাতি যদি জেনে শোনে বিজাতীয় সংস্কৃতিতে মজে থাকি এর পরিণতি আমাদেরই ভোগ করতে হবে। আজ সমাজ এর পরিণতি দেখছে।

যে বা যারা অপসংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটাবে তাদের মর্মান্তিক শাস্তির ঘোষণা রয়েছে, আর তারাই সবচেয়ে ঘৃণার যোগ্য।

রাসূল সা: বলেন, ‘তিন প্রকারের লোক আল্লাহর কাছে
সর্বাধিক ঘৃণিত,

১. হারাম শরিফের পবিত্রতা বিনষ্টকারী,
২. ইসলামে বিজাতীয় রীতি-নীতির (সংস্কৃতির)
প্রচলনকারী,
৩. কোনো মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যার প্রচেষ্টাকারী।
(বুখারি)

প্রকৃত সংস্কৃতিমানদের বৈশিষ্ট্য :

প্রকৃত সংস্কৃতিমান তারাই, যারা- ঈমানদার, নেককার এবং বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে। আল্লাহ বলেন, ‘কবিদেরকে তো বিভ্রান্ত লোকেরাই অনুসরণ করে। তুমি কি লক্ষ করোনি যে, তারা প্রত্যেক উপত্যকায় উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়? আর নিশ্চয় তারা এমন কথা বলে, যা তারা করে না। তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আর আল্লাহকে অনেক স্মরণ করেছে। আর তারা নির্যাতিত হওয়ার পর প্রতিশোধ নেয়। আর জালিমরা শিগগিরই জানতে পারবে কোন প্রত্যাবর্তন স্থলে তারা প্রত্যাবর্তন করবে। (সূরা শুআরা : ২২৫- ২৫৭) মূলত যাদের মাঝে ঈমান নেই তারা বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট অভিযাত্রী, ইসলাম এনে দেয় সুস্থ সংস্কৃতি।

সর্বোত্তম সাংস্কৃতিক মনের পরিচায়ক :

আল্লাহর রঙ ধারণ করাই সর্বোত্তম সাংস্কৃতিক মনন। যেই মনের ফুলবাগিচায় আল্লাহর রঙ লেগেছে, সেই মনন পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত। কারণ, সৃষ্টিকর্তার রঙ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ রঙ। আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হও। আর রঙের দিক দিয়ে আল্লাহর চেয়ে কে বেশি সুন্দর? আর আমরা তারই ইবাদতকারী।’ (সূরা বাকারা- ১৩৮)

আল্লাহর রঙ হলো : আল্লাহর দ্বীন বা ইসলাম। নাসারাদের দ্বীনের আত্মপ্রকাশের আগে ইহুদিদের মধ্যে একটি বিশেষ রীতির প্রচলন ছিল। কেউ তাদের গ্রহণ করলে তাকে গোসল করানো হতো। আর তাদের ওখানে গোসলের অর্থ ছিল, তার সমস্ত গোনাহ যেন ধুয়ে গেল এবং তার জীবন যেন রঙ ধারণ করল। পরবর্তীতে নাসারাদের মধ্যেও এ রীতির প্রচলন হয়। তাদের ওখানে এর পরিভাষিক নাম হচ্ছে, ইসতিবাগ বা রঙিন করা (ব্যাপ্টিজম)। তাই বলা হয়েছে, এ লোকাচারমূলক রঞ্জিত হওয়ার যৌক্তিকতা কোথায়? বরং আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হও। যা কোনো পানির দ্বারা হওয়া যায় না।

ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা :

ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা এনে দিতে পারে সুস্থ সংস্কৃতি, আর একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে সংস্কৃতির সুস্থতা।

রাসূল সা: বানু কুরাইজাহর সাথে যুদ্ধের দিন হাসইবনু সাবিত [৩৯] রা: বলেছিলেন (কবিতা আবৃত্তি করে) মুশরিকদের দোষত্রুটি তুলে ধরো। এ ব্যাপারে জিবরাইল আ: তোমার সঙ্গী। হাসসান ইবনু সাবিত রা: কে রাসূলুল্লাহ সা: - এর কবি বা ইসলামের কবি বলা হতো। কারণ, কাফির কবির যেন আল্লাহর রাসূল ও ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা ও বদনাম করত তেমনি তিনিও কাফিরদের কবিতা ও সাহিত্যের মাধ্যমে তার জবাব দিতেন।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর ৪১২৪)

সংস্কৃতির মূল শিক্ষক :

আজ বিশ্বব্যাপী যার আচরণ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে সবার কাছে, তিনি আদর্শ সংস্কৃতির শিক্ষক। তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র, পদচারণা শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টান্ত রেখে গেছে যা ধারণে আমরা তাঁর শ্রেষ্ঠ উম্মতের মর্যাদার অধিকারী হতে পারব। রাসূল সা: বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।’ (কানজুল উম্মাল)

মুসলিম পিতার আদর্শকে অনুসরণ :

ইবরাহিম আ: মুসলিম জাতির পিতা এবং আল্লাহর বন্ধু। আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণ হতে হলে অবশ্যই ইবরাহিম আ: - এর

আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন: ‘তার চেয়ে দীনে আর কে উত্তম যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহিমের মিল্লাতকে অনুসরণ করে? আর আল্লাহ ইবরাহিমকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।’ (সূরা নিসা : ১২৫)

কুরআনের কথা ও বক্তব্যের উৎস :

কুরআনের মাধ্যমেই মহান আল্লাহ আমাদের উত্তম কথা ও বক্তব্য শিক্ষা দিয়েছেন। অপসংস্কৃতির অপনোদনের জন্য কুরআন সঠিক শিক্ষা দিয়ে থাকে। এতে বলা হয়েছে, ‘তিনি পরম করুণাময় আল্লাহ, যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে শিক্ষা দিয়েছেন কথা, বক্তব্য বর্ণনা।’ (সূরা আর রাহমান : ১- ৪)

এখানে বাইয়ানের একটি অর্থ হচ্ছে, মনের ভাব প্রকাশ করা। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে তোলা। বাকশক্তি এমন একটি বিশিষ্ট গুণ যা মানুষকে জীবজন্তু ও পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক করে দেয়। (কুরতুবি) বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন বাকপদ্ধতি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আর তাই কুরআনই উত্তম সংস্কৃতির উৎস।

মুনাফেকির উৎস :

অপসংস্কৃতি ও অশ্লীলতা মুনাফেকির জন্ম দেয়। মুসলিম উম্মতের জন্য চরিত্র ধ্বংস করতে এটুকুই যথেষ্ট। চরিত্র রক্ষার তাগিদে

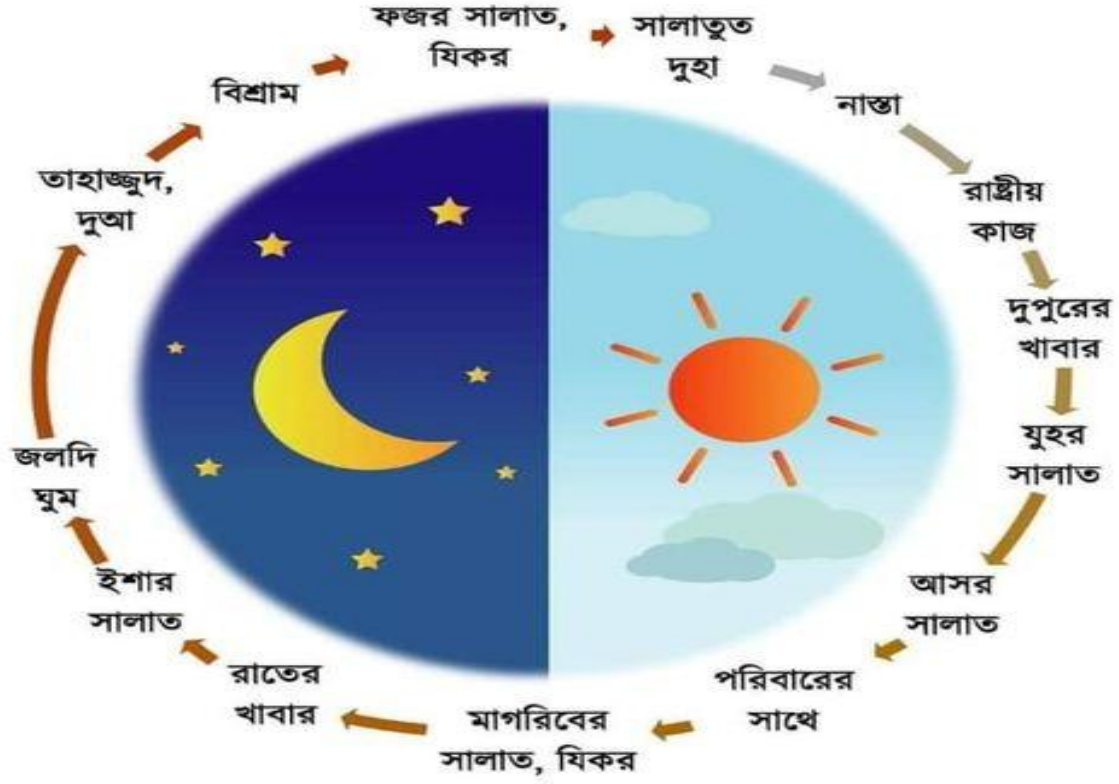
প্রতিটি ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য উত্তম সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরা; দেশ ও উম্মতের কল্যাণে তৎপরতা চালানো যাতে ইসলামী সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে।

জাবের রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা: বলেছেন, ‘গান- বাজনা মানুষের অন্তরে মুনাফেকি উৎপন্ন করে।’

(বায়হাকি)

দেশ ও জাতির কল্যাণে অপসংস্কৃতির উৎস সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে। ভিন্ন জাতির অনুসরণ দমনে ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্টি হতে হবে। আর ইসলামের যেকোনো অঙ্গনের চর্চাই এর প্রতিষেধক। হতে পারে সঙ্গীত, কাব্য, অঙ্কন, অনুপ্রেরণার গল্পসহ শিল্পের আনাচে- কানাচে ইসলামের জাগরণী শিল্প- সাহিত্য।

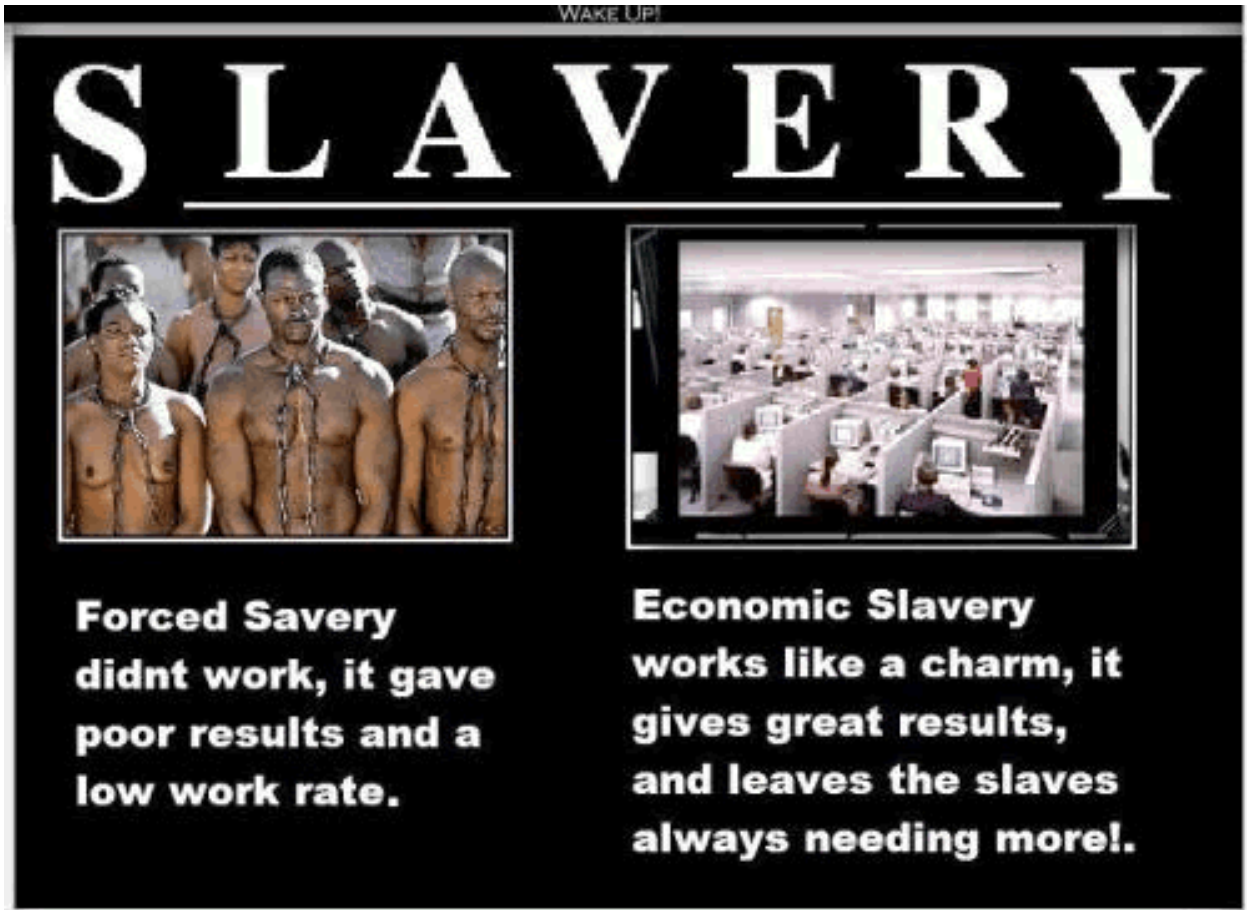
রাসুল (সাঃ) এর দৈনন্দিন রুটিন



রাসুল (সাঃ) এর এই রুটিনটি একদম ধরবাধা ছিলো না। কখনো নতুন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ আসলে তিনি তা প্রথমে আদায় করতেন। মাঝে মধ্যে তিনি ইশার পর সাহাবী বা স্ত্রীদের সঙ্গে দরকারি আলাপ করতেন। তাছাড়া রাসুল (সাঃ) প্রায়শই সিয়াম থাকতেন বা সফরে যেতেন, তখন রুটিনটি অন্যরকম হত।

অধ্যায়-২: (অর্থ ও বাণিজ্য)

এই অধ্যায়ে আমরা দাজ্জালের অর্থনৈতিক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানবো, ইনশাআল্লাহ।
তবে প্রথমেই জেনে নিবো প্রচলিত চাকুরী ব্যবস্থা সম্পর্কে। যেহেতু আমরা আগের
অধ্যায়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জেনেছি, সেহেতু তার পরের স্টেপ হিসেবে
চাকুরীর কথাটা আগে জেনে নিবো। তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে, ইনশাআল্লাহ।



৮ ঘন্টা চাকুরীর বিধান কোথা থেকে আসলো?

দিনটি ছিল ১৮৮৬ সালের ১ মে রোজ শনিবার, বিশ্ব
ইতিহাসের শ্রমিক আন্দোলনের একটি স্মরণীয় দিন। কেননা

সেদিন আমেরিকার শিকাগো শহরের আকাশে-বাতাসে গর্জে উঠেছিল বুলেটের গর্জন। শ্রমিকের বুকের তাজা রক্ত ঝড়েছিল হে মার্কেটের মাটিতে। সেদিন শ্রমের মর্যাদা, মূল্য ও ন্যায্য মজুরি শুধু নয়, যুক্তিসঙ্গত কর্ম সময় নির্ধারণের জন্য অপরিবর্তিত বেতনে দৈনিক আট ঘন্টা শ্রমের দাবীতেও কেঁপে উঠেছিল রাজপথ।

আসলে দেওয়ালের পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ যা করে হয়তোবা তাই হয়েছিল সেদিন। দৈনিক ১৪-১৬ ঘন্টা করে আর কতদিন খাটা যায়? অথচ পাচ্ছে না ন্যায্য মজুরী, নেই কর্মপরিবেশ, নেই সামান্যতম মর্যাদাও। শ্রমিকদের এই মানবেতর জীবন-যাপন হার মানিয়েছিল দাসরূতিকেও। তাই ১৮৮৪ সালে একদল শ্রমিক দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের দাবীতে সময় বেঁধে দিয়েছিলেন ১৮৮৬ সালের ১ মে তারিখ পর্যন্ত। কিন্তু কারখানার মালিকগণ তোয়াক্কাই করেননি শ্রমিকদের এই ন্যায্য দাবীকে বরং চেষ্টা করেছিল শ্রমিকদের রক্ত চুষে নিয়ে আগুল ফুলে কলা গাছ হবে।

তাইতো শুরু হলো এই মেহনতি মানুষের সংগ্রাম। তবে আন্দোলন সবচেয়ে বেশি তীব্র আকার ধারণ করেছিল ১, ৩ ও ৪ মে তারিখগুলোতে। তাঁরা আন্দোলনে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলেছিলেন “Ei ght hours for work, ei ght hours for rest, ei ght hours for what we wi ll” এমন শ্লোগানে মুখর শ্রমিকরা যখন

শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অংশ হিসেবে হে মার্কেটে জমায়েত হয়েছিল ঠিক তখনই হঠাৎ একটি বোমার আওয়াজ এবং এক পুলিশের মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। তখন পুলিশের এলোপাথারি গুলিতে বেশ কয়েকজন শ্রমিক লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায় হে মার্কেট। প্রকম্পিত হয়ে উঠা শিকাগো শহর যেন পরিণত হল মৃত্যুপুরীতে।

মিথ্যে অজুহাতে অভিযুক্ত করা হল শ্রমিক নেতা August Spi es, Michel Schwab, Oscar Neebe, Adol ph Fi scher , Loui s Li ngg, George Engel , Samuel Fi el den, and Al bert R. Parsons কে। একটি প্রহসনমূলক বিচারের পর ১৮৮৭ সালের ১১ই নভেম্বর August Spi es সহ ৬ জনকে ফাঁসির কাণ্ডে ঝুলানো হল। Loui s Li ngg কারা অভ্যন্তরে করল আত্মহত্যা। আরেকজনের ১৫ বছরের কারাদণ্ড হল।

এভাবেই শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকারের সংগ্রামকে দমানের চেষ্টা করেছিল তৎকালীন শিকাগোর প্রশাসন। তাইতো রাগে-দুঃখে তীব্র আতর্নাদে ফাঁসিতে ঝুলার আগ মুহূর্তে August Spi es চিৎকার করে বলেছিলেন, “The day wi ll come when our si lence wi ll be more power ful than the voi ces you are t hr ot t l i ng t oday” আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট Grover Cleve land এর সময়কালের এই ঘটনাটি

পরবর্তীতে সক্ষম হয়েছিল বিশ্ব নেতৃবৃন্দের নজর কাড়ার। তবে কোন বারুদ, কোন বুলেট আর কোন বোমা কি সত্যিকারের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে দমিয়ে রাখতে পারে? না, পারে না। তাইতো ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের শতবার্ষিকীতে প্যারিসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হলে সেখানে রেমন্ড লাভিনে ১৮৯০ সাল থেকে শিকাগো প্রতিবাদের বার্ষিকী আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশে পালনের প্রস্তাব করেন।

এভাবেইতো বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হল আজকের ‘আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস’ বা ‘মে দিবস’।

তবে শুধুমাত্র এমন দিবস পালন করলে কি শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে? না, অধিকারের কথাগুলোকে দিতে হবে স্বীকৃতি। করতে হবে কার্যকর। শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে উন্নতি ও তাদের সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধান করার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে আন্তরিকভাবে। তাই ঠিক এমন কাজের জন্য ১৯১৯ সালের প্রতিষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organisation) ১৯৪৬ সালে এই সংস্থাটি জাতিসংঘের সহায়ক সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করল।

শ্রমিক তথা কর্মচারীদের শ্রমঘন্টা ও মজুরীও নির্ধারণ করে দেওয়া হল। যেমন : C030 - Hours of Work

(Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30) এর Article 3 তে শ্রমঘন্টা নিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে- 'The hours of work of persons to whom this Convention applies shall not exceed forty-eight hours in the week and eight hours in the day, except as hereinafter otherwise provided.'

মুটামুটি কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আইএলও অনুযায়ী আদর্শ শ্রমঘন্টা হল দৈনিক আট ঘন্টা কাজ এবং সপ্তাহে মোট আটচল্লিশ ঘন্টা কাজ করা।

শুধু তাই নয় International Labour Standards নির্ধারণ করতে গিয়ে আইএলও বিভিন্ন কনভেনশন ও ডিক্লারেশনের মাধ্যমে শ্রমিক ও কর্মচারীর কল্যাণে তৈরি করেছে আইন-কানুন বা নীতিমালা। এখন প্রশ্ন হল, আসলেই কি আইএলও পেরেছে বিশ্ব শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে? অথবা যে দেশগুলো শ্রমিকদের কল্যাণে প্রণয়ন করেছে শ্রম আইন তাঁরা কি ঐ আইন দ্বারা নিশ্চিত করতে পেরেছে শ্রমিকদের কাজ করার সুস্থ পরিবেশ, আদর্শ শ্রমঘন্টা, পর্যাপ্ত মজুরী ইত্যাদি অধিকারগুলো? নাকি নিছক একটি কাগজের লেখা ধারা হিসেবেই রয়ে গেছে দেশের ঐ আইনগুলো? আমাদের দেশেইবা কতটুকু প্রয়োগ হচ্ছে শ্রম আইন? কর্তৃপক্ষের নিকট এমন প্রশ্নগুলো থেকেই যায়।

SLAVERY



MODERN SLAVERY



this was actually used for a presentation today.

বাংলাদেশের কর্মঘন্টা:

প্রাপ্ত বয়স্ক যে কোন শ্রমিকের দৈনিক কর্মঘন্টা হবে আহাৰ ও বিশ্রাম ব্যতীত ৮ ঘন্টা। আবার কিছু শর্ত জুরে দেওয়া হলো যে, ভাতা প্রদান সাপেক্ষে ১০ ঘন্টাও কাজ করানো যাবে। আর এই শর্তইবা কতটুকু মানছে বাংলাদেশের কারখানাগুলো তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার আর প্রয়োজন পড়ে না, কেননা ১০-১২ ঘন্টা অথবা ১২-১৪ ঘন্টা শ্রম দেওয়া যেন স্বাভাবিক হিসেবেই ধরে নিয়েছে এদেশের শ্রমিক শ্রেণি। তবে এর পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ হল পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানহীনতা। যেহেতু এদেশের গ্রামগুলোতে খুব বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হয়নি সেজন্য গ্রাম থেকে শহরে এসে বিভিন্ন কল- কারখানায় অল্প মজুরীতে কাজ করতে হয় তাঁদের। আর এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না মালিক

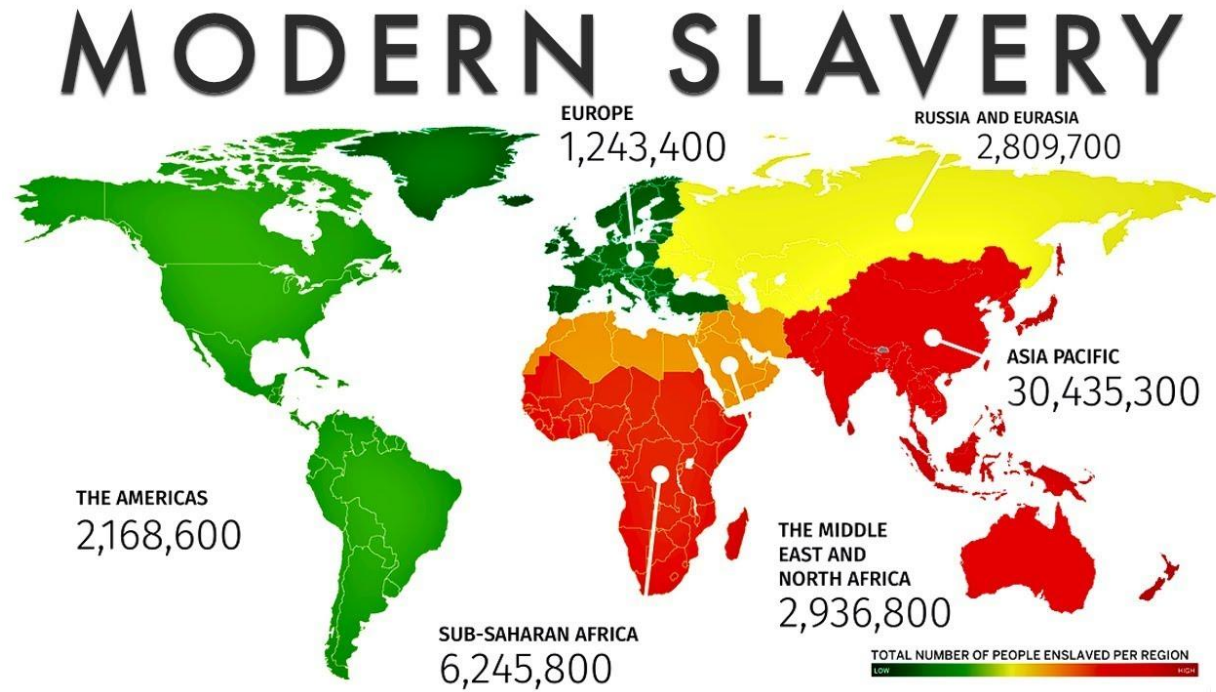
পক্ষের অনেকেই। অন্যদিকে দেশে দীর্ঘদিন শ্রমিক আন্দোলন চলছিল ন্যায্য মজুরীর দাবীতে। মালিক পক্ষ ছয় থেকে সাত হাজার টাকার উপরে কোনভাবেই দিতে চান না।

R: M উপরোক্ত আর্টিকেল দুটো থেকে আমরা ৮ / ৯ ঘন্টা কাজের ইতিহাস বা আইন সম্পর্কে জানলাম। সাথে এও জানলাম যে, এই আইন মোটেও মানা হচ্ছেনা। বরং আগের মতোই সুকৌশলে শোষণ ও জুলুম করা হচ্ছে। পরবর্তী আর্টিকেল গুলো থেকে আরো বিস্তারিত জানতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

আধুনিক দাসত্বের প্রকৃতি ও পরিধি:

দাস প্রথা মানব ইতিহাসের একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। এটা প্রাচীন যুগ থেকেই চলে আসছে।

এখন বড় প্রশ্ন হলো, প্রকৃত অর্থেই কি দাসপ্রথা বিলুপ্ত হয়েছে? তাহলে বর্তমানে আধুনিক দাস প্রথার কথা বলা হচ্ছে কেন? আসলে এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব এখনও সমাজে রয়ে গেছে।



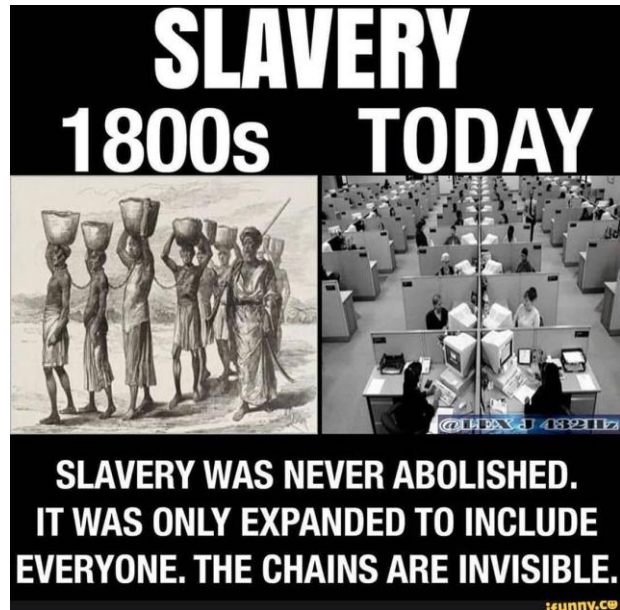
২০১৮ সালের জুলাইয়ে ওয়াক ফ্রি ফাউন্ডেশন নামে অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক একটি সংগঠন গ্লোবাল স্লেভারি ইনডেক্স (বিশ্ব দাসত্ব সূচক) প্রকাশ করেছে। এতে ১৬৭টি দেশে তারা জরিপ চালিয়ে দেখেছে, এসব দেশে আধুনিক দাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যের নাম রয়েছে।

ওয়ার্ল্ড ফ্রি ফাউন্ডেশন জানায়, ৪০ দশমিক ৩ মিলিয়ন (চার কোটি তিন লাখ) মানুষ ‘আধুনিক দাস’ হিসেবে জীবনধারণ করছে। বাংলাদেশে এ ধরনের দাসের সংখ্যা পাঁচ লাখ ৯২ হাজার, যুক্তরাষ্ট্রে চার লাখ তিন হাজার ৭৯ ভারতে ,হাজার ৩৬ যুক্তরাজ্যে এক লাখ , হাজার। ৩৬ লাখ ৩৮ চীনে ,হাজার ৮৯ লাখ

কোন কোন অবস্থায় বা কোন কারণে মানুষ আধুনিক দাস ব্যবস্থার শিকার হয়েছে, সেগুলো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : ভৌত ও ভাষাগত কারণে বিচ্ছিন্নতা, সাংস্কৃতিক পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞানতা, ঋণের বোঝার কাছে নতি স্বীকার এবং নিজের অধিকার সম্পর্কে ধারণা না থাকার মতো বিষয়গুলো উল্লেখ করেছে ওয়ার্ল্ড ফ্রি ফাউন্ডেশন।



DEBT = SLAVERY



গ্লোবাল স্লেভারি ইনডেক্স- ২০১৮- তে বলা হয়েছে যে, বিশ্বের ৪ কোটিরও বেশি মানুষ কোনো না কোনোভাবে আধুনিক দাসত্বের শিকারে পরিণত হচ্ছে। আধুনিক দাস প্রথায় কৌশলগতভাবে

মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে কোনো না কোনোভাবে দাসত্বের মধ্যে নিয়ে আসা হচ্ছে। যেমন- নামমাত্র মজুরিতে কর্মজীবী মানুষেরা তাদের শ্রম দিতে বাধ্য হচ্ছেন। কর্মঘণ্টা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম নীতিকে অনুসরণ করা হচ্ছে না। আবার অনেক সময় দালালদের খপ্পরে পড়ে নারীর অধিকার ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। বিদেশে কর্মসংস্থানের প্রলোভন দেখিয়ে অনেককে আধুনিক দাসে পরিণত করা হচ্ছে। সম্প্রতি অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে ৩২৪ জনেরও বেশি নারী গৃহশ্রমিক দেশে ফিরেছেন।



VICTIMS ARE EXPLOITED IN LABOUR, PROSTITUTION AND DOMESTIC WORK

Victims of Modern Slavery are often trafficked and through fear or coercion, forced to work for little or no money. Sometimes, victims are sexually exploited or forced to commit crime.

Slavery is closer than you think. It happens all over the world including the UK.

If you are a victim or know someone who might be visit modernslavery.co.uk or to seek help or report concerns call the helpline.

0800 0121 700

Calls are free from landlines and most mobile networks.

**MODERN
SLAVERY
IS CLOSER
THAN YOU
THINK**

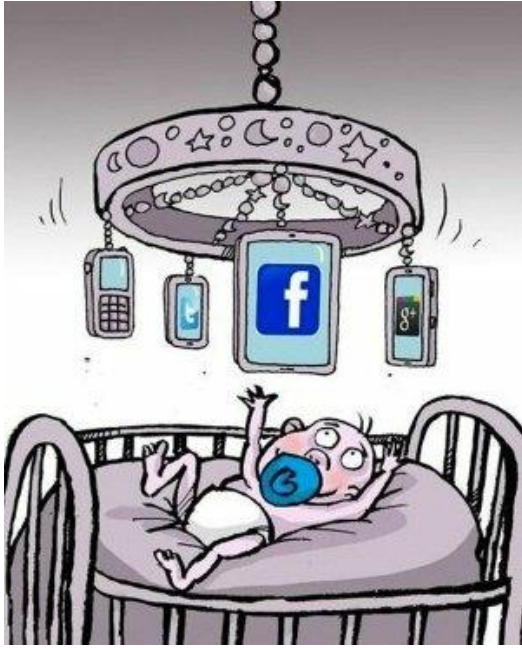
অভিবাসন নিয়ে গবেষণা করেন এমন একটি সংস্থা ন্যাশনাল এ্যালায়েন্স ফর মাইগ্রেশনস রাইটস বাংলাদেশ মনে করে মধ্যপ্রাচ্যে নারী নির্যাতন ব্যাপকহারে বেড়েছে। সেখানে একজন নারীকে শুধুমাত্র ঘরের কাজকর্মই করতে হয় না বরং তাকে গৃহকর্তাসহ ওই বাড়ির

যত পুরুষ আছে তাদের যৌনদাসী হিসেবেও ব্যবহৃত হতে হয়। খেলাধুলার ক্ষেত্রেও আধুনিক দাস প্রথা আমাদের অগোচরে জায়গা করে নিচ্ছে কিনা সেটি নিয়ে আমাদের ভাববার সময় এসেছে। বর্তমানে বিভিন্ন লীগে খেলোয়াড়দের নিলামের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়। যা প্রাচীন দাস প্রথার নিলামের সঙ্গে অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাহিত্য যেমন একটি সৃজনশীলতা, খেলাও তেমনি একটি সৃজনশীলতা। এই ধরনের সৃজনশীলতাগুলোকে কোনোভাবেই নিলামের মধ্যে এনে আধুনিক দাসত্বের আওতায় আনা ঠিক নয়। বরং বিকল্প মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সার্বজনীনতা নিয়ে এই বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা দরকার।



আরেকটি বিষয় এখানে আমরা বিবেচনা করতে পারি তা হলো—মাদক, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের মত আমরা প্রযুক্তির দাসে পরিণত হচ্ছি কিনা। আমাদের অগোচরেই আমরা টুইটার, ফেসবুক, ভাইবার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইন্সটাগ্রাম, ভিডিও গেম ইত্যাদিতে আসক্ত হয়ে

এগুলোর দাস হয়ে পড়ছি কি না সেটি নিয়ে সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা প্রয়োজন। দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন ফোরামে আধুনিক দাসত্বের বিষয়টিকে বিবেচনায় এনে এটিকে প্রতিরোধ করার বিশ্বজনীন নীতি গ্রহণ করা যায়। এর সাথে দরকার নিজেদের স্বকীয়তাকে ধরে রেখে আধুনিক দাসত্বের হাত থেকে নিজেকে ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করা।



A picture speaks a thousand words



আরো কিছু ছবি দেখুন। যা আপনাকে আধুনিক দাসত্বকে বুঝতে সাহায্য করবে।



Ah yes, media= slave masters.
Very good comparison



R:M: এবার আমরা আধুনিক দাসত্বকে আরো ভালো করে বুঝতে, দুনিয়াদার ভাইদের লিখা দুটি আর্টিকেল পড়বো। যেখানে প্রত্যেকটি চাকুরীজীবী নামক দাসের অন্তরের কথাকে তুলে ধরা হয়েছে। যেহেতু লিখাগুলো দুনিয়াদার ভাইদের, তাই এখানে ইসলামের ছোয়া নেই। তবে পূর্ণ বাস্তবতা আছে।



কর্পোরেট দাসত্বের সূত্রপাত:

আজকাল কেমন যেন হয়ে যাচ্ছি। সেই আগের মতোন নেই। সকাল সাতটায় ঘুম থেকে জেগে যখন জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই। আমার চোখ ঝলসে আসে। সূর্যের সাথে আমার আজীবনের দূরত্ব। জানালার ওপাশের রোদে ভরা দিনটাকে আমি চিনতে পারি না। অচেনা লাগে রাস্তাঘাট ফুটপাথ- ফুটপাথের পাশে টং দোকানা। কেমন যেন নিজেকে অবাস্তব লাগে সবকিছু থেকে।

সকালের নাস্তার টেবিলের সাথে আমার দেখা হলো কত কত বছর পর। সেই স্কুলের জীবনের পরে সকালের নাস্তার টেবিল বলে আমার জীবনে কিছু ছিল না। মা কেমন কেমন করে যেন তাকান আমার দিকে। কিছু বলেন না আমাকে। কিন্তু মায়ের ভ্রুর মাঝে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন ঠিক ফুটে উঠে। আমিও কিছু বলি না।

বাথরুমে গিয়ে এখন আর গান গাই না। সন্ধ্যার পরে আর বাইরে থাকি না। রাত এগারোটা বাজতেই রুমের লাইট নিভিয়ে ঘুমিয়ে যাই। বাবাও একটু সন্দেহের চোখে দেখছেন আমায়। মাকে হয়তো কিছু জিগ্যেসও করেছেন। তারা সবচেয়ে অবাক হলো সেদিন; যেদিন আমার চুল গুলো কেটে ছোট করে বাসায় ঢুকলাম। টিশার্ট ফতুয়া জিন্স ছেড়ে ফর্মাল শার্ট আর ট্রাউজার পরা দেখে আমার মা অবশেষে জানতে চাইলো, 'কি হয়েছে তোর?' আমি কিছু বলি না, শুধু বললাম, 'কিছু হয়নি তো মা। সবকিছুই ঠিকঠাকা।'

আজকাল আসলে আমি কেমন যেন হয়ে যাচ্ছি না। আমিই আমাকে পালটে ফেলছি। আমার চলাফেরা নাওয়া খাওয়া আমাদের বাসার কেউই পছন্দ করতো না।

ওদের চোখে আমি ছিলাম ভীণ গ্রহের বাসিন্দার মতোনা এখন আমি আন্তে আন্তে ওদের কাতারে এসে দাঁড়াছি। আমার এই এলোমেলো চলাফেরায় একটা মানুষের কোন সমস্যা ছিল না। আমার আদরের ছোটবোন টুনটুনির। ও ছিল আমার একমাত্র দলের মানুষ। মা বলতেন- ভাইবোন ঐক্যজোটা

আমার এই বদলে যাওয়ায় বাসার সবাই অবাক হচ্ছে। কিন্তু টুনটুনি কেমন যেন মন মরা হয়ে থাকে। ওকে জিগ্যেস করলাম, 'কি হয়েছে রে তোর?' টুনটুনির মাঝে কোন ভগিতা নেই। আমার সাথে ও সবকিছু সরাসরি বলে। বলল, 'দাভাই কি হয়েছে তোর?' টুনটুনিকে কি করে বুঝাই, আমাকে যে সবার মতো স্বাভাবিক মানুষ হতে হবে। বাবার কাছে আমি ছিলাম অসুস্থ মানুষ। অস্বাভাবিক আমার যত কাজ কারবার।

টুনটুনিকে কিছু না বলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। টুনটুনি আমাকে বুঝে। তাই খুব বেশি ঘাটায় না। এই দুনিয়ায় আমাকে বোঝার মতো এই একটা মানুষই আছে। আমার যখনই খুব চা খেতে ইচ্ছে করে টুনটুনি একটু পরে ঠিক নিয়ে আসে। আমার খুব অবাক লাগে ব্যাপারটা। কিন্তু কখনো ওর কাছে জানতে চাইনি কি করে বুঝে ও। চায়ের মগ শেষ হওয়ার আগে আবার চলে আসে। ওর খুব ছোটবেলা থেকেই অভ্যাস এটা; আমি চা খাওয়ার পরে শেষটুকু ও এক চুমুকে গিলে খাবে।

আগামীকাল সকাল থেকে আমার অফিস। বাসায় কাউকেই জানাইনি যে চাকরি পেয়েছি। আমার মাঝে কোন উত্তেজনাও নেই চাকরি নিয়ে। টাকা পয়সার ব্যাপারে আমি আজীবন উদাসীন ছিলাম। রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে টুনটুনি এলো রুমের। আমার বালিশের পাশে বসে কিছু না বলে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো। আমি জানি না টুনটুনি কি করে বুঝে এসব কখন আমার কি পেতে ইচ্ছে করে। মাথাটা ধরে

ছিল। ও মাথায় হাত দিতেই কোথায় যে পালালো মাথা ধরা।

টুনটুনি মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'ভাই লাইট নিভিয়ে দেবো? ঘুমিয়ে যা তুই।' আমি বললাম, 'আচ্ছা নিভিয়ে দো।' টুনটুনি লাইট নিভিয়ে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ছোট ছোট এই নরম হাতে কি যে মায়া। আমার চোখে ভীষণ শান্তির ঘুম নেমে আসে। ঘুম আর জাগরণে দুলতে থাকি এক সময়। টুনটুনির হাত আমার কপালে রাখে। চোখের পাতায় দ্রুত আলতো করে হাত বুলায়। আমি তলিয়ে যেতে থাকি গভীর ঘুমের সমুদ্রে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তার টেবিলে এলাম। শার্ট ইন করা দেখে বাবা মা দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকালো। টুনটুনি স্কুলে চলে গেছে। ওর সকালে কোচিং থাকে। কোচিং থেকে স্কুলে যায়। পরোটা আলুভাজি দিয়ে মুখে পুরে মাকে বললাম, 'আমার চাকরি হয়েছে মা। একটা আইটি ফার্মে। আজ থেকে জয়েনা।' ছেলের চাকরি পাওয়ার খবরে কোন বাবা মা মনে হয় এতোটা নির্লিপ্ত থাকেন না। উনাদের কপালের ভাজ দেখে বুঝতে পারলাম; উনারা আমাকে নিয়ে চিন্তিত। আমার চাকরি পাওয়া নিয়ে উনারা কিছুই অনুভব করছেন না।

আমি আবার বললাম, 'আমি ভালো আছি মা। আমাকে নিয়ে ভাববেন না। বাবা তো আমার সাথে কথা বলেন না আমি অসুস্থ অস্বাভাবিক মানুষ বলে। বাবাকে বলে দিয়েনা। আমি এখন অনেক সুস্থ। আর কয়দিন পরে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবো। আমার মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল আপনাদের ভালো লাগতো না। আমার মুখে আর কখনো দাড়িগোঁফ দেখবেন না। আপনারা মনির পরিবারের সাথে কথা বলেন। বিয়ে তো

করতে হবে'

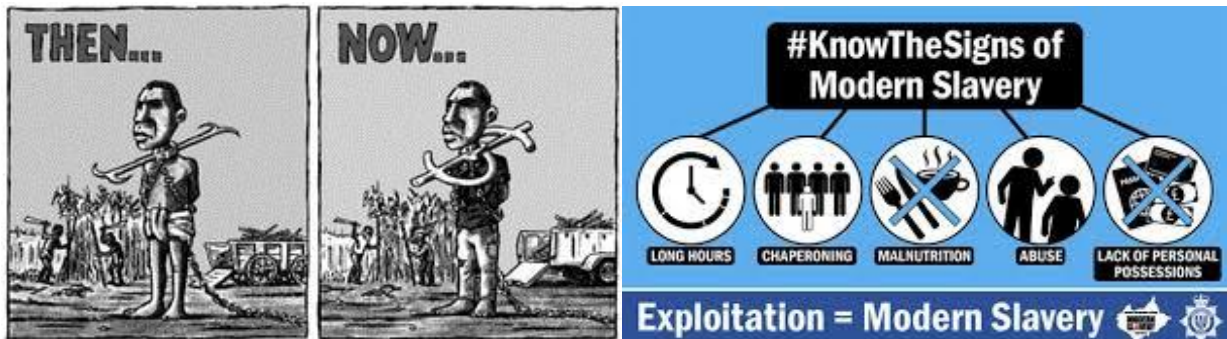
আমি কথা বলে থামার পরেও সবাই চুপচাপ বসেছিলাম। কেউ কোন কথা বলছেন না। আমি আবার শুরু করলাম, 'আমি যেভাবে জীবনটা কাটাতে চেয়েছিলাম সেটা ছিল আমার একার জীবন মা। সেখানে আমি শুধু আমাকে নিয়ে ভাবতাম। গল্পের বইয়ে ডুবে থাকতে ভালো লাগতো। রাত জাগতে ভালো লাগতো। আমি সবকিছু আমার ইচ্ছায় করতাম যা ভালো লাগতো। চাকরি বাকরি টাকা পয়সা এসব আমাকে কখনো টানতো না মা। আমার রুমে গেলে দেখবেন। সেখানে কোন গল্পের বই নাই। মহাকাশের কোন পোস্টার নাই।

দুই বছর পরে বাবা আমার সাথে কথা বললেন আজ। বললেন, 'তোর কি হয়েছে? তুই ভালো আছিস। সত্যি করে বল। আমাকে মিথ্যা বলিস না।'



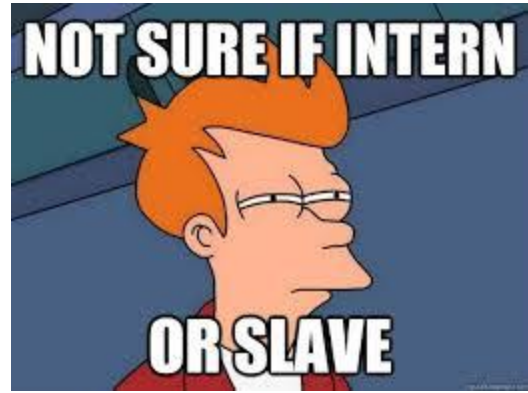
আমি চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললাম, 'আমি ভালো নাই বাবা।' আমার গলা ধরে আসছিলো। দুই বছর পরে বাবা আমার সাথে কথা বলছেন এই ব্যাপারটা এখনো সামলে উঠতে পারছি না। আমাকে কিছু বলতে হলে বাবা আমাকে শুনিয়ে মাকে বা টুনটুনিকে কথা গুলো বলতেন। ঈদের দিনে পর্যন্ত বাবা আমার সাথে কথা বলেননি। আমি জানি না একটা ছেলে নিজের মতো করে একটু চললে কি এমন অন্যায় হয়ে যায়। যেই অন্যায়ের কারণে বাবা ছেলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললাম, 'আমি সত্যি ভালো নাই বাবা। আমি আপনাদের মতোন এমন জীবন চাই নাই। কিন্তু যেমন জীবনে ছিলাম আমি ভালো ছিলাম। কিন্তু আপনারা আমায় নিয়ে ভালো ছিলেন না। কোনো দাওয়াতে গেলে আমাকে নিয়ে যেতেন না আমার এলোমেলো পোষাকের কারণে। বাসায় কেউ এলে আমাকে সহজে পরিচয় করিয়ে দিতেন না। আপনাদের সম্মানবোধে লাগতো। আপনার মতো এতো সম্মানিত মানুষের ছেলে এমন বাউন্ডুলে হয়ে থাকে আপনাদের সেটা লজ্জা লাগতো। আর লাগবে না বাবা। এখন থেকে আপনারা আমাকে সব দাওয়াতে নিয়ে যেতে পারবেন। কেউ বাসায় এলে পরিচয় করিয়ে বলতে পারবেন। আমার দুই ছেলে এক মেয়ের মধ্যে এ হলো বড় ছেলো ছোট ছেলে ইংল্যান্ডে গ্রিনিচ ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়। আর এই বড় ছেলে আইটি ফার্মে আছে। মাসে অনেক টাকা স্যালারি পায়।'



বলে উঠে গেলাম সকালের নাস্তার টেবিল থেকে। এখনো সকালের নাস্তার টেবিলের সাথে আমার যোগাযোগ তৈরি হয়নি। আমার রুমে এসে অফিসের ব্যাগ নিয়ে জুতো পরতে যাচ্ছিলাম তখন বাবা আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'তোর কিছু করা লাগবে না বাবা। তুই আগের মতো হয়ে যা। তোর চলাফেরা আমার পছন্দ ছিল না। কিন্তু তোর মাঝে যে আনন্দ দেখতাম যে উদ্দাম দেখতাম সেটা অনেক দিন দেখি না। তোকে চাকরিবাকরি কিছু করা লাগবে না। তুই তোর মতোন থাকা তোকে আমরা কেউ কিছু বলবো না। তোর আনন্দটুকু আমরা চাই আর কিছু না।'

আমি বাবাকে বললাম, 'বাবা আমি সে জীবন থেকে একেবারে ফিরে এসেছি। মানুষ যেমন চাইলেও শৈশবে যেতে পারে না। আমিও আর পারবো না বাবা। মা আসি। বাবা আসি।' বলেই বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম।



সকালের রোদে এখনো অভ্যস্ত হতে পারিনি। সানগ্লাস চোখে দিয়ে অফিসের গাড়ির জন্য বাসার নিচে অপেক্ষা করছি। নিজেকে এই প্রথম আমার একজন আসামী মনে হলো। যে আসামীকে একটুপরে প্রিজন ভ্যান এসে কারাগারে নিয়ে যাবো। আজ থেকে আমি একজন একজন পুরোপুরি অন্য আমি। যে এখন আর গল্পের বই না। চেক বইয়ের গন্ধ নিবো। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আগের মতো নক্ষত্র নিয়ে

ভাববে না, ভাববে না এই ইউনিভার্স আসলে কত বড়। এখন থেকে ভাববে, ব্যাংকে আর কত টাকা জমলে একটা নিজের ফ্ল্যাট কিনা যাবো গাড়ি কিনা যাবো ছিলাম উড়নচণ্ডী আউলা বাউলা আজ থেকে হলাম কর্পোরেট দাস।

একজন কর্পোরেট দাসের জীবনচক্র:

ছোটবেলায় সায়েন্স বইয়ে আমরা মশার জীবনচক্র সম্পর্কে পড়তাম। আজ আমরা একজন কর্পোরেট দাসের জীবনচক্র সম্পর্কে জানব।



কর্পোরেট দাস একপ্রকার মেট্রোপলিটন জীব যারা সাধারণত শহরের নিম্নমধ্যবিত্ত এলাকায় বাস করে। এরা মূলত শহরের জীব নয়। এদের সিংহভাগ তরুণ বয়সে গ্রাম হতে শহরে জীবিকার সন্ধানে আসে কিন্তু আর তাদের জন্মস্থানে ফেরত যেতে পারে না, এখানেই আটকে জীবনচক্র অতিবাহিত করে। তবে শহরেও এরা জন্ম নেয়। এরা

সাধারণত চকচকে লেবাসধারী বাবুয়ানা বিশিষ্ট। উহারা শান্ত শিষ্ট, লেজবিশিষ্ট (তবে লেজটি গলায় ঝোলে "টাই" নামে)। উহারা নিরীহ, নির্বিবাদী, একঘেয়ে জীবনপ্রিয়, অন্ধকার কোণজীবী, সুবিধাবাদী, কঠোর পরিশ্রমী, পরোপকারী (কারণ অন্যের টাকা বাড়ানোর মিশনে সারাজীবন ব্যয় করে)। সুখের নাটকে এরা চমৎকার অভিনয় করতে পারে। এদের চামড়া গভীরের চেয়েও মোটা হলেও ব্যপক ইলাস্টিসিটি থাকায় এদের গায়ে শীত, গরম, গালি, চড়, অপমান সহজে দাঁত বসাতে পারে না। এরা কষ্টসহিষ্ণু। কখনো মুড়ির টিনে, কখনো এসি কারে, কখনো ভাগের সিএনজিতে এরা চলাচল করতে পারে। এরা সাধারণত লাল রঙের ঠান্ডা রক্তবিশিষ্ট জীব তবে কিছু বিরল প্রজাতির নীল রক্তের কর্পোরেট দাসও আছে। তারা উচ্চপদে লোকাল কিংবা আন্তর্জাতিক কর্পোরেট (কারাগারে) হাউসে আনাগোনা করেন।



এদের জীবনের কয়েকটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম ধাপে বিদ্যার্জন ও পরবর্তী ধাপসমূহে টিকে থাকার পাঠ গ্রহণে বিভিন্ন কর্পোরেট দাস নির্মাতা (শিক্ষা!) প্রতিষ্ঠানে যায়।

সেখানকার (কু)শিক্ষা শেষ হলে কর্পোরেট লাইফে ঢোকানো প্রানান্ত প্রচেষ্টায় নামে। এই সময়ে এদের বিভিন্ন কর্পোরেট পুনর্বাসন বা পালনকারি প্রতিষ্ঠানে একটি ডকুমেন্ট

ফাইল সহকারে ঘুরঘুর করতে দেখা যায়। এরপর তারা নানান কায়দা কানুন করে শিক্ষানবিস কর্পোরেট হিসেবে একটি কর্পোরেট হাউসে তাদের মূল জীবনচক্রের

সূত্রপাত করে। পরবর্তী অনেক বছর তারা এরকম কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ভাত-পানি, জল-হাওয়া (তার সাথে আরো অনেক কিছু) খেয়ে সময়ের পরিক্রমায় একজন পূর্ণাঙ্গ কর্পোরেট দাসে পরিণত হয়।

জীবনচক্রের এর পরের পর্যায়ে এরা পরবর্তী কর্পোরেট প্রজন্মের আগমন নিশ্চিত করতে বিয়ে নামক আরেকটি বিশেষ ধরনের কর্পোরেট সম্পর্কের সূত্রপাত করে।

কিছু কিছু (কু)বুদ্ধিমান কর্পোরেট দাস আবার "কর্পোরেট দাসী"দের জীবনসঙ্গি হিসেবে বেছে নেন। কিছু চাল্লু কর্পোরেট দাস চিকনা বুদ্ধির কল্যাণে একটি ফ্ল্যাট

নামক মুরগীর খোপ কিনে ফেলতে সক্ষম হন। তবে অধিকাংশই সে পর্যায় পর্যন্ত

যেতে পারে না। তারা কোনোমতে পরের প্রজন্মের কর্পোরেটের ধরাগমন (জন্ম আর কি), লালনপালন, (কু)শিক্ষায় শিক্ষিত করা, কর্পোরেট হবার দৌড়ে পৌঁছে দিয়ে

তারা পরপারে যাবার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। এদের জীবন কাল মোটামুটি ৪৫

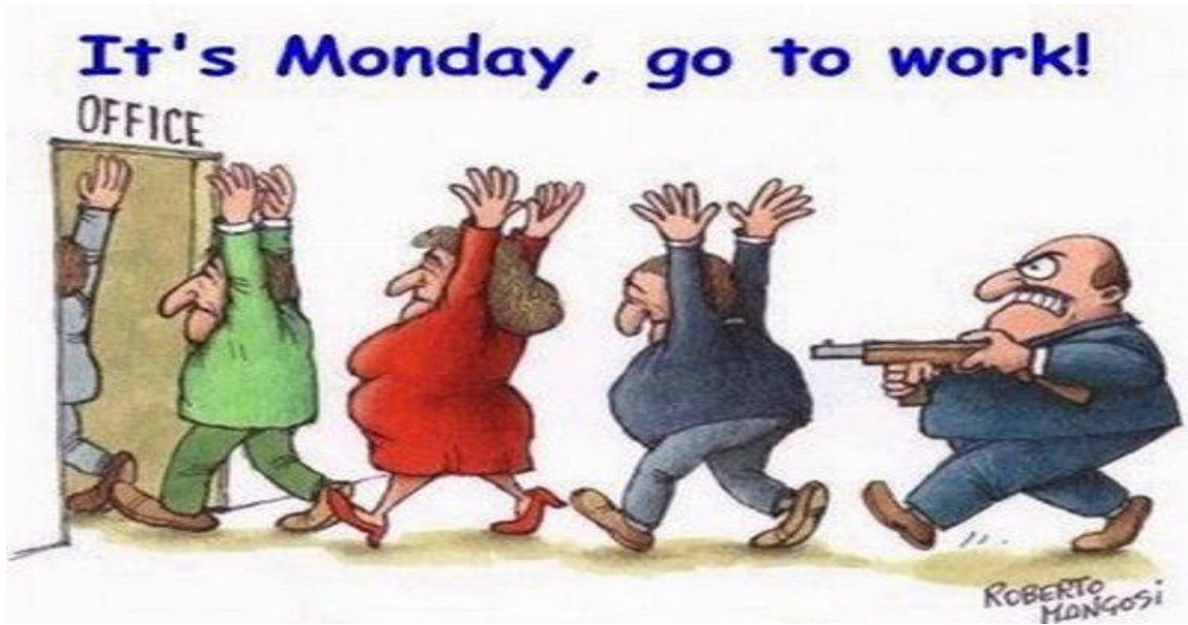
থেকে ৫৫ বছর তবে কিছু কিছু নীল রক্তের ভাগ্যবান অবশ্য তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কর্পোরেট বংশধরের দয়ায় তার অতিকষ্টে অর্জিত যৎসামান্য কর্পোরেট মুদ্রায়

কিছুকাল জীবন টেনে নেবার সুযোগ পান। কর্পোরেট দাসদের জীবন অবসান হলে অন্য একদল কর্পোরেট দ্রুত তার সৎকার করে তাকে মাটির নীচে বা জলে ভাসানোর বন্দবস্ত করেন।

শেষকৃত্যের প্রস্তুতিকালে তারা নিজের বাসায় বাচ্চা ঘুমালো কিনা তার খোজ নেন, পরের দিন যে ডেলিভারীগুলো আছে তার ফলো-আপ করেন, গলার মাফলার না দেয়ায় তার ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে-বাসার বউকে এজন্য ফোনে ধমকান, ফেসবুকে প্রয়াত কর্পোরেটের মৃত্যুর স্ট্যাটাস দেন, ফাঁকে ফাঁকে মৃত কর্পোরেটের জন্য নিয়ম করে আহা উল্ল করেন, একফাঁকে আবার অনেক দিন পরে দেখা হওয়া কোনো কর্পোরেটের সাথে হেসে হেসে কুশল বিনিময় করেন, কে কোথায় (মুরগীর খোপ)ফ্ল্যাট কিনলেন তার খোজ নেন, জোর করে ভিজা ভিজা চোখ করে মৃতের বউকে সান্তনা দেন, আবার “এই না না না! দরকার নেই! এই সময়ে! আমি পারব না” বলতে বলতে হালকা নাস্তা পানিও করে নেন। (এইটা আমি দেখেছি আমার আব্বাজানের মৃত্যুর পর। আমার আত্মীয়রা জর্দা দিয়ে পান খাচ্ছিলেন আর আব্বার জন্য হা পিত্যেষ করছিলেন) । একপর্যায়ে সদ্যমৃত কর্পোরেটকে জানাজা দিয়ে তাকে সমাহিত করা হয় আর শেষ হয় একজন কর্পোরেট দাস নামক সস্তা জীব এর জীবনচক্র।

ভাল কথা! আপনি যদি একজন ওল্ড “কমরেড “ স্যরি “কর্পোরেট” হন বা অন্য গোত্রের প্রাণী হন এবং যদি আপনার সন্তানকে চিড়িয়াখানার একঘেয়ে পশুপাখি দেখিয়ে আর তাদের আনন্দ না দিতে পারেন তাহলে তাদের নতুনত্বের স্বাদ দিতে

কোনো এক অফিস ডে'তে "কর্পোরেট দাস" দেখাতে তাদের কর্পোরেট সাফারিতে নিয়ে যেতে পারেন। ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ আজকাল বড় বড় কর্পোরেট শহরের ব্যস্ত অফিস পাড়াতে গড়ে ওঠা কর্পোরেট সাফারি পার্কগুলোতে স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে ঘুরে আসতে পারেন। আপনার পয়সা উসুল হবার গ্যারান্টি দিচ্ছি।



তবে মনে রাখবেন, অফিস ডে ছাড়া এদের দেখতে চাইলেও তা সম্ভব তবে একটু কষ্ট করতে হবে। ছুটির দিনগুলোতে আপনি সকালের দিকে কর্পোরেট দাসদেরকে দেখতে পাবেন বিভিন্ন (কিচেন মার্কেটে) খাস বাংলায় তরকারীর বাজারে হাটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে, বাজারের ব্যাগ ডানহাতে আর দুইটা দেশী মুরগী বামহাতে নিয়ে কাদা জল মাড়িয়ে পরিবারের ঘানি টানতে বাজার করছে। তবে ওইয়ে বললাম কষ্ট করতে হবে তাদের দেখতে তার কারণ হল ওই সময় তাদের চিনে নিতে একটু কষ্ট করতে হয় কারণ এরকম স্থানে তাদের সাথে "বাবুসাহেব"রাও মিলেমিশে একাকার হয়ে

বাজার করেন বলে তাদের আলাদা করা একটি কঠিন হয়। তবে আপনি এক্সপার্ট হলে তেমন কষ্ট করতে হবে না।



R:M: দ্বীনদার হোক আর দুনিয়াদার হোক। প্রত্যেক চাকুরীজীবির (আধুনিক দাস) জীবন চক্র কমবেশি ঠিক এমনি। আসলে দাজ্জালি সিস্টেম আর ফ্রিমেসনিক সিলেবাস আমাদের মানসিকতাকে এরকম করে ফেলেছে। আমাদেরকে আধুনিক কর্পোরেট দাস বানিয়ে ফেলেছে। এই চক্রের বাহিরে আমরা বের হতে পারিনা। সারাদিন দাসত্ব করতে করতেই দিন শেষ হয়ে যায়। ফলে আখেরাতের কথাও ভাবার সময় পাইনা। আর এভাবেই একসময় মৃত্যু চলে আসে। খালি হাতে চলে যেতে হয়, অনন্ত জগতে।

বনী ইসরায়েল ও মুসলমানদের দাসত্বের জীবনের প্রতি অনুরাগ:

বনী ইজরায়েল মিশরে দাসত্ব করতে করতে ভুলে গিয়েছিল স্বাধীনতা কাকে বলে। তারা সারাদিন গাধার মত ফেরাউনের জমিতে কৃষিকাজ করাকেই বিরাট সম্মানজনক ক্যারিয়ার ভাবত। আল্লাহপাক যখন তাদেরকে স্বাধীন জীবন দান করলেন আর মান্না ও সালওয়াকে তাদের খাদ্য হিসেবে পাঠালেন, তারা এই স্বাধীন জীবনযাপনে সন্তুষ্ট ছিল না। তাদের চোখে আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী জীবনযাপনের চেয়ে ফেরাউনের শরীয়ত অনুযায়ী জীবনযাপনই বেশী আকর্ষণীয় ছিল। তারা স্বাধীনতাকে ছেড়ে গোলামির জীবনযাপনের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়েছিল।

বর্তমান দাজ্জালের নির্মিত আধুনিক সভ্যতায় মুসলমানরাও স্বাধীন জীবনযাপন ত্যাগ করে গোলামির জীবনযাপনের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হচ্ছে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে ভালো চাকর হয়ে সম্মানজনক চাকরির আশায়া ৯টা থেকে ৫টার কর্পোরেট জীবন মুসলিমদের চিন্তাশক্তিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, তাকে টাকার পূজারি বানিয়ে দিচ্ছে। বিশ্বে কী ঘটছে, কেন ঘটছে তা বোঝার আগ্রহ মুসলিমরা হারিয়ে ফেলেছে। দিনরাত টাকার পেছনে ছুটতে ছুটতে, ক্যারিয়ার গড়ার পেছনে ছুটতে ছুটতে, প্রতিযোগিতা করতে করতে মুসলমান জাতি দাজ্জালের দ্বারা ব্রেইনওয়াশড হয়ে গেছে। তাদের কাছে এটাই গৌরবের জীবন। যদি এখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা যা করছ তা গোলামী, তবে তারা তাকে কৌতুক ভেবে হাসবে। কারণ তারা গোলামির জীবনকেই সম্মানজনক ক্যারিয়ার ভাবছে।

বনী ইজরায়েল আল্লাহর শরীয়তকে ছেড়ে যখন অন্য শরীয়ত গ্রহণ করে, তাদের চোখে যখন আল্লাহর আয়াতের থেকে মানবসৃষ্ট জিনিস বেশী আকর্ষণীয় লাগে, তখন যারা আল্লাহর কথা বলে, আল্লাহর নিদর্শনের কথা বলে, আল্লাহর শরীয়তের কথা বলে, সেসব নবীদের তারা ঘৃণা করতে থাকে ও তাদের অত্যাচার নির্যাতন এমনকি হত্যাও

করতে থাকে। আমরা যদি বর্তমান আধুনিক সভ্যতার দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাই, পৃথিবীর সব দেশে ইউরোপীয় শরীয়ত চলছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন-আদালত, সংস্কৃতি সব কিছুতেই ইউরোপীয়দের শরীয়ত। মুসলিম দেশগুলোতেও একই হালা এটাই নাকি সভ্যতা! যদি কেউ এই শরীয়তের বিরোধিতা করে আর আল্লাহর দেয়া শরীয়ত কায়েম করতে বলা হয়, তবে তাকে জঙ্গি, মৌলবাদী, দেশদ্রোহী ট্যাগ দেয়া হয় এবং তার উপর নির্যাতনের খরগ নেমে আসে। বিশ্বের নানা প্রান্তে অসংখ্য আলেম-ওলামাকে হত্যা করা হয়েছে। আল্লাহর শরীয়ত কায়েম করার কথা বলায় আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার হাত আলেম-ওলামাদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে রয়েছে।

বনী ইজরায়েল নবী জাকারিয়া (আ) কে মসজিদের ভেতর হত্যা করেছিল। তাঁর ছেলে নবী ইয়াহিয়া (আ) কে প্রতারণার মিথ্যে অভিযোগে হত্যা করেছিল। নবী ঈসা (আ) নবীদের এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কথা বলেছেন এবং এই জঘন্য অপরাধের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর সুর মোটেই নরম করেন নি।

” এইজন্য বিধাতা তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে এই কথা বলেছেন, ‘আমি তাদের কাছে নবী ও রাসুলদের পাঠিয়ে দেব। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে তারা হত্যা করবে এবং অন্যদের উপর জুলুম করবে।’ এর ফল হলো, দুনিয়া সৃষ্টির সময় থেকে শুরু করে যতজন নবীকে খুন করা হয়েছে, তাদের রক্তের দায়ী হবে এই কালের লোকেরা (অর্থাৎ ইহুদীদের এই প্রজন্ম, অন্যকথায় ঈসা (আ) এর সময়কার প্রজন্ম)। জ্বী, আমি আপনাদের বলছি, হাবিলের খুন থেকে শুরু করে যে জাকারিয়াকে কোরবানগাহ ও পবিত্র স্থানের মধ্যে হত্যা করা হয়েছিল, সেই জাকারিয়ার খুন পর্যন্ত সমস্ত রক্তের দায়ী হবে এই কালের লোকেরা।” [ইঞ্জীল, লুক ১১: ৪৯-৫১]

সর্বশেষ, তারা এ নিয়ে গর্ববোধ করেছে যে, কীভাবে তারা মসীহ ঈসা (আ) কে হত্যা করেছে [কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন]।

বনী ইজরায়েলের এই পাপাচারের জন্য আল্লাহপাক তাদের শাস্তি দেন। সেনাপতি টাইটাসের নেতৃত্বে রোমান বাহিনী ৭০ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেম অবরোধ করে। টাইটাস জেরুজালেম শহর ধ্বংস করে দেন, এর বাসিন্দাদের হত্যা করেন এবং পবিত্রভূমি থেকে অবশিষ্ট ইহুদীদের বহিষ্কার করেন।

আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতাও আলেম-ওলামাদের রক্তে নিজেদের রাঙিয়েছে ও আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করেছে। তাই এর উপরও আল্লাহর গজব আপতিত হবে। মালহামা বা পারমাণবিক বিশ্বযুদ্ধ আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেবে।

—

“আর তোমরা যখন বললে, হে মূসা, আমরা একই ধরনের খাদ্য-দ্রব্যে কখনও ধৈর্য্যধারণ করব না। কাজেই তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট আমাদের পক্ষে প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের জন্যে এমন বস্তুসামগ্রী দান করেন যা জমিতে উৎপন্ন হয়, তরকারী, কাকড়ী, গম, মসুরি, পেঁয়াজ প্রভৃতি। মূসা (আঃ) বললেন, তোমরা কি এমন বস্তু নিতে চাও যা নিকৃষ্ট সে বস্তুর পরিবর্তে যা উত্তম? তোমরা কোন নগরীতে উপনীত হও, তাহলেই পাবে যা তোমরা কামনা করছ। আর তাদের উপর আরোপ করা হল লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহর রোযানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল। এমন হলো এ জন্য যে, তারা আল্লাহর বিধি বিধান মানতো না এবং নবীগনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তার কারণ, তারা ছিল নাফরমান সীমালংঘকারী।” [সূরা বাকারাহঃ ৬১]

দাজ্জালি মুদ্রা ব্যবস্থা : (ক্রিপ্টো কারেন্সি বা বিট কয়েন)

মনে করুন, সুইস ব্যাংকে আপনি দশ মিলিয়ন ডলার জমা করে রেখেছেন। কিংবা আপনার হাতে আছে একটি ক্রেডিট কার্ড, যা দিয়ে যেকোনো সুপার শপ থেকে যেকোনো সময় আপনি ইচ্ছেমতো পণ্য ক্রয় করতে পারেন। আপনি নিজেকে অনেক ধনী ভাবছেন। ভবিষ্যৎ-সংকটে এটাকে শক্তিশালী রিজার্ভ মনে করছেন। ক্রেডিট কার্ড নিয়ে অনেক ফুরফুরে মেজাজে আছেন। নিশ্চিত্তে রঙিন জীবনের প্ল্যান সাজিয়ে চলছেন। কিন্তু হায়, যদি জানতেন যে, আপনি কত বড় ভুলের মধ্যে আছেন! শুধু ভুলই নয়; এ যে এক মহাভুল! দুঃসময়ে যে মহাভুলের মাশুল গোনারও সুযোগটুকু পাবেন না।



আপনার এ দশ মিলিয়ন ডলার যেকোনো মুহূর্তেই গায়েব হয়ে যেতে পারে। হয়ে যেতে পারে সব হঠাৎ করেই মূল্যহীন কিছু কাগজ। কোনো এক সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনবেন, আপনার জীবনের সঞ্চিত সব ডলার আজ থেকে কেবলই কাগজের কিছু টুকরো। জি হ্যাঁ, কেবলই কাগজের টুকরো; বরং তার চাইতেও মূল্যহীন। আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই তো! পাগল ভাবছেন? জি না, আমি ভুল বলছি না, পাগলামিও করছি না। আপনাকে শোনাচ্ছি আমি আশু বিপর্যয়ের এমন কিছু তিত্ত সত্য, যে ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই উদাসীনা

পৃথিবীতে মজুত সমুদয় স্বর্ণের বিরাট একটি অংশই আজ আমেরিকার হাতে।
 পৃথিবীতে সর্বাধিক স্বর্ণের মালিক আমেরিকার হাতে রয়েছে ৮১৩৪ টন স্বর্ণ। দ্বিতীয়
 সর্বাধিক স্বর্ণের দেশ জার্মানির হাতে রয়েছে ৩৩৬৭ টন স্বর্ণ। এরপর ইতালির কাছে
 রয়েছে ২৪৫২ টন, এরপর ফ্রান্সের কাছে ২৪৩৬ টন, এরপর রাশিয়ার কাছে ২২১৯
 টন, এরপর চীনের কাছে ১৯৩৭ টন, এরপর সুইজারল্যান্ডের কাছে ১০৪০ টন,
 এরপর জাপানের কাছে ৭৬৫ টন, এরপর ভারতের কাছে ৬১৮ টন, এরপর
 নেদারল্যান্ডের কাছে ৬১৩ টন। দেখা যাচ্ছে, স্বর্ণ মজুতের তালিকায় বিশ্বের প্রথম
 দশটি রাষ্ট্রের মধ্যে কেবল আমেরিকার হাতেই রয়েছে এক তৃতীয়াংশের বেশি স্বর্ণ।
 এত স্বর্ণ সে পেল কোথায়? নিজেরা স্বর্ণ তৈরি করেছে? নিজ দেশের খনি থেকে
 স্বর্ণ উত্তোলন করেছে? জি না; বরং সে লুট করেছে। বলা যায়, এক প্রকারের
 ডাকাতি করেছে। বিশ্বকে ডলার নামে কিছু কাগজের টুকরো দিয়ে বিনিময়ে তারা
 স্বর্ণ গ্রহণ করে নিজ দেশে গড়ে তুলেছে স্বর্ণের বৃহৎ মজুত। কিন্তু কীভাবে সে
 বিশ্বকে বোকা বানিয়ে এটা চালু করল? সে এক ভিন্ন ইতিহাস। আমি সেদিকে যাচ্ছি
 না।

আপনি কি জানেন, ডলারের পিছনে বিশ্বের রথী-মহারথীদের সুদূরপ্রসারী কী ভয়ংকর
 ষড়যন্ত্র লুকিয়ে রয়েছে? আজকের পোস্টে শুধু সতর্ক করা উদ্দেশ্য, দীর্ঘ
 আলোচনার অবকাশ নেই। সংক্ষেপে এতটুকু জেনে নেওয়াই যথেষ্ট যে, নানা দেশে
 দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ করা সত্ত্বেও আমেরিকা আজ পর্যন্ত যতটুকু টিকে আছে, তা শুধু এ
 ধোঁকাপূর্ণ ডলারব্যবস্থার কারণেই। যদিও ইদানিং তাদের অর্থব্যবস্থায় বড় ধরনের ধস
 নামতে যাচ্ছে। পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত বিশ্বকে বোকা বানানোর যতগুলো
 কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে, তন্মধ্যে ডলারভিত্তিক এ মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলনটা ছিল
 সবচেয়ে ভয়ানক, সূক্ষ্ম ও ক্ষতিকর।

আজ যদিও বিশ্বের অনেক দেশ ধোঁকাপূর্ণ এ ব্যবস্থার বিষয়টি বুঝতে পারছে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। রাশিয়া, চীন, ইন্ডিয়াসহ এ মুহূর্তে সবাই গোল্ড জমা করার চেষ্টায় নেমেছে। আর জনগণ যেন এ ব্যাপারে সতর্ক ও সজাগ হওয়ার অবকাশ না পায়, তারা যেন গোল্ডের পিছনে না ছোটে, সেজন্য দাজ্জালি মিডিয়াগুলো বিভিন্নভাবে গোল্ড কিনতে অনুৎসাহিত করছে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবেও এর ওপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে।



আমেরিকা আজ ডলারকে বাতিল ঘোষণা করে গোল্ড সিস্টেম মুদ্রা চালু করলে আমি আপনি সবাই হয়ে পড়ব কপর্দহীন পথের ফকির। আপনার দশ মিলিয়ন ডলার দিয়ে শুধু ঘরের দেয়ালটাই সাজাতে পারবেন, আর কিছু নয়। এ আশঙ্কা এতদিন হালকাভাবে দেখা হলেও বর্তমান বিশ্বের নানা প্রেক্ষাপটে এটা এখন ভয়ংকর এক বাস্তবতা হয়ে দেখা দিচ্ছে। বেশিদিন আগের কথা নয়, যখন সাদাম হোসেনের সরকার পতনের পর নতুন দিনার ইস্যু করা হলো, তখন পুরাতন সব দিনার হয়ে গেল একেবারে মূল্যহীন। মানুষ তাদের দিনারের নোটগুলো রাস্তায় ফেলে দিল। এক টুকরো সাদা কাগজের মূল্যও ছিল না সেগুলোর! কারণ, ওই দিনারগুলো দিয়ে আর কোনো লেনদেন করার সুযোগ ছিল না।

অনুরূপ করোনা-পরবর্তী বৈশ্বিক বিপর্যয় ও অর্থনৈতিক নানা সমস্যার কারণে এদেশের অর্থব্যবস্থায়ও পরিবর্তন আসতে পারে। আর সেটা হলে আপনিও কিন্তু বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। আপনার টাকাগুলো যেকোনো মুহূর্তে মূল্যহীন হয়ে যেতে পারে; যেমনটি ভারতে একবার ঘটেছিল। আর ব্যাংক যদি দেউলিয়া ঘোষণা

করা হয়, তাহলে আপনার সারাজীবনের কষ্টার্জিত সঞ্চয়ের কী অবস্থা হবে, তা কি কখনো ভেবে দেখেছেন?

বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণ অনুসারে শীঘ্রই হয়তো কাগজের মুদ্রাব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এটার সূচনা হতে পারে আন্তর্জাতিকভাবে ডলারভিত্তিক লেনদেন বাতিল হওয়ার মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন ঘটনাবলী ও নিদর্শন থেকে অনুমেয় হচ্ছে, অচিরেই হয়তো বৃহৎ শক্তিগুলোর মাঝে যুদ্ধ শুরু হবে। হাদিসে বর্ণিত মালহামা বা রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধের কালও সন্নিকটে মনে হচ্ছে। করোনা-পরবর্তী বৈশ্বিক অর্থনীতিতেও যে বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে, এ ব্যাপারে কারও সন্দেহের অবকাশ নেই। এছাড়াও বিভিন্ন দুর্যোগ, ভূমিকম্প, সিস্টেম ক্রাশ বা বিদ্যুৎ ও নেটব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেলে ব্যাংকে রাখা টাকাগুলো যে সব জলে যাবে, সেটাও সুনিশ্চিত। এগুলো শুধু সম্ভাবনার কথাই বলছি না; বাস্তবেই ঘটতে পারে বলে এ ব্যাপারে অনেক বিশেষজ্ঞ ও গবেষক কঠিনভাবে সতর্ক করেছেন। সবগুলো বিষয় সামনে রাখলে বিবেকবান মাত্রই উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, ব্যাংকে কাগজে টাকা রাখা ও এর ওপর নির্ভর করে বসে থাকাটা কত বড় বোকামি! বুঝতেই পারছেন, ফালতু এই কাগজে মুদ্রাব্যবস্থার কারণে আমরা কতটা রিস্কের মধ্যে আছি! এটা ঠিক যে, জঘন্য এ ডলারব্যবস্থা বা কাগজে মুদ্রা আমরা এখন ইচ্ছে করলেও পরিবর্তন করতে পারব না। তবে আমরা সবাই সচেতন হয়ে কমপক্ষে নিজে বা নিজের ঘনিষ্ঠদের তো সতর্ক করতে পারি।

শীঘ্রই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছে। সে পৃথিবীর সব সম্পদ নিজ হাতে নিয়ে নেবে। তখন মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে হবে খাদ্য ও পানির সংকট। প্রস্তুতিহীন দুর্বল ইমানদাররা ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে দাজ্জালকে নিজেদের ইলাহ ও রব হিসেবে মেনে নেবে। অথচ তারা যদি আগ থেকেই এ ব্যাপারে সচেতন থাকত, হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন

করে রাখত, তাহলে সে কঠিন মুহূর্তে তাকে ইমান হারাতে হতো না। তাই এখনই সঠিকভাবে আর্থিক পরিকল্পনা করে রাখুন। মনে রাখবেন, দেশের সরকার বহাল থাকুক বা না থাকুক, আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে পরিবর্তন আসুক বা না আসুক, মুদ্রাব্যবস্থা ভেঙে পড়ুক বা না পড়ুক, সর্বাবস্থায় আপনার স্বর্ণ, রূপা ও ভোগ্য পণ্যসমূহের মূল্য কখনোই পরিবর্তন হবে না। কারণ, এগুলোর নিজস্ব মূল্য (সেলফ ভ্যালু) ও উপযোগ আছে। কেউ চাইলেও তা বাতিল করতে পারবে না।



মুদ্রার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এটার নিজস্ব মূল্য বা তার উপযোগ থাকতে হবে এবং তা কখনো মূল্যহীন বস্তু (যেমন, কাগজ) হতে পারবে না। স্বর্ণ-রূপা এমন দুটি পদার্থ, যা মানবসভ্যতার শুরু থেকে নিয়ে ক্রিয়ামত পর্যন্ত মূল্যবান হিসেবে পরিগণিত। এ দুটি জিনিস কখনো ভ্যালু হারিয়ে মূল্যহীন হবে না। অনুরূপ চাল-ডাল, গম, চিনি, আটা, লবণ ইত্যাদি প্রতিটি ভোগ্য পণ্যের নিজস্ব উপযোগ আছে এবং তা হলো আমাদের ক্ষুধা মেটানোর ক্ষমতা। এমন নয় যে, সরকারের অধ্যাদেশে এসব ভোগ্য পণ্যের উপযোগ কখনো বাতিল হয়ে যেতে পারে। তাই পৃথিবীর যেখানেই যান না কেন, প্রতিটি ভোগ্য পণ্যের উপযোগ প্রায় একই থাকে, অর্থাৎ তাদের নিজস্ব একটি মূল্য সব সময়ই থাকে। একইভাবে গবাদি পশু-পাখির কথাও বলা যায়। এগুলোর উপযোগেও তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না।

আমাদের অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দশ বছর পূর্বেই উম্মতকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন। তিনি ইরশাদ করেন :

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالْدِّرْهُمُ

‘মানুষের সামনে নিশ্চিতই এমন এক সময় আসবে, যখন দিনার (গোল্ড) ও দিরহাম (সিলভার) ছাড়া কোনো কিছুই কাজে আসবে না।’ (মুসনাদু আহমাদ : ১৭২০১)

মুজামে কাবিরের বর্ণনায় এসেছে :

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَصْفَرُ وَلَا أَبْيَضُ لَمْ يَتَّهَنْ بِالْعَيْشِ

‘মানুষের সামনে এমন একটি সময় আসছে, যখন যার কাছে হলুদ (গোল্ড) ও সাদা (সিলভার) বস্তু থাকবে না, সে স্বাচ্ছন্দ্যে নিদ্রাও যেতে পারবে না।’ (আল-মুজামুল কাবির : ২০/২৭৮)

আরেকটি সনদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ فِيهَا مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالذَّنَانِيرِ يُقِيمُ الرَّجُلُ بِهَا دِينَهُ وَدُنْيَاهُ

‘যখন শেষ জমানা আসবে তখন লোকদের দিনার (গোল্ড) ও দিরহাম (সিলভার) ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। (মুমিন) লোক তখন এগুলোর দ্বারা তার দ্বীন ও দুনিয়ার সকল বিষয় পরিচালনা করবে।’ (আল-মুজামুল কাবির : ২০/২৭৯)

সনদগত দিক থেকে হাদিসগুলো যদিওবা একটু দুর্বল, তবে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও বর্তমান বাস্তবতা আমাদের সামনে হাদিসের সত্যতা দিন দিন স্পষ্ট করে তুলছে। স্পষ্টভাবেই আমরা বুঝতে পারছি, কাগুজে মুদ্রা ও ডলারের অন্ধকার ভবিষ্যৎ। আমাদের সামনে কী যে মহাসংকট ও দুর্য়োগ অপেক্ষা করছে, তা কল্পনা করতে

গেলেও শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে! তাই এখন কে কত দ্রুত সবকিছু সামলে নেবে, সেটাই দেখার বিষয়। এক যুগ আগে একসময় আমারও বুঝে আসত না যে, মানুষ কেন গণহারে দাজ্জালকে রব বলে মেনে নেবে। পরে আস্তে আস্তে বিষয়টি ক্লিয়ার হতে থাকে। আর এখন তো আলহামদুলিল্লাহ, এটা সূর্যের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে। বস্তুত দাজ্জালের ফিতনার বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে অনেকদিন আগেই। এখন কেবল পূর্ণতায় পৌঁছতে বাকি। আর পূর্ণতায় পৌঁছতেও বেশি সময় নেই বলে মনে হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা-ই ভালো জানেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সব ধরনের ফিতনা থেকে হিফাজত করুন এবং এসব ব্যাপারে সজাগ থেকে অগ্রীম প্রস্তুতি নেওয়ার তাওফিক দান করুন। (আমীন)

দিনার ও দিরহাম- আল্লাহর অশেষ এক নিয়ামত:

আমরা হাদিস ও ইতিহাস পড়ার সময় অনেক বার এই দুটি মুদ্রার নাম শুনি। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ এই মুদ্রা সম্পর্কে কিছুই জানে না। আমরা জানি মহরে ফাতেমি হল ৫০০ দিরহাম কিন্তু এই ৫০০ দিরহামের বর্তমান মূল্য কত তা আমরা জানি না। এমনি ভাবে যখন পড়ি, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু উম্মুল মুনিনিদের জন্য ১২ হাজার দিরহাম করে ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন, বা যাকাতের নিসাব পরিমাণ হল ২০০ দিরহাম বা ২০ দিনার, দিয়তের মূল্য হল ১০ হাজার দিরহাম অথবা ১ হাজার দিনার। অমুক সাহাবী বা তাবীঈ ১ হাজার দিনার দান করলেন। তখন আমরা সেসবের হিসাব মিলাতে পারি না। ইসলামের বেশ কিছু বিধান দিনার দিরহামের সাথে সংযুক্ত যেমন, যাকাত, বিয়ে, হুদুদ, কাফফারা ইত্যাদি। যুগ যুগ ধরে মুসলিমরা সকল প্রকারের ক্রয় বিক্রয়, লেনদেন করার সময় দিনার দিরহামকে প্রধান বিনিময়ের মাধ্যম বলে গন্য

করত। কিন্তু আজ তা বিলুপ্ত। দিনার ও দিরহামের নাম কুর'আনেও এসেছে। হাদিসে এসেছে অসংখ্য বার। হাদিসে এসেছে-

“মানবজাতির উপর এমন সময় অবশ্যই আসছে যখন দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) ছাড়া ব্যবহার করার মত বা উপকারী আর কিছুই থাকবে না”

আমাদের উপর আল্লাহর অশেষ রহমত যে তিনি অর্থকেন্দ্রিক ইসলামের বিভিন্ন বিধান দিরহাম ও দিনারের হিসাবে আরোপ করেছেন। আল্লাহ্ আকবর। যদি এটা হারাম কাণ্ডজে মুদ্রায় নির্ধারণ হত তাহলে পুরো নিজাম ভেঙ্গে যেত। ইংসা আল্লাহ আমরা তা আলোচনা করব।



দিরহাম দিনারের ইতিহাস

মানব ইতিহাসের প্রারম্ভ থেকে মুদ্রা হিসেবে স্বর্ণ ও রূপা ব্যবহার করা হত। বারটার সিস্টেমের সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়ার পরে মানুষ স্বর্ণকে মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করে নেই। ৫ হাজার বছর ধরে এই মুদ্রা ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। ফিরাউনের যুগে মিশরেও এই

ব্যবস্থা চলত। সকল বড় বড় সাম্রাজ্য নিজেরা স্বীয় স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বানাত। গ্রীক, রোমান, পারস্যীয়, সাসানিয়ান সহ প্রায় সকল বড় সাম্রাজ্য। যাইহোক, প্রথমে মুসলিমরা পারস্যীয় স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহার করত। উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের সময়ের মুসলিমরা প্রথম বারের মতন মুদ্রা তৈরি করে। সেটা ছিল সাসানিয়ান সাম্রাজ্যের আদলে রৌপ্যমুদ্রা বা দিরহাম। তারপরে ৭৫ হিজরি তথা ৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আবদুল মালিক অফিসিয়ালি ভাবে উমার ইবনে খাতাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর মান অনুযায়ী দিরহাম প্রস্তুত করান। তিনি পূর্বের মানুষ ও পশুর চিত্র সম্বলিত কয়েন বন্ধ করে আল্লাহর নাম লিখে নতুন মুদ্রার প্রবর্তন ঘটান। এরপরে বিভিন্ন সময়ে এই মুদ্রা গুলোর উন্নয়ন ঘটে, এভাবে একসময় মুদ্রার এক পিঠে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ও ‘আলহামদুলিল্লাহ’ এবং অপরপিঠে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামসহ মুদ্রা ছাপানো হয়। ১৯২৪ সালে খিলাফতের ধ্বংসের সাথে সাথে দিনার ও দিরহাম মুদ্রা ব্যবস্থার পতন ঘটে।

দিরহাম পরিচিতি



দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা)

দিরহাম হল রৌপ্যমুদ্রা। সাধারণত ৩ গ্রাম রূপা দিয়ে ১ দিরহাম তৈরি করা হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাম্রাজ্যে রূপার পরিমাণে হেরফের হয়েছিল তাই আমরা একাধিক মান পাই। উসমানি খিলাফতে ১ দিরহাম ৩.২০৭ গ্রাম রূপা দিয়ে তৈরি করা হত।

দিরহামের মান নির্ধারণে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, হানাফিদের মত ৩.১২৫ আর অন্য ইমামদের মতে ২.৯৬, এছাড়াও অনেকের মতে ২.৯৭৫ হল সঠিক মান। যাইহোক আমরা ধরব,

১ দিরহাম = ৩ গ্রাম রূপা

১ গ্রাম রূপার বর্তমান বাজার মূল্য হল ৪৬.২৬ টাকা। (আন্তর্জাতিক বাজারে রূপার মূল্য ১ গ্রাম = ৪৬.২৬ টাকা, কিন্তু দেশীয় বাজারে ১ গ্রাম = ৯০ টাকা, আমরা এখানে আন্তর্জাতিক মূল্যে হিসেব করব) তাহলে,

১ দিরহাম = ১৩৯ টাকা

যাকাতের নেসাব ২০০ দিরহাম হল ২৭,৮০০ টাকা

মহরে ফাতেমি ৫০০ দিরহাম = ৬৮০০০ টাকা

সর্ব নিম্ন বিয়ের মহর হল ১০ দিরহাম যার বর্তমান বাজার মূল্য হল ১৩৯০ টাকা।

শাফেয়ী মাজহাবে সর্বনিম্ন মহর হল ৩০ দিরহাম অর্থাৎ ৪১৭০ টাকা।

দিয়েতের মূল্য হল ১০ হাজার দিরহাম = ১৩,৯০,০০০ টাকা।

একই ভাবে ১০০০ দিরহাম এর মূল্য হল ১,৩৯,০০০ টাকা।

হাদিস ও ইতিহাস থেকে দিরহামের কিছু উদাহরণ

আম্মাজান হযরত জায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা তার বাৎসরিক ভাতার ১২ হাজার দিরহামের প্রায় সব দান করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি ১২ হাজার দিরহাম = ১৬,৬৮,০০০ টাকা দান করেছিলেন। খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা'র ভাতিজা যায়েদ বিন হারেসা রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে ৪০০ দিরহামে কিনেছিলেন অর্থাৎ ৫৫,৬০০ টাকায়। সাধারণত তখন দাস দাসীর মূল্য ছিল প্রায় ৫০০ দিরহাম অর্থাৎ ৭০ হাজার টাকা।

ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “ইসলাম গ্রহণের সময় হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট ৪০ হাজার দিরহাম বা ৫৫৬০০০০ টাকা ছিলো। (দিরহামের আজকের বাজার মূল্য ১৩৯ টাকা হিসেবে) আর হিজরতের সময় ৫ হাজারের বেশি ছিল না। বাকি সব দিরহাম তিনি ইসলামের সাহায্যে এবং মুসলমান গোলাম কিনে আবাদ করার পেছনে ব্যয় করেছেন।” (ইবনে সাইদ সূত্রে তারিখুল খুলাফায় বর্ণিত) অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে তিনি প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ইসলামের জন্য ব্যয় করেন।

রুমা কূপ মদিনার সুপেয় পানি সরবরাহের সবচেয়ে বড় মাধ্যম ছিল। উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু তা ৩৫ হাজার দিরহামের বিনিময়ে অর্থাৎ ৪৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছিলেন। তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে ৫০ হাজার দিরহাম অর্থাৎ প্রায় ৭০ লক্ষ টাকার কর্জ নিয়েছিলেন যা পরে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু মওকুফ করে দিয়েছিলেন।

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফতে বিচারকের মাসিক সর্বোচ্চ বেতন ছিল ৫০০ দিরহাম আর সর্বনিম্ন ছিল ২০০ দিরহাম। বসরায় সালমান ইবনে রাবিয়া রাযি. মাসিক ৫০০ দিরহাম বেতন পেতেন অর্থাৎ প্রায় ৭০ হাজার টাকা।

জিজিয়া- জিজিয়ার পরিমাণ অনির্দিষ্ট ছিল। শহর, ব্যক্তি ভিন্নতায় জিজিয়া তে ভিন্নতা ছিল। যাইহোক গরিবদের জন্য জিজিয়া হল ১২ দিরহাম, মধ্যবিত্তদের জন্য ২৪ দিরহাম। সবচেয়ে ধনী সারীর অমুসলিমদের জন্য এটা ছিল প্রায় ৪৮ দিরহাম অর্থাৎ ৬৬৭২ টাকা মাত্র। রাজ্যের সবচেয়ে ধনী অমুসলিমরা বছরে মাত্র ৬,৬৭২ টাকা জিজিয়া বা কর হিসেবে মুসলিম শাসককে প্রদান করবে। হাস্যকর হল বর্তমানে প্রত্যেক রাষ্ট্রের নাগরিক এর চাইতে অনেক বেশি ট্যাক্স দিয়ে থাকে কিন্তু জ্ঞানপাপীরা এটা নিয়ে প্রশ্ন করে না, শুধু জিজিয়া জিজিয়া বলে তারা চিৎকার করতে পারে।

দিনার পরিচিতি

দিনার হল স্বর্ণমুদ্রা। সাধারণত ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণে হয় ১ দিনার। এটা নিয়ে তেমন মতভেদ নেই যদিও কিছু আলেমের মতে ৪.২৩৫ গ্রাম স্বর্ণ হল ১ দিনার।

১ দিনার = ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ

১ গ্রাম স্বর্ণের বর্তমান বাজার মূল্য হল ৩,৬০৭.৩০ টাকা। অর্থাৎ

১ দিনার = ১৫,৩৩১ টাকা

যাকাতের নেসাব ২০ দিনার সমান ৩,০৬,৬২০ টাকা।

দিয়েতের ১ হাজার দিনার হল ১,৫৩,৩১,০০০ টাকা।

হাদিস ও ইতিহাস থেকে দিনারের কিছু উদাহরণ

তাবুক যুদ্ধে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু ৯৪০টি উট ও ৬০টি ঘোড়ার পাশাপাশি ১০ হাজার দিনার দান করেছিলেন। ১০ হাজার দিনার অর্থাৎ ১৫ কোটি ৩৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা।

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফত কালে, মিশরের গভর্নর আমর ইবনুল আস রাযি. কে মাসিক বেতন দেয়া হত ২০০ দিনার অর্থাৎ ৩০,৬৬,২০০ টাকা। সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া রাযি.কে বেতন হিসেবে প্রতি বছর দেয়া হত ১০ হাজার দিনার। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ১৫ কোটি টাকা।

বদর যুদ্ধের পূর্বে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে যে ব্যবসায়ী কাফেলা শাম থেকে মক্কায় যাচ্ছিল তাতে বাণিজ্যিক সম্পদের পরিমান ছিল মোট ৫০ হাজার দিনার অর্থাৎ প্রায় ৮০ কোটি টাকা। বদর যুদ্ধে বন্দীদের মুক্তিপণ হিসেবে মাথা প্রতি ৪০০ দিরহাম ধার্য করা হয়েছিল। অর্থাৎ ৫৫,৬০০ টাকা।

ইসলামিক স্টেট ২০১৪ সালের শেষের দিকে দিনার ও দিরহাম মুদ্রা তৈরি করেছিল। ২১ কেরেট গোল্ড এর ৪.২৫ গ্রাম দিয়ে এক দিনার প্রস্তুত করেছিল তারা। এছাড়াও তারা রূপা ও তামা'র মুদ্রা চালু করেছিল।

১৪০০ বছর আগে মক্কায় ৮০ দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে ১১ হাজার টাকা দিয়ে একটি মাঝারি সাইজের উট পাওয়া যেত। যেহেতু উটের যোগান কম তাই এখন আমরা ৮০ দিরহামে একটি উট পাবো না। কিন্তু তখন ১ দিনারে একটি মেষ এবং একটি ছাগল পাওয়া যেত, অর্থাৎ ১৫৩৩১ টাকায়। মেষ ও ছাগলের যোগান উটের মত কম নয় তাই এখনো আমরা ১ দিনারে একটি মেষ বা একটি ছাগল কিনতে পারব।

শাম থেকে ইয়ামানের বাণিজ্যিক পথ এর কেন্দ্র বিন্দু ছিল মদিনা। শুধু মাত্র মক্কাবাসী মদিনা কেন্দ্রিক ট্রেড রুট ব্যবহার করা বাৎসরিক ২ লক্ষ দিনারের ব্যবসা করত। অর্থাৎ প্রায় ৩০৭ কোটি টাকার ব্যবসা হত।

আলী ইবনু আবদুল্লাহ (রহঃ) ... উরওয়া বারিকী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বকরী ক্রয় করে দেয়ার জন্য তাঁকে একটি দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) দিলেন। তিনি ঐ দ্বীনার দিয়ে দুটি বকরী ক্রয় করলেন। তারপর এক দ্বীনার মূল্যে একটি বকরী বিক্রি করে দিলেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে একটি বকরী ও একটি দ্বীনার নিয়ে হাযির হলেন। তা দেখে তিনি তার ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত হওয়ার জন্য দু'আ করে দিলেন। এরপর তার অবস্থা এমন হল যে, ব্যবসার জন্য যদি মাটিও তিনি খরীদ করতেন তাতেও তিনি লাভবান হতেন।" (সহিহুল বুখারী)



আমর ইবনু আলী (রহঃ) ... ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেনঃ যে ব্যক্তি হায়য অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করে, সে এক দিনার অথবা অর্ধ দিনার সা'দকা করবো" (সুনান নাসাঈ) অর্থাৎ যে লোক হায়য অবস্থায় আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও সহবাস করে তার উপর ১ দিনার অর্থাৎ ১৫৩৩১ টাকা বা অর্ধ দিনার সদকা করা ওয়াজিবা।

গানীমাত হিসাবে দিনার

উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফত কালে, আফ্রিকায় যুদ্ধে মোট ৩ কোটি দিনার গানীমাত অর্জন হয়েছিল। অর্থাৎ প্রায় ৪৬ লক্ষ কোটি টাকা। পদাতিক ১৮০০০ সৈন্য পেয়েছিল ১০০০ দিনার করে আর অশ্বারোহী ২০০০ সৈন্য পেয়েছিল ৩০০০ দিনার করে। বাইতুল মালে এক-পঞ্চমাংশ ছিল অর্থাৎ ৬০ লক্ষ দিনার।

জিজিয়া বাবদ আয়

চুক্তির ভিত্তিতে আজারবাইজান পদানত হয়েছিল তারা বার্ষিক ৮ লক্ষ দিরহাম জিজিয়া প্রদানের শর্তে চুক্তি করে। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ১১ কোটি টাকা। জুরজান থেকে জিজিয়া বাবদ আয় হত তিন লক্ষ দিনার অর্থাৎ ৪৬০ কোটি টাকা।

সবচেয়ে ধনী মুসলিম আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাবুক যুদ্ধে ৮ হাজার দিনার দান করেন। অর্থাৎ ১২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। তিনি তার একটি জমি ৪০ হাজার দিনারে অর্থাৎ প্রায় ৬১ কোটি টাকায় বিক্রয় করেন এবং পুরো অর্থ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন। তিনি সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ছিলেন। এছাড়াও তিনি ৪০ হাজার দিরহাম অর্থাৎ ৫৬ লক্ষ টাকা, মুজাহিদদের জন্য ৫০০ ঘোড়া, ১৫০০ উট দান করেছিলেন। জীবিত বদরি সাহাবী ও আন্মাজানদের জন্য ৪০০ দিনার অর্থাৎ ৬২ লক্ষ করে হাদিয়া দিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি ২০০ আউকিয়া বা অক্লা দান করেছিলেন। ১ অক্লা = ১২৮.৩ গ্রাম স্বর্ণ। সে হিসাবে তিনি প্রায় ১০ কোটি টাকা আল্লাহর রাস্তায় দান করেছিলেন। এসব হল ইতিহাসে পাওয়া সাহাবীদের বদান্যতার উদাহরণ আর তাদের গোপনে দান করা টাকার পরিমাণ কত ছিল তা আল্লাহই জানেন। আর আমরা ১০-২০-৫০ টাকা দান করে অহংকার অহমিকায় লিপ্ত হয়ে যাই। মনে ভাবি না জানি কত টাকা দান করে কত বড় দানবীর হয়ে গেছি।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকালের সময় তার সম্পদের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে আজকের যুগেও মানুষ অবাক হয়। তিনি ইন্তেকালের সময় ৩১০,৩০,০০,০০০ (৩১০ কোটি ৩০ লক্ষ) দিনার রেখে যান। এটার বর্তমান মূল্য হল $(৩১০,৩০,০০,০০০ * ১৫৩৩১) = ৪৭,৫১,০০৩,৩০,০০,০০০$ (অর্থাৎ ৪৭ লক্ষ ৫১ হাজার ৩ কোটি ৩০ লক্ষ) টাকা। ডলারের হিসাবে এটার মূল্য ৫০১ বিলিয়ন ডলার। ২০১৭ সালে বিল গেটসের মোট সম্পত্তি ছিল মাত্র ৮৬ বিলিয়ন ডলার।



এখন কিছু প্রশ্ন করি-

চিন্তা করুন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহার মরুর দিরহামে না নিয়ে আজকের কাগুজে মুদ্রায় নতেন তাহলে কি হত ?

চিন্তা করুন যাকাতের নেসাব টাকায় নির্ধারণ হলে কি সমস্যা হত?

ধরুন ফাতাওয়ার গ্রন্থে মরুরে ফাতেমি ৫০০ দিরহাম না লিখে সোজা টাকার পরিমাণ লিখে দেয়া হল। এখন আপনি কিতাব খুলে পেলেন মরুরে ফাতেমি হল ২৬,২৫০ টাকা (আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব ২/১৩৭; ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া ২/৯৬- উভয় বই প্রায় ১৫ বছর আগে লেখা হয়েছে)। আর সর্বনিম্ন মরুর পেলেন ৫২৫ টাকা। আপনি আজকেও এই ২৬,২৫০ টাকাকে মরুরে ফাতেমি মনে করবেন। অথচ টাকার মূল্য সময়ের সাথে সাথে কমে, আর দিনার দিরহামের মূল্য কমে না। এতে কোনো

ক্ষয় নেই। আপনি ৫০০ দিরহামের মূল্য হিসাব কষে বের করতে পারবেন। যা আজকের ৬৮ হাজার টাকা।

২০০১ সালে আপনি আলেমের কাছে শুনেছেন যাকাতের নেসাব হল ১০,৫০০ টাকা। তারপর আর আপনি নতুন করে জানার চেষ্টা করেন নি, কিংবা সরকার জনগনের সুবিধার্থে আলেমদের পরামর্শে ১০,৫০০ টাকাকে নেসাবের পরিমাণ হিসেবে ফিক্স করে দিল। তাহলে ১৮ বছর পর আজকেও যাদের কাছে ১০,৫০০ টাকা থাকত তাদের উপর যাকাত দেয়া ফরজ হত। আর ৫০ বছর পরে দেখা যাবে ১০,৫০০ টাকা দিয়ে বাজারে কিছুই কেনা যাবে না, ফকিরের দান পাত্রেও এত রকম থাকবে। তখন উক্ত ফকির উপরও যাকাত ফরজ হয়ে যাবে।

এমনি ভাবে ফিতরার মূল্য চাল, খেজুর বা পন্য দ্রব্যের দামে নির্ধারণ না হয়ে যদি টাকায় নির্ধারিত হত তাহলে এক সময় ফিতরার টাকা দিয়ে কয়েক চকলেট কেন যেত শুধু, চাল ডাল কেনা যেত না।

এটাই হল কাণ্ডজে মুদ্রার অসারতা। দিনার দিরহামের মূল্য সব সময় সমান থাকে। এতে মুদ্রাস্ফীতি নেই। ৫ হাজার বছর ধরে দিনার দিরহাম চলছে। এখনো ইনফ্লেশন রেট 'জিরো'।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ১ দিরহাম দিয়ে একটি মুরগি কেনা যেত। আজো এক দিরহাম দিয়ে অর্থাৎ ১৩৯ টাকা দিয়ে মুরগি কেনা যায়। এমন কি ১০ বছর পরে আপনি ১৩৯ টাকা দিয়ে মুরগি পাবেন না কিন্তু ১ দিরহাম সমান মূল্যে অবশ্যই পারবেন। আরেকটু সহজ করি, ২০০৬ সালে ১ দিরহামের মূল্য ছিল ৭০ টাকা। তখন বাজারে মুরগির দাম ছিল ৬০ টাকা। তাহলে ২০০৬ সালেও এক দিরহাম দিয়ে একটি মুরগি কেনা যেত। এখনো এক দিরহাম দিয়ে মুরগি কেনা যায় তবে ৭০

টাকায় কেনা যাবে না। কারণ টাকার মূল্যমান কমে গেছে। এখন কিনতে হলে ১৪০ টাকা লাগবে। আর বর্তমান এক দিরহামের মূল্য ১৪০ টাকা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ১ দিনার দিয়ে একটি ছাগল কেনা যেত। আজো এক দিনার দিয়ে অর্থাৎ ১৫,৩৩১ টাকা দিয়ে একটি ছাগল কেনা যায়। এমনকি ১০ বছর পরে আপনি ১৫,৩৩১ টাকা দিয়ে ছাগল কিনতে পারবেন না কিন্তু ১০০ কেন ১ হাজার বছর পরেও আপনি এক দিনার দিয়ে একটি ছাগল কিনতে পারবেন। এটাই হল হালাল মুদ্রা ব্যবস্থা ও হারাম মুদ্রা ব্যবস্থার পার্থক্য।

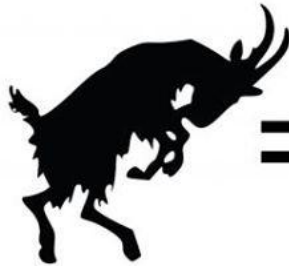
১৪০০ বছর পূর্বে ১ দিনার ও ১ দিরহাম দিয়ে যা কেনা যেত বর্তমানেও সেটাই কেনা যাবে কারণ দিনার ও দিরহামে কোনো মুদ্রাস্ফীতি নেই

১৪০০ বছর আগে

বর্তমানে



=



=



১ দিনার

১৫,৩৩১ টাকা



=



=



১ দিরহাম

১৩৯ টাকা

একটি সংশয়ের অপনোদন

আমাদের অনেকের মধ্যে একটি সংশয় রয়েছে। তা হল- রাসূল (সা) এর যুগে তো দীনার আর দিরহাম বানানো হয় নি তাহলে সুনাহ মুদ্রা আসল কিভাবে? ধরুন কাউকে প্রশ্ন করা হল ভাই গাড়িতে চলাচলের সুনাহ কোনটা তখন উত্তরে বলা হল রাসূল (সা) এর সময়ে গাড়িই ছিল না তাহলে সুনাহ আসবে কিভাবে? আসলে সুনাহ বস্তুর সাথে সব সময় সম্পৃক্ত থাকে না। অনেক সময় সম্পৃক্ত থাকে- বিষয়, কাজ, সময় ও বৈশিষ্ট্যের সাথে।

রাসূল (সা) এর সময় ৬টি বস্তু মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হত। এবং তাই এ ছটি বস্তুর অসম বন্টনকে তিনি সুদ বলেছেন। আবু সাইদ খুদরি (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-‘সোনার বদলে সোনা, রূপার বদলে রূপা, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর এবং লবণের বদলে লবণ বিক্রি করো নগদ নগদ এবং সমান সমান। যে বেশি দিবে অথবা বেশি নিবে সেটা সুদ হিসেবে গণ্য হবে। দাতা-গ্রহীতা এক্ষেত্রে সমান অপরাধী। (মুসলিম : ১৫৮৪)

এই ৬ টি বস্তুর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যে বৈশিষ্ট্য গুলো অন্য বস্তুতে পাওয়া গেলে সেটাও সুনাহ মুদ্রা হতে পারে, আর পাওয়া না গেলে তা সুনাহ মুদ্রা হবে না এমনকি অবস্থাভেদে তা বাতিল বলে সাব্যস্ত হবে। দীনার ও দিরহাম সহ সাময়িক স্থায়িত্ব আছে এমন ভোগ্য পন্য মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমরা একে সুনাহ মুদ্রা বলতে পারি। আর কাগজে মুদ্রাই ওই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না, অন্যদিকে তা প্রতারণা তাই কাগজে মুদ্রা স্পষ্টই হারাম।

আবু বকর ইবন আবি মরিয়ম হতে বর্ণিত যে তিনি আল্লাহর নবী (সাঃ)- কে বলতে শুনেছেন, মানবজাতির উপর এমন সময় অবশ্যই আসছে যখন দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) ছাড়া ব্যবহার করার মত বা উপকারী আর কিছুই থাকবে না- (মুসনাদ, আহমদ)

সহায়ক ওয়েবসাইট-

- <http://www.livepriceofgold.com/bangladesh-gold-price.html>
- <http://www.islamicmint.com/dinar-dirham.html>
- <http://www.e-nisab.com/misc>
- <http://musliminc.com/abdur-rahman-ibn-awf-the-richest-muslim-who-bought-his-way-to-jannah-4012>

সহায়ক গ্রন্থ-

- আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া
- A Brief History of Money in Islam and Estimating the Value of Dirham and Dinar - M. Zarra Nazhad
- স্বর্ণ দিনার ও রৌপ্য দিরহাম- শাইখ ইমরান হোসেন
- আমিরুল মুমিনিন উসমান ইবনু আফফান রাযি- ড. যুবায়ের মুহাম্মাদ
- উমার ইবনুল খাত্তাব রাযি- ড. সাল্লাবী
- আসহাবে রাসূলের জীবনকথা- ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ
- ফাতাওয়া গ্রন্থ- ফাতাওয়ায়ে রাহমানি, নির্বাচিত ফাতাওয়ায়ে মাদানিয়া, আপনার প্রশ্নের জওয়াব, ফাতাওয়ায়ে উসমানী

কাগুজে মুদ্রার প্রতারণা, ও বর্তমান দুনিয়ার অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে আরো জানতে পড়তে পারেন-

কাগুজে মুদ্রা, স্বর্ণের পাহাড়, ডলারের ফাঁদ, সুদের ছিটা--- <https://goo.gl/OsYEJB>

কাওমে শুআইব (আঃ) এবং বর্তমান ফ্যাসাদময় বিশ্ব ও মুদ্রাস্ফীতি ---- <https://bit.ly/2KoPgI7>

সুনাহ মুদ্রার বৈশিষ্ট্য ও বর্তমানে প্রচলিত কাগুজে নোট ---- <https://bit.ly/2je7rDJ>

ডলারের পতনঃ চীন ও রাশিয়া'র স্বর্ণ মজুদকরন ----- <https://bit.ly/2r985XE>

টাকায় কেন লেখা থাকে ‘চাহিবামাত্র ইহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে’ & দাজ্জালি ফেতনা:

এটা দ্বারা কি বুঝায়?

‘চাহিবামাত্র ইহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে’ | টাকার গায়ে এই কথাটি সবাই লক্ষ্য করে থাকবেন। কিন্তু কখনো চিন্তা করেছেন কি, কেন টাকার নোটে লেখা থাকে চাহিবামাত্র ইহার বাহককে ২০/৫০/১০০/৫০০/১০০০ টাকা দিতে বাধ্য থাকিবে?

চাহিবামাত্র ইহার বাহককে ১০০০ টাকা দিতে
বাধ্য থাকিবে - কথাটি লিখে কেন?



৩

এই প্রশ্নের উত্তর খুব সোজা। এজন্য আপনাকে অর্থনীতিবিদ হতে হবে না। তবে জানতে হবে এর পেছনের কথা।

আমরা জানি বাংলাদেশের মুদ্রা ছাপার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক। কিন্তু কথা হলো এই মুদ্রা আসলে কী? মুদ্রা বলতে কী বোঝায় সেই সম্পর্কে একটু ধারণা রাখা ভালো।

বাংলাদেশের সরকারি মুদ্রা হলো ৩ টি। ১, ২, ৫ টাকার নোট কিংবা কয়েন হলো সরকারি মুদ্রা আর বাকিগুলো হলো সমপরিমাণ টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ছাপানো বিল অব এক্সচেঞ্জ।

বাংলাদেশ ব্যাংক টাকার বিপরীতে নোট ছাপে। তাই এটা বাংলাদেশের জনগণের কাছে বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়।

মনে করুন, আপনি কোন কারণে ব্যাংক নোটের উপরে আস্থা রাখতে পারছেন না। তাই আপনি ১০০ টাকার একটি নোট বাংলাদেশ ব্যাংক কাউন্টারে জমা দিয়ে বিনিময় চাইলেন। বাংলাদেশ ব্যাংক চাহিবামাত্র এর বাহককে অর্থাৎ আপনাকে সমপরিমাণ ১, ২, ৫ টাকা প্রদান করে দায় থেকে মুক্তি হবে। এই হচ্ছে মূল বিষয়।

আরেকটু ব্যাখ্যা করা যাক। বাংলাদেশ ব্যাংক যখন কোন নোট বাজারে ছাড়ে তখনই সমপরিমাণ ১,২, ৫ টাকার নোট বা কয়েন সরকারি অ্যাকাউন্ট থেকে নিজের অ্যাকাউন্টে নিয়ে নেয়। আবার যখন ১,২, ৫ টাকা মার্কেটে ছাড়ে তখনই সমপরিমাণ নোট সরকারি অ্যাকাউন্টে জমা দেয়। অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের নিকট থেকে টাকা নিয়ে টাকা ছাড়ে। সে হিসেবে মার্কেটে যত টাকার নোট আছে ঠিক সমপরিমাণ টাকা (১ ও ২) বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে রক্ষিত আছে। সুতরাং সব নোট ব্যাংকে জমা করলেও ১,২, ৫ টাকার কয়েন/ নোট দিতে পারবে বাংলাদেশ ব্যাংক।

১,২,৫ টাকা হলো টাকা বাকিগুলো বিল অব এক্সচেঞ্জ Bill of Exchange. আর এজন্য এই নোটে লেখা থাকে না ‘চাহিবামাত্র ইহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে’

| বাকি নোটগুলোয় ঠিকই লেখা থাকে|..

প্রত্যেকটা ব্যাংকের নোট ইস্যু করে স্বর্ণ মুদ্রার বিপরীতে|

যত টাকা নোট ইস্যু করা হবে ঠিক তত স্বর্ণ বা অন্যান্য আর্থিক সম্পদ বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে সংরক্ষণ করা থাকবে|

চাহিবামাত্র ইহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে এই কথার মানে হলো আপনি যদি বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে আপনার নোট নিয়ে যান তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংক আপনার নোট এর বিপরীতে সমপরিমাণ স্বর্ণ বা আর্থিক সম্পদ দিতে বাধ্য থাকিবে|

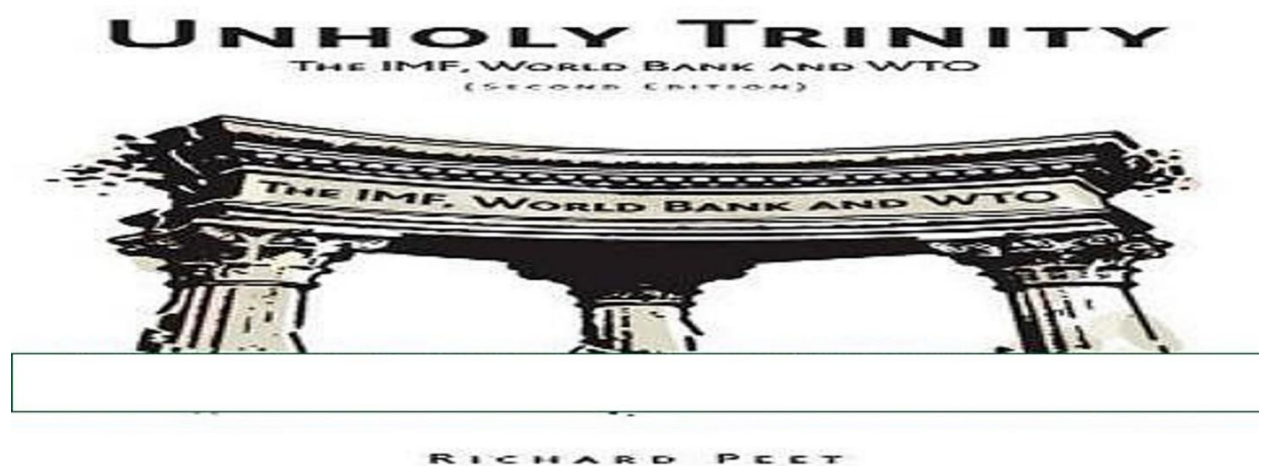


R:M: উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেলো, সম্পদ মূলত ১,২ ও ৫ টাকার কয়েন| কারণ ওগুলোর নিজস্ব মূল্যমান আছে| আর বাকিগুলো কাগজ ছাড়া কিছুই না| এবং আরো বুঝা গেলো, প্রত্যেকটা ব্যাংকের নোট ইস্যু করে স্বর্ণ মুদ্রার বিপরীতে| কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের দেশের ব্যাংকগুলোতে কি পর্যাপ্ত স্বর্ণ মজুদ

আছে? যদি থাকে তো ভালো কথা। আর যদি না থাকে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে আমাদের কাছে কোনো সম্পদ নেই। দাজ্জাল যেকোনো সময় আমাদেরকে ফতুর করে দিতে পারে।

বানিজ্যখাত নিয়ে দাজ্জালি চক্রান্ত:

যে সকল সংস্থা পিছনের দরজা দিয়ে বিশ্বের বানিজ্য ব্যবস্থাকে গুটি কয়েক কর্পোরেশনের অধীনস্থ করার ব্যাপারে তৎপর তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা বা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন। এটি হলো একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যা বিভিন্নভাবে আন্তর্জাতিক বানিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে। আন্তর্জাতিক বানিজ্য আইন প্রণয়ন, বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব সমাধান, শুল্ক নিয়ন্ত্রন, সকল বানিজ্যের খোঁজ-খবর রাখা ইত্যাদি হলো এই সংস্থার কাজ।



আপাত দৃষ্টিতে এদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বেশ ভালো | তাদের কথা মতে তাদের উদ্দেশ্য হলো বানিজ্যে বৈষম্যহীনতা, স্বচ্ছতা, প্রতিযোগিতা মূলক পরিবেশ সৃষ্টি, উন্নয়নশীল দেশ গুলির জন্য সুবিধা সৃষ্টি, পরিবেশ রক্ষা ইত্যাদি | কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় তাদের কার্যক্রম বেশ নেতিবাচক তারা তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ঠিক উল্টোটাই করে থাকে | নিচে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

যদিও বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা এর সিদ্ধান্ত এই বিশ্বব্যাপী সমাজের সকল স্তরে প্রভাব ফেলে, সারা বিশ্বের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে এর কমিটি গঠিত হয়না | কিছু প্রভাবশালী দেশের প্রভাবশালী কর্পোরেশন এর প্রতিনিধি বৃন্দের মাধ্যমে এর বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয় | নীতি নির্ধারণী বৈঠক গুলিও গোপনীয় ভাবে সম্পাদিত হয় | এই বিষয়ে তথ্য চাওয়া হলে তা প্রত্যক্ষান করা হয় |

বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা এর কেন্দ্রীয় কমিটি প্রভাবশালী দেশ গুলির আয়ত্তে থাকার ফলে উন্নয়নশীল দেশ গুলির স্বার্থ তেমন ভাবে রক্ষিত হয়না | বেশির ভাগ সিদ্ধান্ত উন্নত দেশগুলির পক্ষেই হয়ে থাকে | উন্নয়নশীল দেশ গুলি এর ফলে হয় বঞ্চিত | WTO এর বিভিন্ন পলিসি স্থানীয় ছোট ব্যবসা ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকর কিন্তু বড় বড় আন্তর্জাতিক কর্পোরেশন এর জন্য সুবিধা বয়ে আনে |



বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কর্পোরেশন গুলোর মুনাফা অর্জনকে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার উপর অগ্রাধিকার দেয় । তারা শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের পরিবর্তে তাদেরকে অসম প্রতিযোগিতাতে লিপ্ত হতে বেশি উৎসাহিত করে । তাদের পলিসি অনুযায়ী প্রোডাক্ট উৎপাদন করার সময় যদি শ্রমিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘনও হয় তাহলেও সেটিকে সরকার ধর্তব্যে আনতে পারবেনা , প্রতিযোগিতা মূলক উৎপাদনই এখানে বেশি অগ্রাধিকার পায়।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা **GATS** চুক্তির মাধ্যমে জন সাধারণের অত্যাৱশ্যকীয় ১৬০টি পরিসেবা যেমন বৃদ্ধ ও চাইল্ড কেয়ার, সেউএজ ও আবর্জনা নিষ্কাশন, পাবলিক প্রপাটি রক্ষণাবেক্ষণ, টেলিযোগাযোগ, নির্মাণ, ব্যাংক, বীমা, পরিবহন, শিপিং, ডাক ইত্যাদি নানাবিধ পরিসেবা কে বেসরকারী করতে চায় । ধনীরা এর মাধ্যমে তেমন প্রভাবিত না হলেও গরিব মানুষ এসব সেবা থেকে বঞ্চিত হয় । ফলে অসমতা সৃষ্টি হয় । এসব পরিসেবা বিদেশী বড় বড় কোম্পানির আয়ত্বে চলে যায় । ফলে জাতীয় সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হয় ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিবেশ রক্ষার জন্য নানা ধরনের আইন আছে, কোনো পণ্য উৎপাদন করার সময় সেসব আইন মেনে চলতে হয় যাতে পরিবেশের ক্ষতি না হয় । বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এসব আইন কে “**barriers to trade**” বলে অবৈধ ঘোষণা করে । যেমন তারা সর্বপ্রথম “**US Clean Air Act**” কে অবৈধ ঘোষণা করে । তাদের মতে পণ্য উৎপাদনের জন্য পরিবেশ বান্ধবতার জন্য যদি কোনো বাধার সৃষ্টি হয় তবে তারা পরিবেশের উপর পণ্য উৎপাদন কে বেশি অগ্রাধিকার দেয় ।

পৃথিবীর অনেক অনুন্নত দেশে নানা রকম রোগ বালাই আছে যেমন আফ্রিকায় আছে

AIDS এর প্রাদুর্ভাব | এ সত্ত্বেও ‘Trade Related Intellectual

Property’ এর নামে এসব দেশে লাইফ সেভিং ড্রাগস্ উৎপাদন করতে তারা বাধার

সৃষ্টি করে — যাতে এসব দেশ ওষুধ উন্নত বিশ্ব থেকে কিনতে বাধ্য হয় | এর ফলে

এসব ওষুধ হয়ে যায় দুস্প্রাপ্য ও দামী| ফলে ওষুধের অভাবে প্রতি বছর মারা যায়

অসংখ্য মানুষ |

পৃথিবীর ধনী ২০% পৃথিবীর ৮৬% রিসোর্স ব্যবহার করে আর গরিব ৮০% বাকি ১৪%

ব্যবহার করে | বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এর কমিটি গুলিতে ধনী দেশ গুলির প্রতিনিধি থাকার

ফলে তাদের বিভিন্ন পলিসির মাধ্যমে এই বৈষম্য দিনে দিনে প্রকট হচ্ছে |

উন্নয়নশীল দেশ গুলিকে নিয়ম কানুন, শুল্ক, পলিসি ইত্যাদি নানা ফাঁদে ফেলে বিভিন্ন

ভাবে বাণিজ্য করতে বাধা প্রদান করা হয় ও উন্নত দেশগুলির পণ্য খুব সহজেই ক্রয়-

বিক্রয় হয়| ফলে গরিব দেশ গরিবতর হয়, ধনী দেশ হয় আরো ধনী | বিভিন্ন ট্রেড

আলাপ-আলোচনা কিংবা পলিসি নির্ধারণ রুদ্ধদার বৈঠকের মাধ্যমে হয় — অনেক সময়

উন্নয়নশীল দেশ গুলিকে এইসব বৈঠক জানানো পর্যন্ত হয়না, সিদ্ধান্ত তাদের মাথার

উপর চাপিয়ে দেয়া হয় |



বিশ্বে যত মানুষ আছে তাদের সকলের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট খাদ্য এই পৃথিবীতে উৎপাদিত হয় । অথচ খাদ্য বন্টনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কর্পোরেশন এর নিয়ন্ত্রণ থাকার জন্য পৃথিবীর ৮০০ মিলিয়ন মানুষ তীব্র খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতায় ভোগে । বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা “Agreement on Agriculture” এর মাধ্যমে এসব কর্পোরেশন কে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার দেয় ।

মূলত দাজ্জালি শক্তি তাদের আধিপত্য সুদৃঢ় করার জন্য, বানিজ্য খাতকে নিজেদের করায়ত্ত করে, সাধারণ মানুষকে নিজেদের অধীনস্ত রাখতে বাধ্য করার চক্রান্তে লিপ্ত। আমাদেরকে এই বিষয় বুঝতে হবে এবং সতর্ক হতে হবে যেন কোনভাবেই আমাদের পথভ্রষ্ট হতে না হয়।

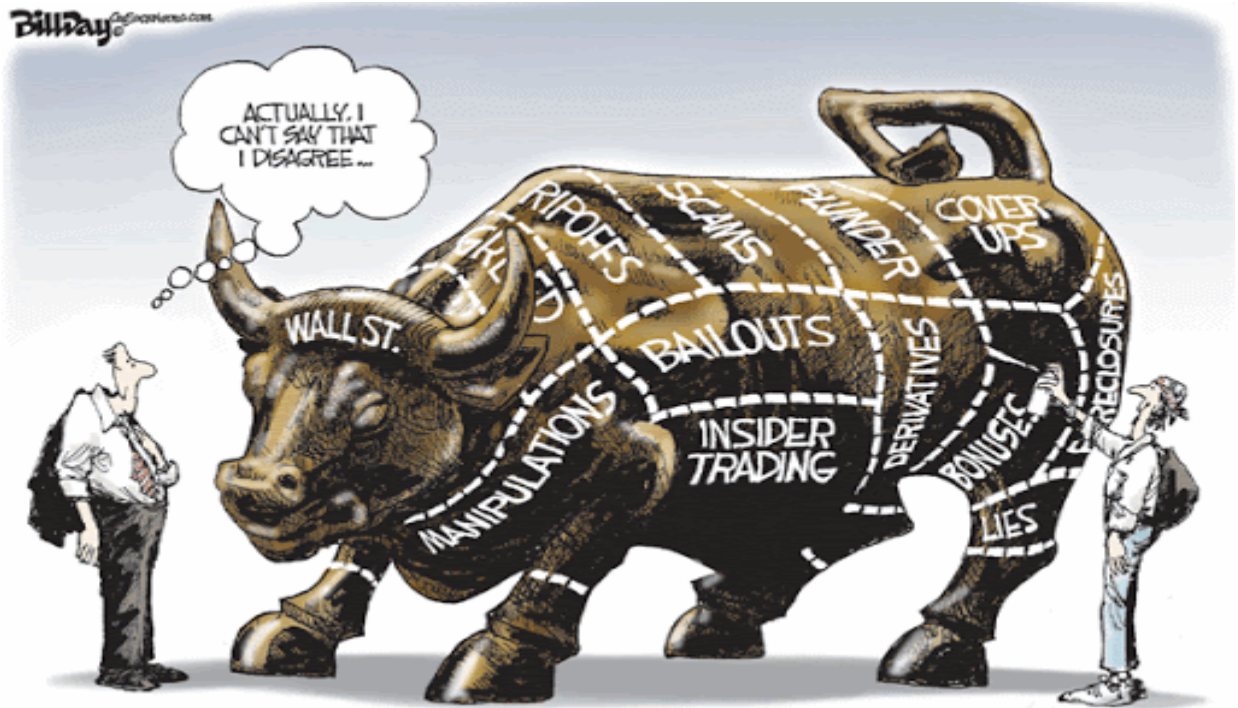


শেয়ার বাজারের ধাপ্লাবাজি:

আমার ১ কোটি টাকা আছে, আমি ব্যাংক থেকে আরো ১ কোটি টাকা লোন নিলাম, টোটাল ২ কোটি টাকা দিয়ে একটা বিস্কুট কোম্পানি বানালাম, এর নাম দিলাম "ABC Limited" .

এবার একটা মার্চেন্ট ব্যাংকে গেলাম, সোনালী ব্যাংকের মার্চেন্ট ব্যাংক, মার্চেন্ট ব্যাংকের হেড অফ অপারেশনকে বললাম আমার বিস্কুট কোম্পানি ABC Limited কে স্টক এক্সচেঞ্জ এ লিস্টেড করতে চাই,

কিন্তু স্টক এক্সচেঞ্জ এর নিয়ম হচ্ছে মিনিমাম ৪০ কোটি টাকার নিচের কোন পেইড-আপ ক্যাপিটাল এর কোম্পানিকে লিস্টেড করা যায় না, কিন্তু আমার কোম্পানি তো মাত্র ২ কোটি টাকার কোম্পানি!!



মার্চেন্ট ব্যাংকের হেড অফ অপারেশন বললেন, "সমস্যা নাই ভাই, আপনার কোম্পানি আমরা লিস্টেড করে দিবো, কিন্তু শর্ত হচ্ছে আপনি আমাকে ৮ কোটি টাকা দিবেন, আমি কষ্ট করবো, আমার পারিশ্রমিক হিসাবে আপনি আমাকে আলাদা ২ কোটি টাকা দিবেন, এইটা আবার আমার ব্যাঙ্ক যেন না জানে, টোটাল ১০ কোটি টাকা".

আমি জবাব দিলাম, " আমি কিভাবে ১০ কোটি টাকা দিবো !!"

মার্চেন্ট ব্যাংকের হেড অফ অপারেশন বললেন, "আপনার নিজের পকেট থেকে এক টাকাও দিতে হবে না, আমরা মার্কেট থেকে আপনাকে টাকা তুলে দিবো, আপনি ওখান থেকে আমাকে ১০ কোটি টাকা দিবেন, আপনি আপনার ৫০ পার্সেন্ট শেয়ার বিক্রি করবেন আর বাকি ৫০ পার্সেন্ট শেয়ার নিজের কাছে রেখে দিবেন".

আমি ওনার শর্তে রাজি হলাম,

এবার ওই মার্চেন্ট ব্যাংকের হেড অফ অপারেশন অডিট ফার্ম এ গেলো, গিয়ে বললো, " এই ABC Limited স্টক এক্সচেঞ্জ এ লিস্টেড করবো".

অডিট ফার্ম বললো, " কি করতে হবে শুধু হুকুম করেন".

হেড অফ অপারেশন বললেন, "বেশি কিছু না, কেবল এই ২ কোটি টাকার কোম্পানিকে ৪০ কোটি টাকা ভ্যালুয়েশন করে দেখাতে হবে".

অডিট ফার্ম বললো, " কোনো সমস্যা নাই, তবে বস এবার কিন্তু একটু বাড়িয়ে দিতে হবে, স্টাফদের স্যালারি দিয়ে মাস শেষে লোকসান হচ্ছে, এবার ২ কোটি টাকার

নিচে পারবো না ". শেষ পর্যন্ত নেগোসিয়েশন করে ১ কোটি টাকায় রাজি হলো ২ জন.

এবার হেড অফ অপারেশন সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন চেয়ারম্যান এর পিওনকে ফোন দিল (পিওন ভেবে অর্ডিনারি পিওন ভাবার সুযোগ নাই, এই পিওন বাকি ১০০ টা পিওনের মতো অর্ডিনারি পিওন না , এই পিওন অনেক পাওয়ারফুল). পিওনকে বললো নতুন একটা বিস্কুট কোম্পানি মার্কেটে লিস্টেড করতে হবে, কাজ টা করে দিতে হবে, পিওন বললো, " স্যার কিন্তু এখন ২.২০ কোটি টাকার নিচে কোনো কাজ পাশ করে না, এর নিচে কাজ হবে না, আর জিনিষপাতির দাম বাড়ছে, বউ বাচ্চা নিয়ে না খাওয়ার অবস্থা, মেয়েটার ভাসিটির বেতন বাকি পড়ছে আমার দিক একটু দেইখেন."

হেড অফ অপারেশন বললো, "ওকে ডিল ফাইনাল কাজ করে দেন"

হেড অফ অপারেশন এবার স্টক এক্সচেঞ্জ এর টপ লেভেল এ যোগাযোগ করলো, বলল, " এই বিস্কুট কোম্পানি অপপ্রভ করে দিতে হবে".

স্টক এক্সচেঞ্জ বললো, " ঠিক আছে কিন্তু ২ কোটি টাকা নিব, এর নিচে হবে না"

২ জনে রাজি হলো, ডিল ফাইনাল

এবার ২ কোটি টাকার বিস্কুট কোম্পানিকে ৪০ কোটি টাকা দেখিয়ে আইপিওর জন্য এপলাই করা হলো, ৫০ পারসেন্ট শেয়ার মানে ২০ কোটি টাকার শেয়ার মার্কেট এ ছাড়া হলো, প্রিমিয়াম প্রাইস ৫ টাকা যোগ করে, সো ৩০ কোটি টাকা.

মানে ১ কোটি টাকার অরিজিনাল শেয়ার বিক্রি করে মার্কেট থেকে তোলা হলো ৩০ কোটি টাকা.

এবার আমি আমার কথা মতো ১০ কোটি টাকা সোনালী ব্যাংক এর মার্চেন্ট ব্যাংকের হেড অফ অপারেশনকে বুঝিয়ে দিলাম, আর বাকি টাকা আমার, মানে আমার পকেটে ঢুকলো ২০ কোটি টাকা.

হেড অফ অপারেশন স্টক এক্সচেঞ্জকে ২ কোটি টাকা দিলো, আর স্টক এক্সচেঞ্জ এ যারা আছে তারা এই ২ কোটি টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিলো, অডিট ফর্মকে দিলো আরো ১ কোটি টাকা, আর বাকি টাকা সোনালী ব্যাংক এর কমিশন হিসাবে নিলো, নিজের জন্য বাকি টাকা.

আর ২.২০ কোটি টাকা দিলো সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর চেয়ারম্যান এর পিওনকে, সাথে পিওনের মেয়ের ভাসিটির বকেয়া বেতন বাবদ দিলে আরো ১০ লক্ষ টাকা

পিওন তার স্যারকে বলল, " স্যার দুনিয়ায় এখন আর মানুষ নাই, সব অমানুষ হয়ে গেছে, আমাকে বলছিলো ২ কোটি টাকা দিবে কিন্তু ২০ লক্ষ টাকা কম দিছে, আমারে বলছিলো কিছু টাকা দিবে, একটা টাকাও দিলো না স্যার". সে তার স্যারকে ১.৮০ কোটি টাকা দিলো, স্যার পিওনকে ২ লক্ষ টাকা দিয়ে নিজের কাছে ১ কোটি টাকা রেখে বাকি টাকা কয়েকটা খামে ভরে তার কলিগদেরকে পাঠিয়ে দিলো

এইটুকু পর্যন্ত অনিয়ম আর কারসাজির প্রথম স্টেজ শেষ,

এবার দ্বিতীয় স্টেজ,

ABC Limited মার্কেট এ লিস্টেড হলো আর আইপিও প্রাইস হলো ১৫ টাকা.

ট্রেড শুরু হলো, এক একটা ১৫ টাকার শেয়ার পাবলিক ৫০ টাকা করে বাই করলো, আমার তো মাথা খারাপ, আমার বাকি অরিজিনাল ১ কোটি টাকার শেয়ার এর মার্কেট ভ্যালু ১০০ কোটি টাকা !!! আর অলরেডি তো ২০ কোটি টাকা পকেটে ঢুকাইছি, এবার আমি আমার বাকি ৫০ পার্সেন্ট শেয়ার ও বিক্রি করা শুরু করলাম, কিন্তু এতো শেয়ার বিক্রি করবো, পাবলিক তো থাকবে না, তাই একাউন্টেন্টকে বললাম, " লাস্ট ৩ মাসের আর্নিং দেখাও ২.৪০ কোটি টাকা লাভ".

একাউন্টেন্ট বললো, " স্যার, সারা বছর কোম্পানি লাভ করে ১.২০ কোটি টাকা, আর ৩ মাসে কিভাবে ২.৪০ কোটি টাকা লাভ দেখাবো?".

আমি জবাব দিলাম, " টাকা ইউনিভার্সিটি থেকে কি নকল করে পাশ করছো? ৩ মাসের লাভ দেখাবা ২.৪০ কোটি টাকা, এরপরের ৯ মাসের আর্নিং এ ১.২০ কোটি টাকা লস দেখিয়ে এডজাস্ট করে দিবা,সোজা হিসাব."

মাত্র ১ পিস্ শেয়ার মানে ১০ টাকার একটা শেয়ার কেবল নিজের কাছে রাখলাম, আর বাকি সব শেয়ার বিক্রি করে দিলাম, নিজের পকেট এ ঢুকলাম আরো ১০০ কোটি.

পার্লিকের থেকে খাওয়ার আর কিছু নাই,

এবার কোম্পানি ফোকাস করা শুরু করলাম,

ABC Limited প্রতি বছর ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা প্রফিট করছে.

আমি কোম্পানির এম.ডি. হিসাবে নিজের স্যালারী/রেমুনারেশন ধরলাম ৪০ লক্ষ টাকা, বৌ কে বানালাম চেয়ারম্যান, বউ এর স্যালারী/রেমুনারেশন ধরলাম ৫০ লক্ষ টাকা, ছেলে মেয়ে ২ টা আছে, ২ টা কে আরো ২ টা পোস্ট দিয়ে ওদের স্যালারী/রেমুনারেশন ধরলাম ১০ লক্ষ্য টাকা, টোটাল ১ কোটি টাকা আমার ফ্যামিলি স্যালারী/রেমুনারেশন বাবদই নেয়া শুরু করলাম, **ABC** বিস্কুট কোম্পানির আরো ২০ লক্ষ টাকা লাভ বাকি আছে, এইটা কিভাবে নেয়া যায়!!

কোম্পানির জন্য কষ্ট করতেছি কোম্পানি আমাকে বাড়ি ভাড়া দিবে না? নিজের বাড়িতে থাকি তো কি হইসে!! অন্য কোথাও থাকলে তো ভাড়া দিতে হতো, কোম্পানি থেকে বছরে ১০ লক্ষ টাকা বাড়ি ভাড়া বাবদ চার্জ করলাম, অফিস এ কষ্ট করে আসতেছি আমার ড্রাইভার কত কষ্ট করে গাড়ি চালায় ওর একটা বেতন আছে না? ড্রাইভার এর বেতন ৫ লক্ষ টাকা, গাড়ির তেল খরচ আরো হাবি জাবি খরচ কে দিবে!! ঐটাও আরো ৫ লক্ষ্য টাকা, বাসায় থাকলেই হবে!! খাওয়া দাওয়া করতে হবে না!! বাজার খরচ, কাজের বুয়ার বেতন গ্যাস বিল পানির বিল, ইলেকট্রিসিটি বিল কে দিবে!! ঐটাও আরো ৫ লক্ষ্য টাকা

এলাকার ছেলেরা ফুটবল টুর্নামেন্ট এর আয়োজন করছে, আমি প্রধান অতিথি,
 ওখানে টাকা চাঁদা দিতে হবে না!! শুধু টাকা কামালে হবে!! সমাজের প্রতি
 আমাদের একটা দায়িত্ব আছে না? সোশ্যাল ওয়ার্ক বাবদ আরো ৫ লক্ষ টাকা.

বউ বল্ল গাড়ি পুরানো হয়ে গেছে, এই গাড়িতে হবেনা নিউ মডেলের গাড়ি লাগবে,
 গাড়ি কিনে দিবো বৌ কে, কোম্পানির ব্যাংক এর রিজার্ভ এর টাকা দিয়ে গাড়ি কিনে
 দিলাম আর বাকি টাকা কোম্পানির নামে লোন, বিল করলাম কোম্পানির স্টাফদের
 ট্রান্সপোর্টেশন বাবদ বরাদ্দ, বাসার ফার্নিচার গুলা পুরানো হয়ে গেছে, নতুন ফার্নিচার
 দরকার, কোম্পানি থেকে টাকা নিয়ে বাসার ফার্নিচার কিনলাম, বিল করলাম অফিস
 এর সৌন্দর্য বর্ধন বাবদ বরাদ্দ, এমনকি নিজের ব্যবহার করা আন্ডার-গার্মেন্ট এর টাকা
 টাও পর্যন্ত কোম্পানি থেকে বিল করে নেই,

আমাদের স্যালারি নেয়ার পর খরচ দাঁড়ালো আরো ৮০ লক্ষ টাকা,

ABC Limited বছরে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা প্রফিট করছে,

কিন্তু খরচ ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা মানে কোম্পানির উল্টো লোকসান ৬০ লক্ষ টাকা,

দ্বিতীয় স্টেজ শেষ,

এবার তৃতীয় স্টেজ,

স্টক এক্সচেঞ্জকে কেন মাসে মাসে ফি দিবো!! ধুর ফি দিবো না, যা পারে করুক, ৬ মাস পর স্টক এক্সচেঞ্জ **ABC Limited** কে ডিলিস্টেড করে দিলো, এবার আমি দেখলাম আগের মতো আর বিস্কুট ও বিক্রি হয় না, প্রফিট খুব কম, এক কাজ করি ২ কোটি টাকার কোম্পানি এইটা দেখি বিক্রি করতে পারি কিনা ১.৫ কোটি টাকায়,

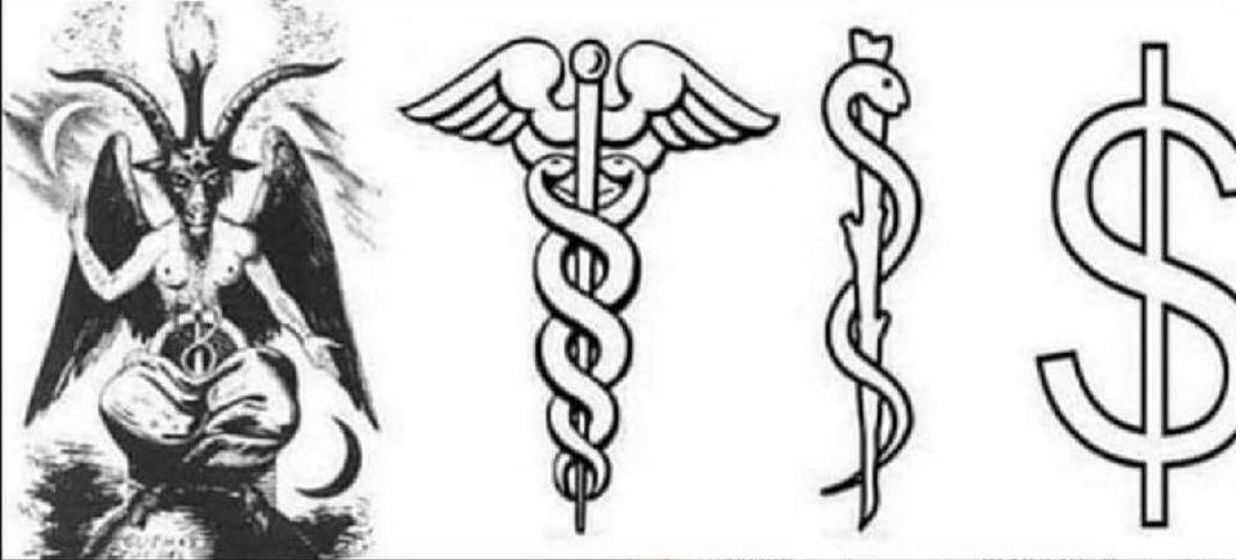
ABC Limited কে বিক্রি করতে যাবো, কোম্পানির ম্যানেজার বললো," স্যার আপনার কাছে তো কোনো শেয়ার নাই, সব তো আপনি পাব্লিককেই বিক্রি করে দিছেন, তাহলে আপনি কোম্পানি বিক্রি করবেন কিভাবে? আর ব্যাংক ও তো আপনার কাছে ১ কোটি টাকা পায়" .

আমি জবাব দিলাম, " আরে ধুর এইটা বাংলাদেশ, ওই ১ কোটি টাকা ব্যাংককে আজীবন বাকির খাতায় লিখে রাখতে বল".

"আর পাবলিক !!পাবলিক কোর্ট এ দৌড়াবে, রায় আসতে আসতে ওদের নাতি-পুতিও দুনিয়া থেকে চলে যাবে, বুঝ নাই ব্যাপারটা??"

অধ্যায়-৩: (স্বাস্থ ও চিকিৎসা)

Baphomet = Pharmakia = Witchcraft = Evil



Picture Clear
for those with minds that think!
Don't be afraid to research

tradition...
opposed to Sadducee. 2. [p-], a pharisaic person.
Pharm., 1. pharmaceutical. 2. pharmacopoeia. 3.
pharmacy.
phar-ma-ceu-tic (fär'mə-sōō'tik, fär'mə-sū'tik), adj.
pharmaceutical
phar-ma-ceu-ti-cal (fär'mə-sōō'ti-k'l, fär'mə-sū'ti-k'l)
adj. [LL. *pharmaceuticus*; Gr. *pharmakeutikos* < *phar*
makeuein, to practice witchcraft, use medicine
pharmakon, a poison, medicine], 1. of pharmacy
pharmacists. 2. of or by drugs: as, *pharmaceutical cure*.
Abbreviated Phar., Pharm.
phar-ma-ceu-tics (fär'mə-sōō'tiks, fär'mə-sū'tiks)
npl. (construed as sing.). [*< LL.* *pharmacy* (sense 1)
phar-ma-ceu-tist (fär'mə-sōō'tist, fär'mə-sū'tist), n.
pharmacist.
phar-ma-cist (fär'mə-sist), n. a person licensed

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান দাজ্জালের ফেতনা থেকে মুক্ত নয়।

মানব সেবার নামে প্রতিদিন মানুষকে হারাম পথে নিয়ে যাচ্ছে, কথিত মেডিক্যাল সংস্থাগুলো।

মানুষও অন্ধের মতো জীবন বাঁচানোর তাগিদে আল্লাহর বিধানের প্রতি সীমালংঘন করে যাচ্ছে।

ব্লাড ব্যাংক, হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক, টেস্ট টিউব, সিজার, অঙ্গদান (চক্ষু, হার্ড, স্কিন ইত্যাদি), টিকার নামে প্রহসন ইত্যাদি।



দীর্ঘ চৌদ্দশত বছর যাবৎ মানুষ যেগুলোকে হারাম জানতো, চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির নাম করে সে গুলোকে আজ মানুষ হালাল হিসেবে জানে।

একান্ত নিরুপায় হলে জীবন বাঁচানোর তাগিদে যদি বিকল্প কোন রাস্তা না থাকে তখন হারাম বস্তু ভক্ষণ করা বৈধ। এটাতো তখনকার সময় যখন বিকল্প কোন রাস্তা থাকবে না। ঠিক ততটুকুই খাবে যতটুকু খেলে ওই মুহূর্ত কালীন সময় বেচে যাবে, তারপর সে বিকল্প খাদ্যের অনুসন্ধান করবে।

হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ইরশাদ করেছেন,
'ঐ দেহ জাম্বাতে যাবে না, যা হারাম (খাবার) থেকে
উৎপন্ন। জাহান্নামই এর উপযোগী।' (সহিহ ইবনে
হিব্বান, হাদিস নম্বর : ১৭২৩, তিরমিযি, হাদিস
নম্বর : ৬১৪)।

যে কোন খাবার খেলে তার ১৫ মিনিট পর থেকে শক্তি দেয়া শুরু করে দেহে, রক্ত
ঠিকঠিক উপস্থান, খাবার খেলে দেহের সব কোষ এই উপস্থান জল খাবার হতে নিজে শুরু
করে দেহ শরীর সাথে পোষিত কলিক, পোষিত কলিকা সহ সব উপস্থান ঠিকঠাক করে তুল
অবস্থি মজ্জা হতে।
অবস্থি হারাম উপস্থানের খাবার ১ দিনের ভিতর ই আগুন লাগে দেহ জাম্বাত অনুপযোগী।

রোগ যেমন বাড়ছে,
প্রতিষেধকও তৈরি হচ্ছে
সমানভাবে। বর্তমানে
এমন কিছু চিকিৎসা ও
ডাক্তারি পরীক্ষা আবিষ্কৃত
হয়েছে, যার কোনোটি
ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েজ,
কোনোটি নাজায়েজ।

পরিমাণের চেয়ে বেশি খেলেও সেটা হারাম হবে।

অনুসন্ধান না চালিয়ে বসে বসে হারাম খেলে সেটাও হারাম হবে।

R:M: এই লিখাটা একজন আলেমের টাইমলাইন থেকে নিয়েছি। অনেকেই হয়তো
এটুকু পড়েই ঘাবড়ে গেছেন। এই পুরো অধ্যায় পড়লে আরো বেশি আশ্চর্য হবেন।

তবে পাশাপাশি সমাধানও দেয়া হয়েছে। সুতরাং ঘাবড়ানোর কিছু নেই। বিসমিল্লাহ বলে, মনোযোগ দিয়ে পড়া শুরু করুন।

Sorcery is pharmakeia



মেডিকেল ও বানিজ্যে কাডুসিয়াস:

যখন বলি আমাদের সমাজ ব্যবস্থার রক্তে রক্তে কুফরের ছাপ রয়েছে। তখন বিষয়টি কেউ তেমন আমলে নেয় না। আমরা সত্যিই ব্যাপার গুলোকে গুরুত্বের সাথে নেই না। আজ আসুন একটা অস্বস্তিকর বিষয় বলব। ছবিটি বা প্রতিকটিকে বলা হয়

"কাডুসিয়াস", যা হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের মেইনস্ট্রিম মেডিকেল ও বানিজ্যের সিম্বল। এ প্রতীকটি নেওয়া হয়েছে গ্রীক পৌত্তলিক দেবতা হার্মিস ট্রিস্মেজিস্টাসের থেকে। হার্মিসের এক হাতে এই সিম্বল আছে। অন্য হাতে মার্ক্যারি গ্রহ। হেরমেটিক কাডুসিয়াস এস্ট্রলজির বেসিক ভিত্তিগত বিষয়কে রিপ্রেজেন্ট করে। সেই সাথে আলকেমির তাৎপর্যও বহন করে।



আমরা ইতোমধ্যে জানি যে____রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি জ্যোতিষ বিদ্যার কিছু অংশ শিক্ষা করল, সে আসলে যাদু বিদ্যার একটি অংশ শিক্ষা করল। বিধায় জ্যোতিষ বিদ্যা যত বেশী পরিমাণে শিক্ষা করবে, অত বেশী পরিমাণে তার যাদু বিদ্যা বেড়ে যাবে”

[আবু দাউদ বিশুদ্ধ সূত্রে] [1]

[1] আবু দাউদ ৩৯০৫, ইবনু মাজাহ ৩৭২৬, আহমাদ ২০০১, ২৮৩৬
হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

আর ওই গ্রীক প্যাগান দেবতা হার্মিস হচ্ছে জুয়া, চুরি, মিথ্যাবাদী এবং ব্যবসায়ীদের দেবতা। হার্মিসের আগে এ সিম্বল ঈসা(আ) এর জন্মের ৩০০০ বছর আগের মেসোপটেমীয় এক দেবতার সিম্বল হিসেবে পাওয়া যায়। আরেকটু ভেতরে যাই...। সার্পেন্ট সিম্বল দ্বারা খ্রিষ্টানরা শয়তানকে নির্দেশ করে আর ওদের বিকৃত কিতাবে এরূপ বর্ণনাও আছে। চলুন এ সিম্বল কাদের তার আদ্যোপান্ত একবারেই বুঝে নি। একটু কষ্ট করে নিজেই ঘুরে আসুন

— <https://m.facebook.com/1705167179758575/photos/a.1710670349208258.1073741826.1705167179758575/1714272982181328/?type=3&source=45&refid=17>

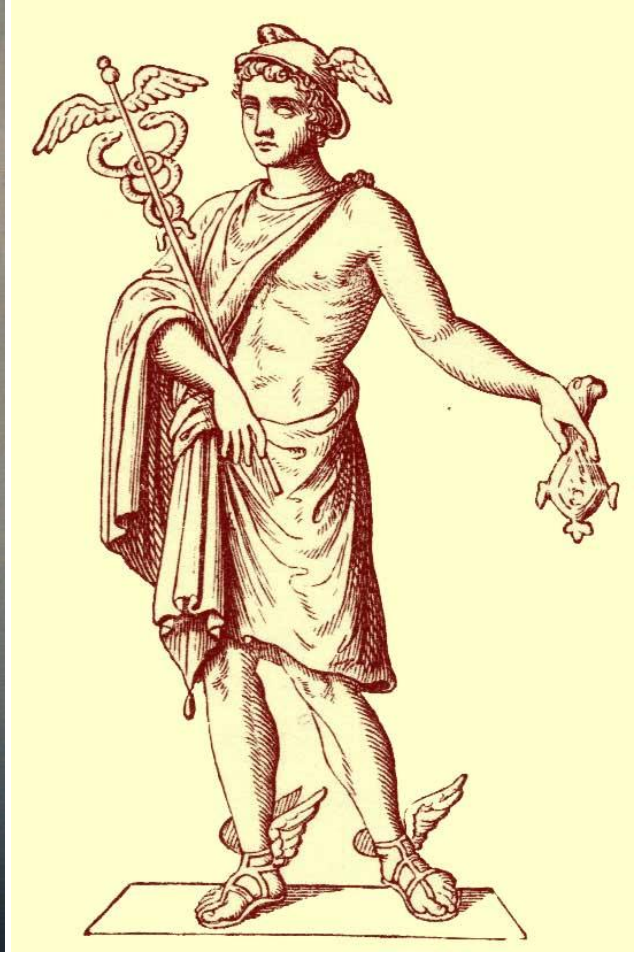
আশা করি শয়তানী চিকিৎসা বিজ্ঞান আর সুদি বানিজ্যিক সিস্টেমকে ধরতে পেরেছেন।(আংশিক তথ্যসূত্রঃ উইকিপিডিয়া)

চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রতীক হিসেবে সাপ ও লাঠি: গ্রীক মিথলজি!

আমরা বিভিন্ন হসপিটাল, এ্যাম্বুলেন্স কিংবা চিকিৎসা সেবা দেয়া হয় এমন জায়গায় নীচের প্রতীক গুলো প্রায় দেখি। কিন্তু দূর থেকে এসব প্রতীককে অনেকেই ডাক্তারদের ব্যবহৃত স্টেথোস্কোপ ভেবে ভুল করেন। মজার ব্যাপার হল এটি স্টেথোস্কোপ তো নয়ই বরং অনেকের জন্য তাদের সবচেয়ে ভয় পাওয়া সরিসূপ সাপ। আজ আমরা জানব কিভাবে চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রতীক হিসেবে সাপ ও লাঠি আসলো!

ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে একটি ছবি ছাড়া সব ছবির প্রতীকে সাপ ব্যবহার করা হয়েছে। একে একে পর্যায়ক্রমে সবগুলো প্রতীক এবং এর অর্থ, ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করব আমরা।

(CADUCEUS) ক্যাডুসিয়াসঃ



ক্যাডুসিয়াস গ্রীক দেবতা হার্মিসের প্রতীক।

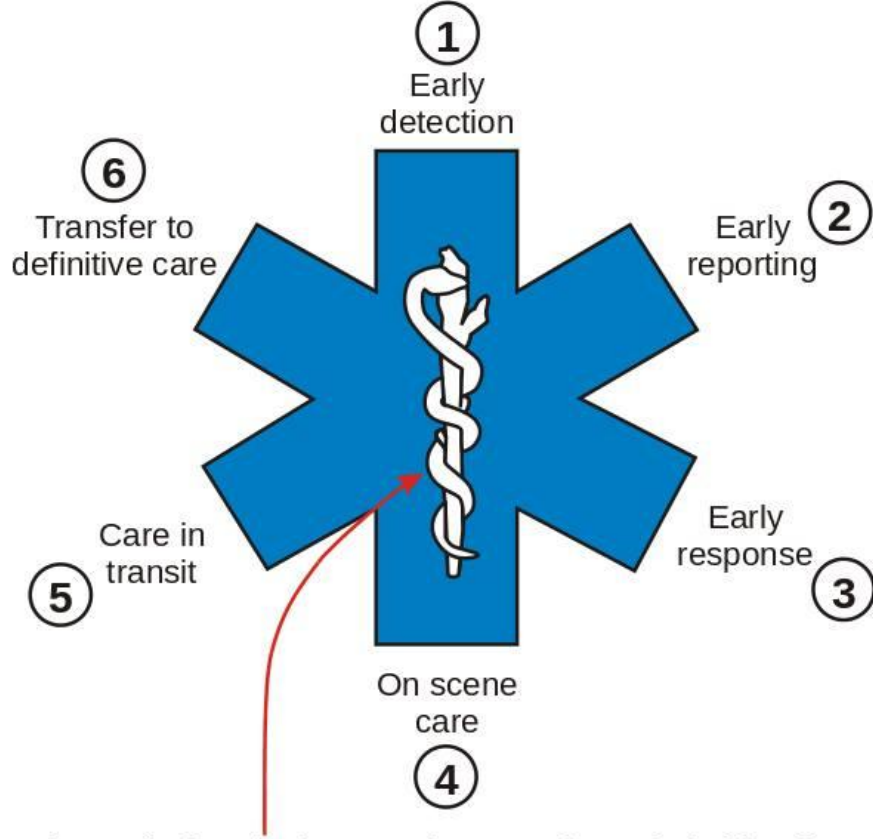
এটি নিয়ে একটু বলা যাক। গ্রীক মিথলজি অনুসারে দেবতা জিউসের ছেলেদের মধ্যে একজন ছিলেন হার্মিস। হার্মিস নিজেও দেবতা ছিলেন। হার্মিসের প্রতীক ছিল একটি উড়ন্ত লাঠির মত বস্তু, যাকে দুটি সাপ পৌঁচিয়ে আছে। ঠিক উপরের চিত্রের প্রথম

ছবিটির মত। এটি দিয়ে ব্যবসা, বাগপটুতা, আলাপ-আলোচনা, মধ্যযুগীয় রসায়ন শাস্ত্র আলকেমি এবং জ্ঞান এই সকল জিনিসের মাঝে সম্পর্ক বোঝানো হত। হার্মিস ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন বার্তাবাহক। যিনি দেবতা এবং মানুষের মাঝে বার্তা বহন করতেন।

শুরু থেকেই হার্মিসের এই দুই সাপ ওয়ালা লাঠি চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতীক হিসেবে প্রচলিত ছিলনা। কারণ দেবতা হার্মিস কখনো চিকিৎসা শাস্ত্রের সাথে কোনোভাবে সম্পর্কিত ছিলেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে আমেরিকা তে প্রথম এই প্রতীক কে চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়। আর এই প্রতীক জনপ্রিয় হয় আমেরিকান মেডিকেল কোর এর কারণে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আমেরিকান মেডিকেল কোরে একটি লোগো ব্যবহারের দরকার পড়ে। তখন এর দায়িত্বে যিনি ছিলেন তিনি

ভুলে **ক্যাডুসিয়াস(Caduceus)** কে চিকিৎসা শাস্ত্রের সাথে সম্পর্কিত মনে করেন এবং এটিই লোগো হিসেবে ব্যবহার করেন। কারণ Rod Of Asclepius আর ক্যাডুসিয়াস(Caduceus) এর মাঝে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে যান। **Rod Of Asclepius** নিয়ে লিখার শেষের দিকে বলা আছে।



The Rod of Asclepius - Ancient Greek symbol of healing

পরে ক্যাডুসিয়াস(Caduceus) দেখতে বেশী আকর্ষণীয় হওয়ায় চিকিৎসার প্রতীক হিসেবে এটি অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠে। সামান্য একটি ভুলের কারণে এই প্রতীক ব্যবহার শুরু হয় এবং জনপ্রিয়তার কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় একসময়।

OPTOMETRY বা চক্ষু চিকিৎসাঃ

এই প্রতীক দিয়ে চক্ষু চিকিৎসা সম্পর্কিত সব বোঝানো হয়। যেমন, চোখ পরীক্ষা, প্রয়োজনমত লেন্স প্রেসক্রাইব করা ইত্যাদি। এই প্রতীকটি মূলত

একটি ক্যাডুসিয়াস(Caduceus) প্রতীক-ই। তবে পার্থক্য হল এতে উপরের দিকে একজোড়া চোখ আছে যাতে বোঝা যায় এটি কিসের সাথে সম্পর্কিত।

VETERINARY বা পশু চিকিৎসাঃ

এটি দিয়ে পশু চিকিৎসার প্রতীক বোঝানো হয়। [আমেরিকান ভেটেরিনারি মেডিকেল এসোসিয়েশন\(AVMA\)](#) ১৯৭১ সালে আগের প্রতীক পরিবর্তন করে উক্ত প্রতীক নির্ধারণ করে। এই প্রতীকে **Rod Of Asclepius** ব্যবহার করা হয় যেখানে সামনে ভেটেরিনারি চিকিৎসা বোঝাতে বড় অক্ষরের একটি "V" রয়েছে।

DENTISTRY বা দন্ত চিকিৎসাঃ

এটি দন্ত চিকিৎসার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই প্রতীকে ক্যাডুসিয়াস(Caduceus) এর উপর নিচের ছবির মত আরেকটি প্রতীক রয়েছে।

সেই প্রতীক এর মাঝখানে **Rod Of Asclepius** এবং দুইপাশে ১৬ টি করে মোট ৩২ টি পাতা রয়েছে। যা আমাদের দাঁতের সংখ্যা নির্দেশ করে। দুই পাশেই পাতার মাঝে ছোট ছোট ২০ টি জামের মত ফল রয়েছে যা আমাদের দুধ দাঁত এর সংখ্যা বোঝায়। উপরের ছবিটি তে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সেটা।

আর বাহিরে ত্রিভুজ আকৃতির যে চিহ্ন টি রয়েছে এটি মূলত ডেলটা (Δ)। গ্রীক ভাষায় ডেলটা মানে "D" যা দিয়ে "Dentistry" বুঝায়। আর গ্রীক ভাষায় O(omicron) দিয়ে বুঝায় "odont" যার অর্থ দাঁত।

CHIROPRACTIC বা অভ্যন্তরীণ গঠন চিকিৎসাঃ

এতে আমাদের বিভিন্ন জয়েন্ট এবং বিশেষ করে মেরুদণ্ডের চিকিৎসা বোঝায়। বিশেষ করে যখন বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা পেশী কিংবা স্নায়বিক কারণে আমাদের মেরুদণ্ড কিংবা কোন জয়েন্ট এ কোন সমস্যা দেখা দেয়।

Caduceus



Optometry



Veterinary



Dentistry



Chiropractic



Symbol of Life



Asclepius



(SYMBOL OF LIFE)সিম্বল অফ লাইফঃ

এটি [স্টার অফ লাইফে\(Star of Life\)](#) নামেও পরিচিত।

এই প্রতীক টি আমরা অনেক জায়গায় ই দেখে থাকি। যেমন, হাসপিটাল রিলেটেড কোনো ইউনিফর্ম, এম্বুলেন্স, চিকিৎসা বিষয়ক ওয়েবসাইট ইত্যাদি জায়গায়। এমনকি অনেক লিফটের সামনে ও এই চিহ্ন দেখা যায়। লিফটের সামনে এই প্রতীক থাকার অর্থ হলে উক্ত লিফটে রোগীর জন্য ২৪ ইঞ্চি*৮৪ ইঞ্চির স্ট্রেচার ও ঢুকানো যাবে।

এই প্রতীক টি ডিজাইন করেছিলো আমেরিকার [National Highway Traffic Safety Administration](#) (NHTSA)। আমেরিকায় এই প্রতীক ব্যবহার করা হয় যে কোনো এম্বুলেন্স সহ, চিকিৎসা সহকারী কিংবা জরুরি চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত কর্মীবৃন্দের প্রমাণ হিসেবে। এছাড়া আন্তর্জাতিকভাবে এটি দিয়ে জরুরি চিকিৎসা সেবা ([emergency medical services](#)) বোঝানো হয়।

সিম্বল অফ লাইফ এর ৬ টা বাহু দিয়ে উদ্ধারকর্মীদের ৬ টা কাজ বোঝানো হয়ঃ

Detection বা সনাক্তকরণঃ এটি দিয়ে বোঝানো হয় উদ্ধারকর্মী প্রথমে কোনো ঘটনা পর্যবেক্ষণ করবে, সমস্যা বোঝার চেষ্টা করবে, বিপদের মাত্রা সনাক্ত করার চেষ্টা করবে এবং আক্রান্ত ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

Reporting বা বিবৃতি দেয়াঃ পেশাদার ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করা হবে এবং জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে দ্রুত প্রেরণ করা হবে।

Response বা প্রতিক্রিয়াঃ এই ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি প্রথমে যে ব্যক্তির সংস্পর্শে আসবে উক্ত ব্যক্তি তাকে প্রাথমিক চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করবে।

On scene care বা তাৎক্ষণিক সেবাঃ জরুরি চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি পৌঁছানোর সাথে সাথে তাদের সাধ্য অনুসারে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করবে।

care in transit বা পরিবহন সময়কালীন সেবাঃ জরুরি চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি আক্রান্ত ব্যক্তিকে হাসপাতালে প্রেরণ করবে। কোনো এম্বুলেন্স

কিংবা হেলিকপ্টার বা কোনো বিশেষ ব্যবস্থায় আক্রান্ত রোগীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। এবং উক্ত পরিবহন সময়ে রোগীকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করবে।

Transfer to definitive care বা চূড়ান্ত সেবা প্রদান কেন্দ্রে

স্থানান্তরঃ হাসপাতালে প্রয়োজনীয় বিশেষ সেবা প্রদান করা হবে।

ROD OF ASCLEPIUS বা এসক্লেপিয়াস এর লাঠি ঃ

এসক্লেপিয়াস এর পরিচিতিঃ



এটি "এসক্লেপিয়াস এর লাঠি" বা Rod Of Asclepius নামে পরিচিত। গ্রীক মিথলজির আরেক দেবতা এসক্লেপিয়াস এর প্রতীক এটি। এসক্লেপিয়াস ছিলেন দেবতা এপোলোর ছেলো। এপোলো ছিলেন দেবতা জিউস এর ছেলো। এসক্লেপিয়াস এর আরেকটা পরিচয় হল, গ্রীক মিথলজি অনুসারে এসক্লেপিয়াস হল পৃথিবীর প্রথম পেট কেটে বের করা বাচ্চা। যা এখন সিজারিয়ান নামে পরিচিত। এসক্লেপিয়াস এর

মায়ের নাম ছিল করনিস(**Coronis**)। এসক্লেপিয়াস পেটে থাকা অবস্থায় করনিস অন্য এক পুরুষের প্রেমে পড়ে। দেবতা এপোলো যখন এটি শুনে, তিনি রাগান্বিত হয়ে পড়েন এবং করনিস কে আগুনে নিক্ষেপ করে হত্যা করেন। আগুনে যখন করনিস এর শরীর জ্বলে যাচ্ছিল তখন এপোলো এর মাথায় করনিস এর পেটে তাদের সন্তানের কথা আসে। তার তো কোনো দোষ ছিলনা। তাই দ্রুত তিনি হার্মিস এর সাহায্যে করনিস এর পেট কেটে এসক্লেপিয়াস কে বের করে আনেন।

এসক্লেপিয়াস কে রোগ সারানোর দেবতা বলা হয়। তিনি তার পিতা এপোলো এর কাছে থেকে মানুষকে সুস্থ করা শিখেছিলেন। একসময় তিনি বিভিন্ন শল্য চিকিৎসা এবং বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োগেও অনেক দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। গ্রীক মিথলজির অনুসারে তাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ও বলা হয়। প্রাচীন গ্রীসের

যে শহরে(Epidaurus) তিনি জন্মেছিলেন সেখানে এক পবিত্র জায়গা তার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

বিশ্বাস করা হয় তিনি মৃতকেও জীবিত করতে পারতেন। গ্রীক মিথলজি অনুসারে জিউস একসময় চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন তার এই ক্ষমতা নিয়ে। তার মনে হচ্ছিল এসক্লেপিয়াস এই ক্ষমতা দিয়ে মানবজাতিকে অমর করে ফেলবে। তাই তিনি এক বজ্রপাত দিয়ে এসক্লেপিয়াস কে মেরে ফেলেন।

এসক্লেপিয়াস এর লাঠি ঃ

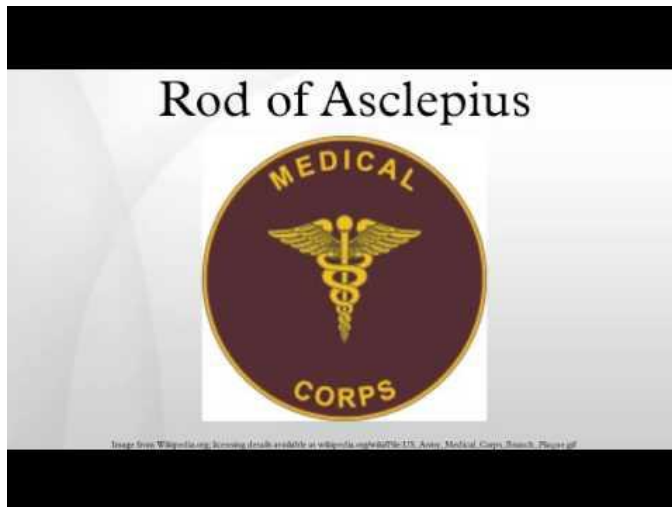
এসক্লেপিয়াস সাথে সবসময় একটি লাঠি থাকত। এবং তাতে পঁচানো অবস্থায় একটি সাপ থাকত। সেই সময় সাপের কামড় কে সবচেয়ে ভয়াবহ রোগ মনে করা হত। সাপে কামড় দিলে আর বাঁচার কোনো উপায় নেই। তাই সবাই ভাবত এসক্লেপিয়াস এর লাঠি দিয়ে সাহায্যে সব রোগ সারিয়ে তোলা যাবে।

এসক্লেপিয়াস মারা যাওয়ার পর তার ভক্তরা তাকে মনে রেখে অনেক মন্দির তৈরি করেছিল। এবং সেসব মন্দিরে চিকিৎসা সেবা দেয়া হত। সেসব মন্দিরেও অনেক সাপ থাকত। যদিও সেসব সাপ বিষাক্ত ছিলনা।



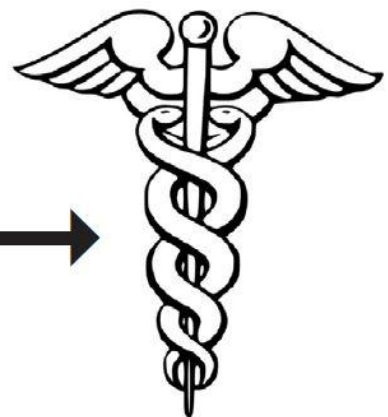
কথিত আছে সেসব মন্দিরে যখন বিভিন্ন রোগী রোগমুক্তির আশায় আসতেন রাতে তারা মন্দিরের মেঝেতে ঘুমাতে। সেই মেঝেতে সেইসব অবিষাক্ত সাপ ও থাকত। রাতে রোগীরা এসক্লেপিয়াস কে স্বপ্নে দেখতেন। তারা দেখতেন এসক্লেপিয়াস তাদের কিভাবে রোগমুক্তি হবে তা বলছেন। ঘুম থেকে উঠে তারা সেটা মন্দিরের দায়িত্বে থাকা লোকজনদের বলতেন। তখন তারা উক্ত রোগীর জন্য স্বপ্ন অনুযায়ী চিকিৎসা ব্যবস্থা নিতেন।

এসক্লেপিয়াস এর এই লাঠিই এখন আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশান সহ আরো অনেক মেডিকেল সোসাইটির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে অনেকে এসক্লেপিয়াস এর প্রতীক কে ক্যাডুসিয়াস এর সাথে গুলিয়ে ফেলেন। এসক্লেপিয়াস এর প্রতীকে ছিল একটি সাপ আর ক্যাডুসিয়াসে ছিল দুটি সাপ।



রেফারেন্সঃ

1. <http://01greekmythology.blogspot.com/2014/02/coronis.html>
2. <http://www.dynamicchiropractic.com/mpacms/dc/article.php...>

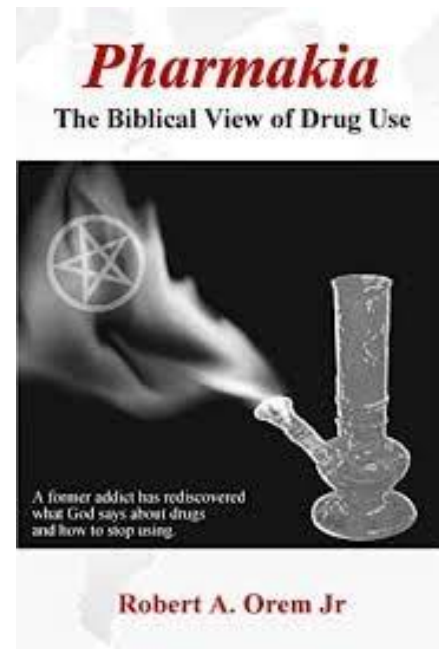
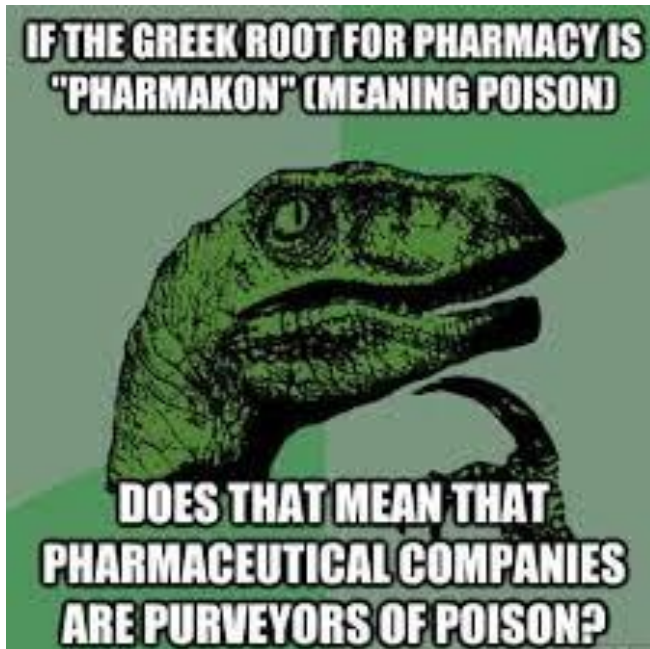


RM: উপরোক্ত আটিকেল দুটোতে আরো কিছু বিষয় আসেনি। যেমন: এই সিন্ধলটি শয়তানের প্রতীকী মূর্তি বাফোমেটের পেটেও আছে। আর তাছাড়া আমরা জানি সাপ হচ্ছে জিনদের প্রতীক এবং শয়তানের বাহন। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে বর্তমানের আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ফিরে গেছে অকাল্ট আলকেমির দিকে। যেখানে শয়তানের পূজা করে অনেক নতুন নতুন তত্ত্ব পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে আমরা কোন চিকিৎসার শরণাপন্ন হবো? আমরা সুনতি চিকিৎসা করবো। যেমন হিজামা (সিঙ্গা), রুকিয়া, ও তিব্ব নববী। এছাড়া আপনি যখন পরিপূর্ণ রূপে সুনতনের উপর থাকবেন, তখন আপনার এমন কোনো রোগ হবেনা, ইনশাআল্লাহ। যেটার জন্য আপনাকে এইসব অপচিকিৎসকদের কাছে যেতে হবে।

আধুনিক মেডিকেল সাইন্স নাকি উইচক্রাফট(জাদু)? চিত্র:

বর্তমানের চিকিৎসা বিজ্ঞান নামক অপবিজ্ঞানটি যে পুরো পুরি কালো জাদু চর্চার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা আপনারা নিচের ছবিগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন।





এই ভিডিও গুলোও দেখতে পারেন। এছাড়া আপনারা নিজেরাও গবেষণা করে দেখতে পারেন।

How Rockefeller founded Modern Medicine and killed Natural Cures -

<https://www.youtube.com/watch?v=ay6vZ1x361A>

How John D Rockefeller Medicine killed Natural Cures and Alternative Medicine / Herbal Medicines

<https://www.youtube.com/watch?v=C0GCAXu5z>

[YA](#)

কী খাচ্ছি, ট্যাবলেট নাকি জাদুমন্ত্র? (চিত্র):

আমরা ট্যাবলেটের নাম যা খাচ্ছি, আদৌ কি তা উপকারী কোনো জিনিস বা ঔষধ? নাকি জাদুমন্ত্রে ভরা আরো বেশি অসুস্থ করার জাদুকরী এক উপাদান?

যা খাওয়ার দ্বারা আমরা আপাতত সুস্থ হচ্ছি ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতার বেড়া জালে আটকে যাচ্ছি। অর্থাৎ পূর্ণ সুস্থতা পাচ্ছি না। এর মাধ্যমে সাতানিস্টরা একে তো ব্যবসা করছে। তার উপরে আমাদেরকে অসুস্থ বানিয়ে রেখে সারা জীবন চিকিৎসার

পিছনে লাগিয়ে রেখেছে। যেন ওদের এসব ষড়যন্ত্র নিয়ে ভাবার সময়ই না পাই। আর তাছাড়া এসব ঔষধ নামক মন্ত্রের প্রভাবে আমরাও দিন দিন ওদের মতো হয়ে যাচ্ছি। এবং ওদের অনুগামী হচ্ছি।

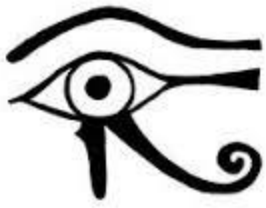
নিচের ছবি গুলো দেখুন। এবং আধুনিক মেডিসিন নামক জিনিসটির উৎপত্তি কোথা থেকে তা বুঝে নিন।



এসব ব্যাপারে আপনারাও গবেষণা করে দেখতে পারেন। আল্লাহর ইচ্ছায়, হয়তো আরো অনেক তথ্য পেয়ে যাবেন। আর এতে আপনার আত্মবিশ্বাসও বাড়বে ইনশাআল্লাহ।

প্রেসক্রিপশনে (দাজ্জালি ব্যবস্থাপত্রে) হোরাস আই বা RX:

বুঝার সুবিধার্থে কয়েকটি ব্লগ থেকে আটকৈল গুলো হুবহু নেয়া হয়েছে। তাই একই কথা কয়েক জায়গায় এসে পড়েছে।



Article-1

ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশনে "Rx" কেন লিখা হয়??

=====

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম!

ইহুদী-খৃষ্টানদের কৌশলী ভেড়ীতে আজ মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতা ব্যাহত হয়ে আছে। মুসলিম আকিদা-বিশ্বাসে কৌশলাশ্রিত হয়ে ইহুদী-খৃষ্ট সাংস্কৃতি ও রীতি অনুপ্রবেশ হয়ে আছে। আত্মভোলা মুসলিম নির্লজ্জের মত না দেখার ভান করে বিধর্মী রীতি-নীতি ও কৃষ্টি-কালচার স্বানন্দে গ্রাহ্য করে আসছে।

আজ ক'দিন থেকে মাথায় ঘোরতর বন বন করছে একটি বিষয় নিয়ে, তা হলো - ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশনে Rx লিখা থাকে কেন এবং এর মূলে কী? বা চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের এব্যাপারে বক্তব্য কী?

একটু ঘাটাঘাটির পর সত্যতা জানতে পেরে মুসলিমদের সজাগঘুম দেখে খুবই কষ্ট লাগছে। একটা কালচার মেনে নিচ্ছি -হয়ত জেনে কিংবা না জেনে -কিন্তু মুসলিম হিসেবে আকীদা নিয়ে অন্তত চিন্তার দরকার ছিল না!!

আসুন! জেনে নেই Rx এর প্রকৃত মূলোৎপাটিত কাহিনী কী??

এ -ব্যাপারে বেশ কয়েকটি মতামত(মূল বক্তব্য এক) পেয়েছি। নিচে সারাংশ তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

→Rx -হচ্ছে ল্যাটিন ভাষার শব্দ। যার অর্থ Recipe বা 'Take ..'অর্থাৎ গ্রহণ করা। Origin of symbol(প্রতীক) অনুযায়ী Rx এর তত্ত্ব হল - প্রাচীন হোরাস দেবতার চোখ " Eye of Horus " যাকে বলা হয়। অথবা জুপিটার দেবতার প্রতীক। আসলে এটার অর্থ এই যে -শুধু ঔষধ নয়, সৃষ্টি কর্তার কৃপার উপরে একজন প্রানীকে ছেড়ে দেওয়া। এই শব্দটা লেখার ধরন ভিন্ন। R বর্ণটার নিচের ডানের বাহুর লম্বা করে তার সাথে ক্রস করে আরও একটা বাহু দেওয়া হয় (ল্যাটিন সিম্বল) এটা দেখতে এককের মত হলেও আসলে এটা একটা প্রতীক।

→Rx হলো -বৃহস্পতি গ্রহের Astrological সাইন। আর বৃহস্পতি গ্রহের নাম ইংরেজিতে Jupiter যা কিনা রোমান দেব মতে দেবতাদের মধ্য রাজা। Rx লিখে এই জন্য যে প্রেসক্রিপশন লিখা পথের উপর যেন রোমান দেবতা Jupiter শুভদৃষ্টিদেয় এবং রোগী আরোগ্য লাভ করে।

→এছাড়া, Medical Dictionary মতে Rx একটি ল্যাটিন শব্দ যা "recipe" ও "to take." এই দুটি কথা বুঝায়।

→Rx বলতে এখানে বুঝানো হচ্ছে, R = Refer to এবং X = Jesus Christ, অর্থাৎ Rx = Refer to Jesus Christ, মানে 'যিশুর নামে পড়া শুরু করুন'। যেমন আমরা বলি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বা মহান আল্লাহর নামে পড়া শুরু করছি, ঠিক সেরকম।

→X শব্দের ব্যাখ্যা:

X দ্বারা জেসাস ক্রাইস্ট বা যিশু খ্রিস্টকে বুঝানো হয়। যেমন Xmas দ্বারা বুঝানো

হয় ক্রিমসাসা উল্লেখ্য, X দ্বারা গ্রিক অক্ষর “Chi”কে নির্দেশ করে, যা দ্বারা গ্রিক ভাষায় সংক্ষেপে ক্রাইস্ট বা যিশুকে বুঝানো হয়ে থাকে।

আসুন! এবার ধর্মীয় মূল্যবোধে একটু চিন্তা করি।

ইতিহাস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, Rx দ্বারা নির্দিষ্ট কোন দেবতাত্মার কৃপায় একজন রোগীকে চিকিৎসা করা। বস্তুত এই আফ্রিদা-বিশ্বাস খৃষ্টান বৈ কারো হওয়ার কথা না।

কিন্তু আফসোসের ব্যাপার! মুসলিম ডাক্তারেরা নির্বিঘ্নতার সাথে এই খৃষ্ট ক্রোশ ব্যবহার করে ঈমানের বারোটা বাজিয়ে আসছেন। কেননা, এখানে মূলত যিশুর নামে পড়া শুরু করা কিং এক আল্লাহ ছাড়া দেবতার কৃপায় রোগীর আরোগ্য কামনা করা অবশ্যই ঈমানহারা হওয়ার কারণ। আর এটা স্মরণ রাখতে হবে -কাফিররা সর্বদা চায় কলা-কৌশলে মুসলমানদের ঈমান নষ্ট করতে।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

১) “তারা এটাই কামনা করে যে, তারা যেরূপ কুফরী করেছে তোমরাও সেইরূপ কুফরী কর, যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও। (সূরা নিসা: ৮৯)

২) “ইহুদী-নাছারা তথা আহলে কিতাবদের মধ্যে অনেকেই প্রতিহিংসাবশতঃ চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদের কোন রকমে কাফির বানিয়ে দিতো” (সূরা বাক্বারা-১০৯)

৩) মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, “ইহুদী-নাছারারা কখনো তোমাদের (মুসলমানদের) প্রতি সন্তুষ্ট হবে না যতোকণ পর্যন্ত তোমরা তাদের ধর্ম গ্রহণ না করবে বা অনুগত না হবো” (সূরা বাক্বারা-১২০)

তাই কোন মুসলমান ডাক্তারের কখনই উচিত হবে না, Rx দিয়ে প্রেসক্রিপশন করা, বরং উচিত হবে ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম’ কিংবা নবীজির নামে দুরুদ

শরীফ দিয়ে শুরু করা। আসুন এ ব্যাপারে আমরা প্রত্যেকে সচেতন হই এবং অন্যকে সচেতন করি।



Article-2

Some historians believe that its origin lies with ancient patients and **doctors** asking for protection from either the **Eye of Horus** or the Roman god Jupiter. Others believe that **Rx** is short for the Latin recipe, which means “to take.” Either way, **Rx** is a universal symbol to indicate a **prescription**.

Article-3

Rx এই কথাটি ল্যাটিন 'recipere' বা 'recipe' এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর মানে to take বা গ্রহণ করা। চিকিৎসক তার ব্যবস্থা পত্রে রোগীকে এটি লিখে ওষুধ গ্রহণের আদেশ দেন।

তবে অনেক তথ্য মতে, রোমান সভ্যতা থেকেই চিকিৎসকরা এটি লেখেন। এই rx ছিল তাদের কাছে মেডিসিনের দেবতা জুপিটারের প্রতীক ছিল। তাই তারা লিখতেন। সেই থেকে লিখবার প্রচলন।

Article-4

Rx comes from the medieval Latin word for “recipe”. The extraneous cross through the leg of the “R” is a mystery to most. It began in Medieval Europe and has continued to be used to this day. Many have come up with ideas involving symbols representing ancient Roman and Egyptian Gods. Great. Whatever. It’s a stretch though.



Article-5

কারো কারো মতে, Rx লেখার অর্থ হলে ডাক্তার এটা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, প্রেসক্রিপশনে যে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে তা আপনার জন্যে সঠিক হতেও পারে আবার নাও হতে পারে।

আরেকটি মত হলঃ

Rx হল বৃহস্পতি গ্রহের Astrological সাইন আর বৃহস্পতি গ্রহের নাম ইংরেজিতে Jupiter যা কিনা রোমান দেব মতে দেবতাদের মধ্য রাজা। Rx লিখে এই জন্যে যে প্রেসক্রিপশন লিখা পথের উপর যেন রোমান দেবতা Jupiter শুভদৃষ্টিদেয় এবং রোগী আরোগ্য লাভ করে।

এছাড়া, Medical Dictionary মতে Rx একটি ল্যাটিন শব্দ যা “recipe” ও “to take.” এই দুটি কথা বুঝায়।

...

তবে যেখান থেকেই উৎপত্তি হোক না কেন এর অর্থ "আপনি গ্রহন করুন" এটা বোঝাতেই বেশীরভাগ ডাক্তাররা লিখে থাকেন।

Article-6

Commonly seen on doctor's prescription pads and signs in pharmacies, Rx is the symbol for a medical prescription. According to most sources, Rx is derived from the Latin word "recipe," meaning "take." Among several alternative theories, however, is the belief that the Rx symbol evolved from the Eye of Horus, an ancient Egyptian symbol associated with healing powers. What is known for certain is that the practice of pharmacy, the preparation and dispensation of drugs, has been around for thousands of years. The world's first recorded prescriptions were etched on a clay tablet in Mesopotamia around 2100 B.C., while the first drugstores were established in the ancient city of Baghdad in the eighth century A.D.

<https://www.history.com/.../where-did-the-rx-symbol-come...>

R:M: কিছু আটিকেল কপি করা যায়নি, তাই স্ক্রিনশট দেয়া হলো। এছাড়াও অনেকগুলো ছবি দেয়া আছে অবশ্যই দেখুন ও পড়ুন।



Egyptians

- Eye of Horus
 - 5000 years ago
 - Magic eye
 - amulet to guard against disease, suffering, and evil
 - Evolved into modern day Rx sign



While "recipe" is thought by most historians to be the ultimate source for R, some have proposed a different origin- specifically, the symbol known as the "Eye of Horus." This was a symbol used in ancient Egypt to ward off evil, protect the king in the afterlife, and, most pertinent to this topic, used for good health. The evidence for this theory is scant, though an eye has been used before as a symbol for pharmacies.

প্রেসক্রিপশন বা চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্রে ব্যবহৃত 'Rx' চিহ্ন নিয়ে কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত আছে।

প্রথমত, Rx হল বৃহস্পতি গ্রহের Astrological সাইন আর বৃহস্পতি গ্রহের নাম ইংরেজিতে Jupiter যা কিনা রোমানদের মতে দেবতাদের রাজা। Rx লেখা হয় এই জন্য যে প্রেসক্রিপশনে লিখা পথ্যের উপর যেন রোমান দেবতা Jupiter শুভদৃষ্টি দেন এবং রোগী আরোগ্য লাভ করে। এছাড়া, চিকিৎসা শাস্ত্রের অভিধান মতে, Rx একটি ল্যাটিন শব্দ যা 'recipe' ও 'to take' এই দুটো মানে বোঝায়। মূলত এই RX প্রতীকটি এসেছে একটা ল্যাটিন শব্দ থেকে। শব্দটা হল Recipe, যার অর্থ হল 'আপনি নিন'। প্রাচীন মিশরীয়দের মধ্যে 'উটচাট' বা 'হোরাসের চোখ' নামে এক ধরনের কবচের প্রচলন ছিল। হোরাস হচ্ছেন একজন স্বাস্থ্য দেবতা। 'হোরাসের চোখ' নামে যে কবচ প্রচলিত ছিল তা অনেক রোগ প্রতিরোধ করত। এই কবচের প্রাথমিক আকৃতি অনেকটা হোরাসের চোখের মত ছিল। তবে এটা নানান জিনিস দিয়ে তৈরি করা হত। এভাবে এটি ব্যবহৃত হতে শুরু করে এবং কালক্রমে এটি ব্যবস্থাপত্রে চলে আসে। তবে অবশ্যই এটি ব্যবস্থাপত্রে আসার পেছনে দেবতার অনুগ্রহে রোগ নিরাময়ের একটা ব্যাপার থেকেই যায়। ভিন্ন মতানুসারে, Rx বলতে R = Refer to এবং X = Jesus Christ, অর্থাৎ Rx = Refer to Jesus Christ, মানে 'যিশুর নামে পড়া শুরু করুন'। যেমন আমরা বলি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বা 'মহান আল্লাহর নামে পড়া শুরু করছি', ঠিক সেরকম। X শব্দের ব্যাখ্যা: X দ্বারা জেসাস ক্রাইস্ট বা যিশু খ্রিস্টকে বোঝানো হয়। যেমন Xmas দ্বারা বোঝানো হয় ক্রিসমাস। উল্লেখ্য, X দ্বারা গ্রিক অক্ষর "Chi" কে নির্দেশ করে, যা দ্বারা গ্রিক ভাষায় সংক্ষেপে ক্রাইস্ট বা যিশুকে বোঝানো হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলে থাকেন, Rx মানে Report extended। আপনার শরীরের সমস্যা বা রোগ নির্ণয় করে 'এক্সটেন্ডেড' যে রিপোর্ট করা হয় যাতে পরবর্তী পদক্ষেপ বর্ণিত থাকে বিধায় এখানে Rx লেখা থাকে।

Share this Post [Like](#) [Share 0](#) [Tweet](#) [Share](#)



ISLAM-for the humanity
May 25, 2015 at 11:07 PM ·

Writing Rx is Shirk

Compiled by : Dr. Muhammad Waaris. Hyderabad. INDIA

During my graduation days I used to think and search the meaning of Rx which is usually written by all physicians before prescribing any medicine. This has become a tradition among muslim physicians too even in Arab countries. I searched many books to know the full form of this but I found only the meanings as "the prescription is as follow". My question remained unanswered as I wanted to know the full form of R and X. I could not find in medical dictionaries too. Finally I got the answer in a most popular but rare book of medical history with the name "History of medicine" written by Douglas Major vol.1 p.24 and 25. This book I found in Osmania medical college library, Hyderabad, Telangana, India. The same thing was found in a Urdu book "Tareekh-e-Tibb" written by Belgrami Lucknow.

Coming to the point how Shirk is secretly introduced among muslims.

In the ancient era Babolian physicians used to worship a man whose name was Mardux (Mardook in Arabic). They were thinking that he is God and he cures. (I SEEK REFUGE OF ALLAH) Physicians used to meet him. He wrote Rx (the letters derived from his name Mardux) on his forehead. When he died, those physicians continued this practice of writing Rx for the same purpose. This was introduced by the enemies of Islam among Muslims by changing its meaning.

In an international medical conference held in a corporate hospital of Hyderabad, a lecturer addressed on the topic "smart prescription". Where he said to write the Rx and said its meaning as "prescription is as follow". After his lecture I gave him the reference of my research and showed him the history, he agreed. I asked him why didn't you say the truth? He said, because commonly that meaning (prescription is as follow) is taken by most so I ignored.

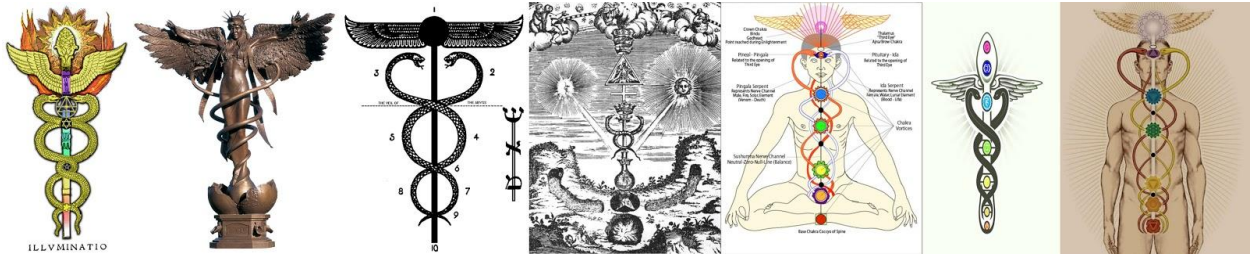
I want all of you to forward this message to others to prevent this shirk.

You can translate it in any language you know and inform to muslim community.

Jazak Allahu khair.

#admin Dr.Waqar ul Islam

ফার্মা, নাকি উইচক্রাফট বা সর্স্যারিস (জাদুবিদ্যা)?



ফার্মেসি শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ, ফার্ম্যাকিয়া থেকে। যার অর্থ হচ্ছে উইচক্রাফট বা সর্স্যারিস। অর্থাৎ জাদুবিদ্যা। এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে বিষ।

DID YOU KNOW

the word "pharmacy" comes from the Greek word "Pharmakia" which translates to "witchcraft" or "sorceries."



"Pharmakia" could also mean "poisoning"

উপরোক্ত আলোচনা গুলো থেকে পাঠক খুব ভালো করেই বুঝে ফেলেছেন যে, আধুনিক মেডিক্যাল সাইন্স (?) পুরটাই জাদুবিদ্যার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তাই এখানে আর বিস্তারিত কিছু লিখবো না। বরং আরও কিছু ছবি ও ভিডিও লিঙ্ক দিচ্ছি। যা আপনার জ্ঞান বাড়াতে সহায়তা করবে ইনশাআল্লাহ।



**It's 'Pharmakeia' in Scripture.
It's where we get our English
word, Pharmacy and
Pharmaeutical. It's **witchcraft!****


Sorcery is:

- 1-Opiates
- 2-Antidepressants
- 3-Benzodiazepines
- 4-Antipsychotics
- 5-Hypnotics (Rx sleeping meds)
- 6-Non-medicinal use of Marijuana
- 7-Alcohol
- 8-All Illegal Street Drugs

**With God,
substance abuse
isn't just about
the substance.**

**SMOKING WEED IS
SORCERY
AND OPENS THE MIND TO
DEMONIC
POSSESSION**

SORCERY
(GREEK WORD: PHARMAKIA)
"PRIMARILY SIGNIFYING THE USE
OF **DRUGS**, SPELLS."

 **REPENTANCE
CRY.COM**

SORCERY!!!!

**FDA, Big Pharma, Monsanto,
USDA, CDC, AMA, EPA... are
systematically poisoning us.**

 **POISON**

**It's called
POPULATION CONTROL!**
PLEASE WAKE UP PEOPLE!

www.ukapologetics.net

Sorcery in the Bible, Pharmakeia and Modern Medicine



Vedio link:

<https://www.youtube.com/watch?v=wKNnezELbfs>

কাফেররা কেন আমাদেরকে টিকা দিতে এত তৎপর?

Common vaccine (টিকা) গুলিতে যা যা থাকে, এর একটিও হালাল নয়। এমনকি এর ভিতরে কুকুরের কিডনি এবং শুওরের রক্ত পর্যন্ত থাকে। বিশ্বাস হচ্ছে না? আপনি নিজেই গবেষণা করে দেখেন, এগুলো CDC পর্যন্ত স্বীকার করেছে (যুক্তরাষ্ট্রের CDC er website এ প্রকাশিত টিকার উপাদান

সমূহ- <https://www.cdc.gov/.../do.../appendices/B/excipient-table-2.pdf>) তাদের যুক্তি হচ্ছে ছোটবেলায় বাচ্চাদের শরিরে এসব প্রবেশ করালে তাদের ইমিউন সিস্টেম এগুলোকে প্রতিরোধ করতে তৎপর হবে, এবং এর মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বারবো।

আমাদের চিরশত্রু কাফেররা কেন আমাদেরকে টিকা দিতে এত তৎপর, কখনও চিন্তা করে দেখেছেন? গ্রামের মানুষেরা তিন বেলা ঠিক মত খেতে পাচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে তাদের কোনই ক্রক্ষেপ নেই, কিন্তু টিকার বেলায় এসব NGO আর বিদেশি সংস্থাগুলি কেরকম তৎপর, কখনও খেয়াল করেছেন? এসবের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ডাক্তারগণ সোচ্চার হয়েছেন, এবং এ ব্যাপারে তাদের লেখা অসংখ্য বই ছাপানো হয়েছে, এবং ডকুমেন্টারি বানানো হয়েছে। বইয়ের এর মধ্যে

"Vaccines on trial"

(<https://www.amazon.com/Vaccines-Trial-Truths-C.../.../B077NX99G9>) ,

"Vaccine epidemic"

(<https://www.amazon.com/Vaccine-Epidemic-Corpor.../.../1620872129>)

উল্লেখযোগ্য

documentary এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য -

A shot in the dark

<https://youtu.be/B2N35yVQcSk>

learntherisk.org

পোলিও টিকাতে মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয় বানরের কিডনি:

পোলিও টিকা সহ সাধারণ যেসব টিকা বাচ্চাদেরকে দেয়া হয়, এগুলির প্রত্যেকটি মারাত্মক রকমের ক্ষতিকর, যদিও ক্ষতির পরিমাণ সব বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এক রকম হয়না। কোন কোন বাচ্চার ক্ষেত্রে প্রভাবটা সাথে সাথে হয়(Autism)(১)।

কোন কোন বাচ্চার ক্ষেত্রে প্রভাবটা সাথে সাথে না হলেও তার শৈশবেই হয় (childhood diabetes, cancer, leukemia).(২)

বর্তমানে যে পোলিও টিকা ব্যবহৃত হয়, এর নাম "IPOL®"। এর লাইসেন্স যুক্তরাষ্ট্রে করা, SANOFI কোম্পানির মালিকানাধীনো। (আরেকটি পোলিও টিকা Polivax এর ব্যবহার অনেক আগেই (১৯৯১) বন্ধ করা হয়েছে)

IPOL® টিকাতে মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয় বানরের কিডনি, এবং এর পাশাপাশি Formaldehyde, বা Formalin ও থাকে। (৩)

এগুলি কোন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নয়, সন্দেহ হলে আপনি নিজেই দেখে নিতে পারেন এগুলি Wikipedia তে এবং CDC এর website এ বিস্তারিত দেয়া আছে।

> Wikipedia তে প্রকাশিত বিভিন্ন টিকা ও সেগুলির উপাদান সমূহঃ (৪)

> CDC এর website এ প্রকাশিত বিভিন্ন টিকা ও সেগুলির উপাদান সমূহঃ

(৫)

(CDC, Centers for Disease Control and Prevention হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক সরকারী সংস্থা।)

Formaldehyde(Formalin) এবং Thimerosal(Mercury), এই দুটি ভয়ঙ্কর কেমিক্যাল প্রায় সবগুলি ভ্যাকসিনেই উপস্থিত আছে।

খাবার ফরমালিন মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আমরা খুবই সচেতন, কিন্তু আমাদের নাজুক বাচ্চাদের শরীরে যে সরাসরি Formalin ঢুকানো হয়, সে ব্যাপারে আমরা অনেকেই অবগত নই।

তাদের ভাষ্য মতে এগুলি সহনীয় মাত্রায় আছে, সুতরাং এগুলি নিরাপদ। তাদের এই যুক্তি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয়।(৬),(৭)

তারা আরও বলে থাকে যে ছোটবেলায় বাচ্চাদের শরীরে এসব প্রবেশ করলে তাদের ইমিউন সিস্টেম এগুলিকে প্রতিরোধ করতে তৎপর হবে, এবং কিছু কিছু কেমিকেল যেমন Formaldehyde নাকি শরীরের ব্যাকটেরিয়া অকার্যকর করে দেয়। শুধুমাত্র ধারণার ভিত্তিতে সুনিশ্চিত ক্ষতিকর জিনিস একটা সুস্থ সবল শরীরে প্রবেশ করানো কতটুকু যুক্তিযত?

এখানে হারাম-হালালেরও একটা ব্যাপার আছে। শরীরের জন্য ক্ষতিকর যেকোনো কিছুই হারাম।

IPOL® ছাড়াও RotaTeq®, ACAM2000®, Kinrix® এবং Pediarix® নামের টিকাগুলিতে উপাদান হিসেবে বানরের কিডনি ব্যবহৃত হয়। কুকুরের কিডনি ব্যবহার করা হয় ইনফ্লুয়েঞ্জার একটি ভ্যাকসিন

FLUCELVAX® এ। শুওরের রক্ত ব্যবহৃত হয় FLUMIST®, এবং ZOSTAVAX® এ।

অনেকেই বলবে যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে হারাম জায়েজ হয়ে যায়। হারাম জায়েজ হয়ে যায় ঠিক, কিন্তু সেটা শুধু নিশ্চিত মৃত্যু, অথবা বড় কোন রোগ, যেটাতে ইতিমধ্যে কেউ আক্রান্ত, সেখান থেকে তাকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে। একটা সুস্থ সবল শিশুর শরীরে বিনা কারণে এভাবে Formalin বা যেকোনো কেমিক্যাল ঢুকানো জায়েজ তো নয়ই, বৈজ্ঞানিক ভাবেও সমর্থিত নয়।

এসবের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সহ উন্নত দেশগুলোর উঁচু পর্যায়ের অসংখ্য ডাক্তার এবং গবেষকগণ সোচ্চার হয়েছেন, এবং এ ব্যাপারে তাদের লেখা অনেক বই ছাপানো হয়েছে, এবং ডকুমেন্টারি বানানো হয়েছে। বইয়ের এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু বই -

Vaccine Villains(৮)

Thimerosal: Let the Science Speak(৯)

(এই দুটি বই যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট John F. Kennedy এর ছেলে Robert F. Kennedy Jr. এর লেখা)

Vaccines on trial(১০), Vaccine epidemic(১১), How to end the autism epidemic(১২), Evidence of Harm(১৩)

ডকুমেন্টারির মধ্যে উল্লেখযোগ্য -

"A shot in the dark"

<https://youtu.be/B2N35yVQcSk>

লিঙ্কসমূহঃ

(১) <https://www.globalresearch.ca/uncovering-the.../5491987>

(২) <https://www.globalresearch.ca/new-study-in.../5402912>

(৩) <https://www.fda.gov/.../ipol-poliovirus-vaccine...>

(৪) https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_vaccine_ingredients

(৫) <https://www.cdc.gov/.../appendices/B/excipient-table-2.pdf>

(৬) <https://www.globalresearch.ca/mercury-and-vaccines/5571134>

(৭) <https://www.globalresearch.ca/cdc-caught-hiding.../5430305>

(৮) <https://www.amazon.com/Vaccine-Villains.../dp/1510711619>

(৯) <https://www.amazon.com/Thimerosal-Evidence.../dp/1634504429>

(১০) <https://www.amazon.com/Vaccines-Trial.../dp/B077NX99G9>

(১১) <https://www.amazon.com/Vaccine-Epidemic.../dp/1620872129>

(১২) <https://www.amazon.com/How-Autism-Epidemic.../dp/1603588248>

(১৩) <https://www.amazon.com/Evidence-Harm-David.../dp/B001SWNUPQ>

ছবিঃ

DO YOU KNOW WHAT'S IN A VACCINE?

NONE OF THESE SHOULD BE INJECTED INTO YOUR BODY

Aluminum

Known to cause brain damage at all doses, linked to ALZHEIMER'S DISEASE, dementia, seizures, autoimmune issues, SIDs and cancer. This toxin accumulates in the brain and causes more damage with each dose.

Beta-Propiolactone

Known to cause CANCER. Suspected gastrointestinal, liver, nerve and respiratory, skin and sense organ POISON.

Gentamicin Sulphate & Polymyxin B [antibiotics]

ALLERGIC reactions can range from mild to life-threatening.

Genetically Modified Yeast, Animal, Bacterial and Viral DNA

Can be incorporated into the recipient's DNA and cause unknown GENETIC MUTATIONS.

Glutaraldehyde

Poisonous if ingested. Causes BIRTH DEFECTS in animals.

Formaldehyde [formalin]

Known to cause CANCER in humans. Probable gastrointestinal, liver, respiratory, immune, nerve and reproductive system POISON. Banned from injectables in most European countries.

Latex Rubber

Can cause life-threatening allergic reactions.

Human and Animal Cells

Human DNA from aborted BABIES. Pig blood, horse blood, rabbit brains, dog kidneys, cow hearts, monkey kidneys, chick embryos, calf serum, sheep blood & more. Linked to childhood leukemia and diabetes.

Mercury [thimerosal]

One of the most toxic substances known. Even if a thermometer breaks, the building is cleared and HAZMAT is called. Tiny doses cause damage to the brain, gut, liver, bone marrow, nervous system and/or kidneys. Linked to autoimmune disorders, and neurological disorders like AUTISM.

Monosodium Glutamate [MSG]

A toxic chemical that is linked to birth defects, developmental delays and infertility. Banned in Europe.

Neomycin Sulphate [antibiotic]

Interferes with vitamin B6 absorption which can lead to epilepsy and brain damage. Allergic reactions can range from mild to life-threatening.

Phenol/Phenoxyethanol [2-PE]

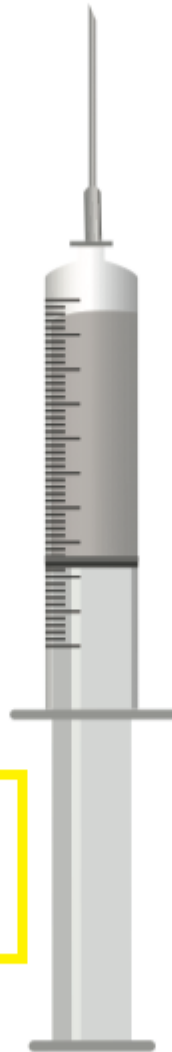
Used as anti-freeze. TOXIC to all cells and capable of destroying the immune system.

Polysorbate 80 & 20

Known to cause CANCER in animals and linked to numerous autoimmune issues and infertility.

Tri(n) Butylphosphate

Potentially toxic to the kidney and nervous system.



www.LearnTheRisk.org

১) বিভিন্ন টিকাতে ব্যবহৃত কিছু উপাদান, এবং শরীরে এগুলির প্রভাব

learntherisk.org



২) যুক্তরাষ্ট্রের Washington অঙ্গরাজ্যের Capitol বিল্ডিং এর সামনে
ভ্যাকসিন বিরোধী সমাবেশ, ১৯ এপ্রিল ২০২০



৩) যুক্তরাষ্ট্রের New York অঙ্গরাজ্যের west capitol park এ ভ্যাকসিন
বিরোধী সমাবেশ

আপনার শিশুকে টিকা দিতে চান? তার আগে সত্য জানুন!

টিকার যতগুলো মারাত্মক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে, তার মধ্যে একটি হলো ‘সাডেন ইনফেন্ট ডেথ সিনড্রোম’ বা শিশুর হঠাৎ মৃত্যু (SIDS-Sudden Infant Death Syndrome)। বেশ কিছু রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য বা রোগের বিরুদ্ধে শরীরে প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টির জন্য আমরা অনেকেই এলোপ্যাথিক টিকাগুলো নিয়ে থাকি। যেমন-বিসিজি, ডিপিটি, এমএমআর, হাম, পোলিও, হেপাটাইটিস, এটিএস ইত্যাদি। অথচ টিকার (vaccine) মারাত্মক ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আমরা অনেকেই খবর রাখি না। টিকার ক্রিয়াকৌশল হলো অনেকটা ‘কাটা দিয়ে কাটা তোলা’ কিংবা ‘চোর ধরতে চোর নিয়োগ দেওয়া’র মতো। যে রোগের টিকা আমরা নিয়ে থাকি, সেটি বস্তুত তৈরী করা হয়ে থাকে সেই রোগেরই জীবাণু থেকে। অর্থাৎ যে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস যে-ই রোগের সৃষ্টি করে থাকে, সেই ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস থেকেই সেই রোগের টিকা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট মারাত্মক ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসকে নাকি নানাবিধ জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ‘দুর্বল’ করে টিকা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। টিকা মুখে খাওয়ানো হউক বা ইনজেকশনের মাধ্যমে দেওয়া হউক, সবগুলোই এই তথাকথিত ‘দুর্বল’ কিন্তু জীবিত জীবাণু দিয়ে তৈরী করা হয়। এসব ভয়ানক ক্ষতিকর জীবাণুকে ‘দুর্বল’ করার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করে একই সাথে বিখ্যাত এবং পরবর্তীতে কুখ্যাত হয়েছিলেন ফ্রান্সের বিজ্ঞানী ‘লুই পাস্তুর’। কেননা লুই পাস্তুরের আবিষ্কৃত জলাতঙ্কের টিকা নিয়েই বরং বিপুল সংখ্যক লোক জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। দাবী করা হয়ে থাকে যে,

জীবাণুদের এই ‘দুর্বলতা’ একটি স্থায়ী বিষয়; কাজেই তারা কখনও শক্তিশালী হতে পারে না এবং কোন ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু নিরপেক্ষ চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, কারো শরীরে উপযুক্ত পরিবেশ পেলে জীবাণুরা ঠিকই শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে এবং ভয়ঙ্কর ক্ষতিসাধন করতে পারে। বাস্তবে এমন ভুড়িভুড়ি প্রমাণ পাওয়া যায়। সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে (বাংলাদেশে) এমন ঘটনা ঘটেছে।



আরেকটি চিন্তার কথা হলো, শক্তিশালী কেউটে সাপে দংশন করলে মানুষ মরবে আর দুর্বল কেউটে সাপে কামড়ালে মানুষ মরবেও না আর কোন ক্ষতিও হবে না, এমনটা বলা কতটা যুক্তিসঙ্গত? দাবী করা হয়ে থাকে যে, কোন রোগের টিকা নিলে শরীরে সেই রোগের বিরুদ্ধে একটি ক্ষণস্থায়ী প্রতিরোধ শক্তির (antibody) সৃষ্টি হয়; ফলে আগামী কয়েক বছর সেই ব্যক্তির ঐ রোগটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

কিন্তু এই দাবীর একশ ভাগ গ্যারান্টি আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বোয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী অধিকাংশ ব্রিটিশ সৈন্যকে টাইফয়েডের টিকা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারপরও ৫১,০০০ সৈন্য টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়েছিল যাদের মধ্যে ৮০০০ সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। অন্যদিকে ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় রাশিয়া-জাপান যুদ্ধের অভিজ্ঞতা

অনুসারে ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টের সৈন্যদেরকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছিল। ফলে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়েছিল মাত্র ৭০০০ সৈন্য যাদের অর্ধেক ছিল টাইফয়েডের টিকা নেওয়া এবং অর্ধেক ছিল টিকা ছাড়া। আবার গেলিপোলির যুদ্ধে সমস্ত সৈন্যকে আমাশয়ের টিকা দেওয়ার পরও ৯৬,০০০ সৈন্য আমাশয়ে আক্রান্ত হয়েছিল কেবল বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা যায়নি বলে। ১৯৪৮ সালে যুক্তরাজ্যে বাধ্যতামূলক বসন্তের টিকা নেওয়ার আইনটি যখন বাতিল করা হয়; তার পরের পরিসংখ্যানে কিন্তু যুক্তরাজ্যে বসন্ত মহামারীর সংখ্যা বা বসন্ত রোগে (small pox) মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়নি। মোটামুটি সকল টিকার শিক্ষা একটিই আর তাহলো পুষ্টির খাবার, বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান ইত্যাদির অভাবকে হাজারবার টিকা দিয়েও সামলানো যায় না। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো- শরীরে রোগ প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি করার পাশাপাশি টিকা নামক এই জৈব বিষ (Biological poison) অর্থাৎ জীবাণু মানুষের রোগ প্রতিরোধ শক্তি বা ইমিউন সিস্টেমে (immune system) মারাত্মক বিশৃংখলার সৃষ্টি করে থাকে। আর এই বিশৃংখলার সুযোগে ক্যান্সারের মতো প্রাণঘাতী রোগ আমাদের শরীরে বাসা বাধার উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে যায়। ইহা আজ প্রমাণিত সত্য যে, ইমিউনিটির সর্বনাশ না হলে শরীরে ক্যান্সার বা ম্যালিগন্যান্সি (malignancy) আসতে পারে না। পৃথিবীতে রোগ-ব্যাদিকে যিনি সবার চাইতে বেশী বুঝতে পেরেছিলেন, সেই চিকিৎসা মহাবিজ্ঞানী জার্মান ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান টিকাকে অভিহিত করেছেন- ‘মানবজাতিকে ধ্বংসের একটি ভয়ানক মারনাস্ত্ররূপে’।

...

টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা ক্ষতিকর ক্রিয়া এবং তা থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক গবেষণা করেছেন ব্রিটিশ হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ জে. সি.

বার্নেট (Dr. James Compton Burnett, M.D.)। ১৮৮০ সালে তিনি তাঁর সুদীর্ঘ ক্লিনিক্যাল অবজারভেশন থেকে ঘোষণা করেন যে, টিউমার এবং ক্যান্সারের একটি অন্যতম মূল কারণ হলো এসব টিকা। বার্নেট প্রথম প্রমাণ করেন যে, থুজা (*Thuja occidentalis*) নামক হোমিও ঔষধটি টিকার অধিকাংশ ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিরাময় করতে সক্ষম। বার্নেটের মতে, মানুষ জন্মের সময় আল্লাহ প্রদত্ত যে স্বাস্থ্য নিয়ে জন্মায় তা হলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য (perfect health)। আর এই কারণে টিকা দিয়ে বা অন্য-কোন ঔষধ প্রয়োগে তাকে পরিবর্তন করা হলো একটি মাইনাস পয়েন্ট অর্থাৎ সুস্বাস্থ্যের ক্ষতি করার নামান্তর। তার মানে হলো টিকা দেওয়ার ফলে একজন মানুষ তার সবচেয়ে উত্তম স্বাস্থ্য থেকে বিচ্যুত/ অধঃপতন হলো।

আর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার মানে হলো অসুস্থ হওয়া। কাজেই টিকা নেওয়ার ফলে শরীরের যে অবস্থা হয়, তাকে সহজ ভাষায় বলা যায় অসুস্থ অবস্থা বা রোগ আক্রান্ত অবস্থা বা পীড়াগ্রস্থ হওয়া। স্টুয়ার্ট ক্লোজ (Dr. Stuart M Close, M.D.) নামক আরেকজন ব্রিটিশ চিকিৎসা বিজ্ঞানী টিকার ন্যায় যাবতীয় পাইকারী চিকিৎসাকে সম্পূর্ণরূপে ‘এক পাক্ষিক বা এক আঙ্গিক’ (unholistic) ঘোষণা করে ইহার নিন্দা করেছেন ; কেননা ইহা চিকিৎসা

বিজ্ঞানের সংবেদনশীলতা (Susceptibility) নামক সার্বজনীন নীতির পরিপন্থী।
সাসসেপটিবিলিটি নীতির মানে হলো একই ঔষধ একজনের উপকার করতে পারে,
আরেকজনের ক্ষতি করতে পারে আবার অন্যজনের উপকার-ক্ষতি কোনটাই নাও
করতে পারে।



হারিস কালটার (Harris Culter) নামক একজন মেডিক্যাল ঐতিহাসিক এখনকার সমাজে মানসিক রোগ এবং অপরাধ প্রবনতা বৃদ্ধির জন্য এবং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্য টিকাদান কর্মসূচীকে দায়ী করেছেন। টিকা কেবল আমাদের শরীরকে নয়, আমাদের মনকেও বিষিয়ে তুলেছে। মানুষের মধ্যে আজকাল যে উগ্রমেজাজ, প্রতিশোধ প্রবনতা, অপরাধে আসক্তি, কথায় কথায় খুন করার মানসিকতা, মাদকাসক্তি প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায় তারও মূলে রয়েছে এই কুলাঙ্গার টিকা। বিশেষত বিসিজি টিকা শিশুদের মনে ধ্বংসাত্মক প্রবণতা সৃষ্টি করে। ইহার ফলে শিশুরা এমন দুর্দান্ত স্বভাবের হয় যে, তাদেরকে শাসন বা নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরা হয় গোয়ার, কথায় কথায় মারামারি এবং ভাংচুড়ে ওস্তাদ। বর্তমানে প্রচলিত মারাত্মক মারাত্মক অনেক চর্মরোগেরও মূল কারণ এই টিকা। একটি ওয়েবসাইটে টিকা নেওয়ার ফলে শিশুদের যে-সব মারাত্মক মারাত্মক চর্মরোগ হয়েছে, তাদের অনেকগুলো ছবি দেওয়া আছে, যা দেখলে যে কেউ শিউরে উঠবেন। সম্প্রতি একটি গবেষণায় ঈঙ্গিত করা হয়েছে যে, একিউট ডিজিজের পরিমাণ কমে গিয়ে এলার্জি, হাঁপানি, ডায়াবেটিস, টিউমার, ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ক্রনিক ডিজিজের সংখ্যা মহামারী আকারে বৃদ্ধি পাওয়ার মূলে আছে এসব পাইকারী টিকাদান কর্মসূচী। কুলকান (Kulcan) নামক একজন ব্রিটিশ গবেষক লক্ষ্য করেন যে, মানুষের চুল টিকার দ্বারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। টিকা নেওয়ার ফলে কারো কারো চুল পাতলা হয়ে যায়, কারো কারো চুল পড়ে যায় এবং কারো কারো ক্ষেত্রে অনাকাঙ্খিত স্থানে বেশী বেশী চুল গজাতে থাকে। ডাঃ বার্নেট দীর্ঘ গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে, টাক (Alopecia areata) পড়ার মূল

কারণ হলো দাদ (Ringworm) এবং দাদের মূল কারণ হলো টিকা। এই কারণে দেখা যায় শহরে মানুষদের মধ্যে টাক পড়ে বেশী এবং গ্রামের মানুষদের মধ্যে টাক পড়ার হার খুবই কম ছিল; কেননা গ্রামের লোকেরা টিকা/ ভ্যাকসিন তেমন একটা নিতনা। তবে বর্তমান সময়ে গ্রামেও এ প্রবনতা দেখা যাচ্ছে কারন এখন গ্রামের লোকেরাও টিকা নিচ্ছে গনহারে।

সম্প্রতি ডাঃ রিচার্ড পিটকেয়ার্ন (Dr. Richard Pitcairn) নামক একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী আমেরিকার গৃহপালিত পোষা প্রাণীদের ওপর গবেষণা করে দেখতে পান যে, যেসব পশুদের টিকা দেওয়া হয়েছে তাদের দাঁত ক্ষয় (dental caries) হয় বেশী বেশী। আমেরিকানরা কেবল পাইকারী হারে টিকা নিতেই অভ্যস্ত নয় বরং একই সাথে তাদের গৃহপালিত পোষা প্রাণীদেরকেও পাইকারী হারে টিকা দিতে ওস্তাদ। আবার একই অবস্থা দেখা গেছে মানুষের ক্ষেত্রেও ; টিকা না নেওয়া শিশুদের চাইতে টিকা নেওয়া শিশুদের দাঁত ক্ষয় হয় বেশী মাত্রায়। এমনকি গবেষণায় দেখা গেছে যে, টিকা নেওয়া শিশুদেরকে যতই পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো হোক না কেন, তাদের দাঁত ধ্বংস হবেই এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাঁত ক্ষয় হয় দাঁতের বাহিরের দিকে মাড়ির কাছাকাছি (neck lesions)। যেহেতু দাঁতের সাথে হাড়ের গঠনের খুবই ঘনিষ্ঠ মিল আছে ; তাই বলা যায় এসব টিকা আমাদের হাড়েরও ক্ষতি করে থাকে সমানভাবে। আর হাড়ের ক্ষতি হলে শরীরে রক্ত কমে যায় ; কেননা আমাদের রক্ত উৎপন্ন হয় হাড়ের ভিতরে (bone marrow) থেকে। আর রক্ত কমে গেলে বা রক্তের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোন ত্রুটি দেখা দিলে মানুষ অস্থিচর্মসার বা কঙ্কালে (emaciated) পরিণত হয়। ডিপিটি টিকার কুফলে

আপনার শিশুর তাৎক্ষণিক মৃত্যু হতে পারে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুর ব্রেনও ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। ফলে সে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধি বা অটিজমের (Autism) স্বীকার হতে পারে। অবশ্য অনেক গবেষণায় দেখা গেছে যে, হাম (measles), মাম্পস বা কণমূল প্রদাহ (mumps), হেপাটাইটিস এবং রুবেলা (rubella) ভ্যাকসিনেরও মানুষ এবং পোষাজন্তুদের ব্রেন ড্যামেজ করার ক্ষমতা আছে। বর্তমানে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধি শিশুদের সংখ্যা এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সচেতন ব্যক্তিরা মানবজাতির ভবিষ্যত নিয়ে শংকিত হয়ে পড়েছেন। কেননা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর নেতৃত্ব তো আজকের শিশুদেরকেই নিতে হবে। শিশুদের বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিত্ব বা অটিজমে (Autism) আক্রান্ত হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ যে এইসব টিকা, তা অগণিত গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। ইন্টারনেটে সামান্য খোজাখুঁজি করলেই এসব টিকা নেওয়ার ফলে অগণিত শিশুর করুণ মৃত্যু, ব্রেন ড্যামেজ হওয়া, ক্যান্সার, টিউমার, ব্লাড ক্যানসার প্রভৃতি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়ার এমন অগণিত কেইস হিস্ট্রি দেখতে পাবেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক জরিপে দেখা গেছে, যে-সব দেশে টিকা নেওয়ার হার বেশী, সে সব দেশে ক্যান্সারে মৃত্যুর হারও বেশী। শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো থেকে স্বয়ং তার পিতা-মাতা পোলিও রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। কেননা পোলিও টিকাতে পোলিও রোগের জীবিত ভাইরাস থাকে যা অনেকদিন পর্যন্ত শিশুর মল-মূত্র-থুথু-কাশিতে অবস্থান করে। এসময় শিশুকে চুমু খেলে বা শিশুর পায়খানা-প্রস্রাব স্পর্শ করার মাধ্যমে পিতা-মাতা-দাদা-দাদীও পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে পঙ্গু হয়ে যেতে পারেন, যদি তাদের শরীরে পোলিও রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি

বিদ্যমান না থাকে বা তাদের রোগ প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল হয়ে থাকে।



হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের প্রফেসর রোনাল্ড ডেসরোজিয়ারের মতে, পোলিও টিকাতে আরেকটি ভয়ঙ্কর বিপদ আছে যা ভবিষ্যতে টাইম বোমার মতো বিস্ফোরণের সৃষ্টি করতে পারে। আর তা হলো পোলিও টিকা তৈরীতে বানরের কিডনীর টিস্যু ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফলে বানরদের শরীরে থাকা মারাত্মক সব ভাইরাস পোলিও টিকার মাধ্যমে মানবজাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে যা অকল্পনীয় বিপর্যয় ডেকে আনবে। ডেসরোজিয়ারের মতে, ‘আপনি হয়ত বলতে পারেন যে, ভাইরাসমুক্ত বানরের টিস্যু ব্যবহার করলেই হলো। কিন্তু সমস্যা হলো বানরের শরীরে থাকা মাত্র ২% ভাইরাস সম্পর্কে মানুষ অবহিত। কাজেই অবশিষ্ট বিপুল সংখ্যক ভাইরাস থেকে ক্ষতির আশংকা থেকেই যায়’। ১৯৫৯ সালে বহুজাতিক ঔষধ কোম্পানির মার্ক-এর বেন সুইট নামক এক বিজ্ঞানী পোলিও টিকাতে এসভি-৪০ নামক বানরের নতুন একটি ভাইরাস সনাক্ত করেন যেই ব্যাচের টিকা পূর্ববর্তী

পাঁচ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোটি কোটি শিশুকে খাওয়ানো হয়েছিল। গবেষণায় যখন প্রমাণিত হয় যে, এসভি-৪০ একটি ক্যান্সার সৃষ্টিকারী এজেন্ট যা গিনিপিগের শরীরে টিউমার তৈরী করেছে; তখন সারা আমেরিকায় হৈচৈ পড়ে যায়। তারপর যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং টিকা প্রস্তুতকারী কোম্পানি সিদ্ধান্ত নেয় যে, এখন থেকে পোলিও টিকা তৈরীতে অন্য প্রজাতির বানরের কোষতন্তু (tissue) ব্যবহার করা হবে।

পরবর্তী গবেষণায় দেখা গেছে যে, এসভি-৪০ ভাইরাস কেবল পোলিও টিকা গ্রহনকারীদের শরীরেই নানা রকম ক্যান্সারের সৃষ্টি করে না, বরং তাদের সন্তানদের দেহেও ক্যান্সার সৃষ্টি করতে সক্ষম। ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাথলজীর প্রফেসর বিজ্ঞানী জন মার্টিন সিমিয়ান সাইটোমেগালো ভাইরাস (SCMV) নামক একটি বানরের ভাইরাস নিয়ে গবেষণায় দেখেছেন যে, এটি মানুষের ব্রেনে ছোট-বড় নিউরোলজিক্যাল সমস্যার সৃষ্টি করতে সক্ষম। শিকাগোর ল্যালা ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারের মলিকুলার প্যাথলজিস্ট মিশেল কার্বন একই ধরনের টিউমার মানুষের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন যেমনটা এসভি-৪০ ভাইরাস গিনিপিগের শরীরে তৈরী করেছিল। তিনি ৬০% ফুসফুসের ক্যান্সারে এবং ৩৮% হাড়ের ক্যান্সারে এসভি-৪০ ভাইরাসের জিন এবং প্রোটিন আবিষ্কার করেন। তিনি একটি মেডিকেল কনফারেন্সে এসভি-৪০ ভাইরাসের সাথে এসব ক্যান্সারের সম্পর্কের বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে নিশ্চিত করেন। তার সর্বশেষ গবেষণায় এসভি-৪০ ভাইরাস কিভাবে একটি কোষকে ক্যান্সারে রূপান্তরিত করে তার মেকানিজম আবিষ্কার এবং বর্ণনা করেন। মিশেল কার্বনের গবেষণায় দেখা যায় যে,

এসভি-৪০ ভাইরাসটি একটি প্রোটিনকে বিকল করে দিয়ে থাকে যা কোষকে ক্যান্সারে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করে। কাজেই কারো কারো মধ্যে ব্রেন, হাড় এবং ফুসফুসে টিউমার সৃষ্টিতে এসভি-৪০ ভাইরাস একটি উপাদানরূপে কাজ করতে পারে। ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা যে, পোলিও টিকা খাওয়ার পর ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি কোন শিশু অন্য কোন ইনজেকশন নেয়, তবে তার প্যারালাইসিস এবং পোলিওমায়েলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে পঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই বিষয়টি কয়েক বছর পূর্বে ওমানে প্রমাণিত হয়েছে, যেখানে পোলিও টিকা খাওয়ার পরে ডি.পি.টি. ইনজেকশন নেওয়া বিপুল সংখ্যক শিশু প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়েছিল। কেন এমনটা হয় সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কোন রহস্য কিনারা করতে পারেনি।



ইটালীর ইউনিভার্সিটি অব ফেরারা’র জেনেটিক্সের প্রফেসর মওরো টগনন গত বিশ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে ব্রেন টিউমারের সংখ্যা ৩০% বৃদ্ধি পাওয়ার একটি সম্ভাব্য কারণরূপে মনে করেন পোলিও টিকার মাধ্যমে ছড়ানো এসভি-৪০ ভাইরাসকে। আমেরিকার মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত ইটালীর এক ক্যান্সার গবেষণার ফলাফলে সুপারিশ করা হয়েছে যে, বর্তমানে তিন ধরনের ক্যান্সারের আক্রমণের হার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হলো বানরের এসভি-৪০ ভাইরাস পোলিও টিকার মাধ্যমে

মানবজাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়া ; যা বর্তমানে যৌনমিলনের মাধ্যমে পুরুষ থেকে নারীতে এবং বংশ পরস্পরায় মা থেকে গর্ভস্থ শিশুতে বিস্তার লাভ করছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের একাংশ মনে করেন, পোলিও টিকার মাধ্যমেই এইডস রোগের ভাইরাস বানরদের শরীর থেকে মানবজাতির মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। ন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট অব হেলথের গবেষক এবং জেনেটিক্স বিজ্ঞানী মার্ক গীয়ার বলেন যে, “সকলের সামনে টিকার ক্ষতিকর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করলে বা টিকা নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের সম্পর্কে কথা বললে অন্যান্য ডাক্তাররা প্রচুর সমালোচনা করে থাকে। কিন্তু একই ডাক্তাররা আবার গোপনে স্বীকার করেন যে, টিকা সম্পর্কে তুমি যা বলেছ তা ঠিক আছে। তবে এসব সবাইকে বলতে থাকলে লোকেরা ভয়ে টিকা নেওয়া বন্ধ করে দিবে”। তার মতে, চিকিৎসকদের এই ধরনের মনোভাব খুবই দুঃখজনক।

ল্যাবরেটরী এক্সপেরিমেণ্ট এবং ক্লিনিক্যাল অবজারবেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন টিকার সাথে আরো অনেক মারাত্মক মারাত্মক রোগের সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া গেছে। যেমন- ডিপটি টিকার সাথে এনাফাইলেকটিক শক (Anaphylactic shock) বা হঠাৎ মৃত্যু, এনসেফালোপ্যাথি (Encephalopathy) ব্রেনের ইনফেকশন, গুলেন বেরি সিনড্রোম (Guillain-Barré Syndrome), ডিমায়েলিনেটিং ডিজিজ অথবা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ইত্যাদি। হামের টিকার সাথে অপটিক নিউরাইটিস (Optic neuritis) দৃষ্টিশক্তির গোলমাল, মৃগীরোগ (Epilepsy), গুলেন-বেরি সিনড্রোম, ট্রান্সভার্স মাইয়েলাইটিস (Transverse myelitis), মৃত্যু ইত্যাদি। হেপাটাইটিস বি টিকা থেকে গুলেন-বেরি সিনড্রোম, আর্থ্রাইটিস

(Arthritis), ডিমায়েলিনেটিং ডিজিজিজ অব সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ইত্যাদি হতে পারে। সবচেয়ে বড় বিপদের কথা হলো, একই ব্যক্তি একসাথে অনেকগুলো টিকা নিলে তাদের পারস্পরিক বিক্রিয়ার কারণে আমাদের কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে, সে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং হোমিও ডাক্তাররা শত বর্ষ পূর্ব থেকেই এসব টিকাদান কর্মসূচীর বিরোধিতা করে আসছেন।

ব্রিটিশ সোসাইটি অব হোমিওপ্যাথ-এর দুই হাজার সদস্য রয়েছেন, যাদের কেউ টিকা সমর্থন করেন না। এমনকি যে-সব বিজ্ঞানী এসব টিকা আবিষ্কার করেছিলেন, তারাও কোন রকম মহামারী ছাড়াই বিনা প্রয়োজনে এসব টিকা পাইকারী হারে সবাইকে দেওয়ার সুপারিশ করেন নাই। কিন্তু পরবর্তীতে এটি একটি বিরাট লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। টিকার ক্ষতিকর দিক নিয়ে প্রচুর গবেষণা এবং লেখালেখি করেছেন এমন একজন ভারতীয় গবেষক শ্রী জগন্নাথ চ্যাটার্জির মতে, “একজন মানুষের জীবনকে তছনছ/ ছাড়খার করার জন্য মাত্র একডোজ টিকাই যথেষ্ট”।

যদিও দাবী করা হয়ে থাকে যে, আজ থেকে একশ বছর পূর্বে যখন পাইকারী টিকাদান কর্মসূচী শুরু করা হয়, তখন থেকেই প্রচলিত সংক্রামক ব্যাধিসমূহ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে। কিন্তু ব্রিটিশ এবং আমেরিকান তৎকালীন মেডিকেল পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ডিপথেরিয়া, যক্ষ্মা এবং হুপিং কাশি টিকা আবিষ্কারের পূর্বেই আক্ষরিক অর্থে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, টিকার কারণে নয় বরং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালীর উন্নতি, খাদ্য পুষ্টিমানের উন্নতি, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের কারণে এসব সংক্রামক ব্যাধি ধীরে

ধীরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শিল্পোন্নত দেশগুলি তাদের আবিষ্কৃত ঔষধ নিজেরা ব্যবহারের পূর্বে প্রথমে আমাদের মতো দরিদ্র-অশিক্ষা জর্জড়িত দেশে অল্পমূল্যে বা ক্ষেত্রবিশেষে বিনামূল্যে পাঠিয়ে দেয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। এই উদ্দেশ্যে তারা জাতিসংঘকে ব্যবহার করে তাদের ধামাধরা হিসাবে। তাদের কাছে আমরা হলাম গিনিপিগ বা গবাদিপশুতুল্য। আমাদের ওপর দশ-বিশ বছর পরীক্ষার পরে যখন নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সংশ্লিষ্ট ঔষধটির তেমন কোন মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব নেই, তখনই সেটি উন্নত দেশের লোকেরা ব্যবহার করতে শুরু করে। এই কারণে বাজারে আসা সমস্ত নতুন ঔষধ থেকে সযত্নে দূরে থাকা কর্তব্য। শ্রী রাজাজি নামক একজন ভারতীয় চিকিৎসক একটি মেয়ের ঘটনা বর্ণনা করেন, যে বিসিজি টিকা নিয়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং অন্য দুইজনের উল্লেখ করেছেন যারা বিসিজি নেওয়ার পরে মৃত্যুবরণ করে। আর টিকার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে গত একশ বছরের সকল গবেষণার প্রতি যদি আপনি লক্ষ্য করেন, তবে দেখতে পাবেন এদের সবচেয়ে বড় অংশটি দখল করে আছে ব্রেনের (brain) রোগসমূহ। অর্থাৎ ভ্যাকসিন থেকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অঙ্গটি হলো ব্রেন / মস্তিষ্ক বা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম (central nervous system)। আর ব্রেন ক্ষতিগ্রস্ত হলে আপনি যে-সব রোগে আক্রান্ত হতে পারেন, সেগুলো হলো ব্রেন টিউমার, অটিজম (বুদ্ধিপ্রতিবন্ধি), ব্রেন ড্যামেজ, মৃগীরোগ (epilepsy), মাইগ্রেন (migraine), বিষন্নতা (depression), খুন করার প্রবনতা (killing instinct), গুলেন-বেরি সিনড্রোম (Guillain barré syndrome), যৌন ক্ষমতা বিনষ্ট হওয়া (impotency), ভাইরাস এনসেফালাইটিস (viral encephalities), অন্ধত্ব,

বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগ, স্মরণশক্তি নষ্ট হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।



আরেকটি সমস্যা হলো, কোটি কোটি ইউনিট টিকা উৎপাদনের সময় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে অনেকগুলিতে রোগ সৃষ্টিতে সক্ষম এমন শক্তিশালী জীবাণু থেকে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। তেমনি একটি ঘটনায় গত বৎসর ভারতের মেঘালয় প্রদেশে এগার হাজার শিশুর মৃত্যু হলে ভারত সরকার ইউনিসেফের বিরুদ্ধে আনত্মজাতিক আদালতে মামলা দায়ের করে। ভিয়েনা ভিত্তিক একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ‘ন্যাশন্যাল ভ্যাকসিন ইনফরমেশন সেন্টার’ (যারা টিকার ক্ষতিকর ক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা করে)-এর মতে, টিকা নেওয়ার কারণে শিশুদের হঠাৎ মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি দশ লাখে একটি এবং শিশুদের ব্রেন ড্যামেজের হার প্রতি ছেষটি হাজারে একটি। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, বাস্তব সংখ্যা তার চাইতেও অনেক বেশী হওয়াটা

স্বাভাবিক। কারণ টিকা নেওয়ার কারণে মৃত্যুবরণ করা অথবা অন্য কোন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়া শিশুদের অনেক পিতা-মাতা অজ্ঞতার কারণে বিষয়টি বুঝতেও পারেন না এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগে অথবা সংবাদপত্রে রিপোর্ট করেন না (এবং দারিদ্রের কারণেও এমনটা ঘটে থাকে)। যুক্তরাষ্ট্রের অফিসিয়াল রেকর্ডে দেখা যায় যে, টিকা নেওয়ার কারণে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি শিশুর মৃত্যু হয়ে থাকে এবং ডাক্তাররা স্বীকার করেছেন যে, টিকার মাধ্যমে সিফিলিস রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া টিকা দেওয়ার পরে অনেক শিশুই প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং এসব পরিস্থিতিতে পিতা-মাতার অবহেলায় শিশুদের মৃত্যুর ঘটনা হরহামেশা প্রত্রিকায় দেখা যায়। হ্যাঁ, ক্রটিযুক্ত টিকা বা টিকা প্রয়োগজনিত ক্রটির কারণে আপনার প্রাণপ্রিয় সন্তান চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। অজ্ঞতার কারণে এক সময় অনেক দেশেই টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে সে অবস্থা এখন আর নেই। কাজেই বর্তমানে অভিবাবকদের উচিত প্রতিটি বিষয়ের ভাল-মন্দ জেনে-শুনে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া। শিশুদের পাইকারী হারে টিকা দেওয়ার এই রমরমা অবস্থার পেছনের কারণ সম্পূর্ণই বাণিজ্য অর্থাৎ মালের ধান্ডা। যে-সব দেশে এসব টিকা তৈরী হয়, সে-সব দেশের সরকারসমূহ প্রতি বছর এসব টিকা কোম্পানীগুলোর কাছ থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ট্যাক্স পেয়ে থাকে।

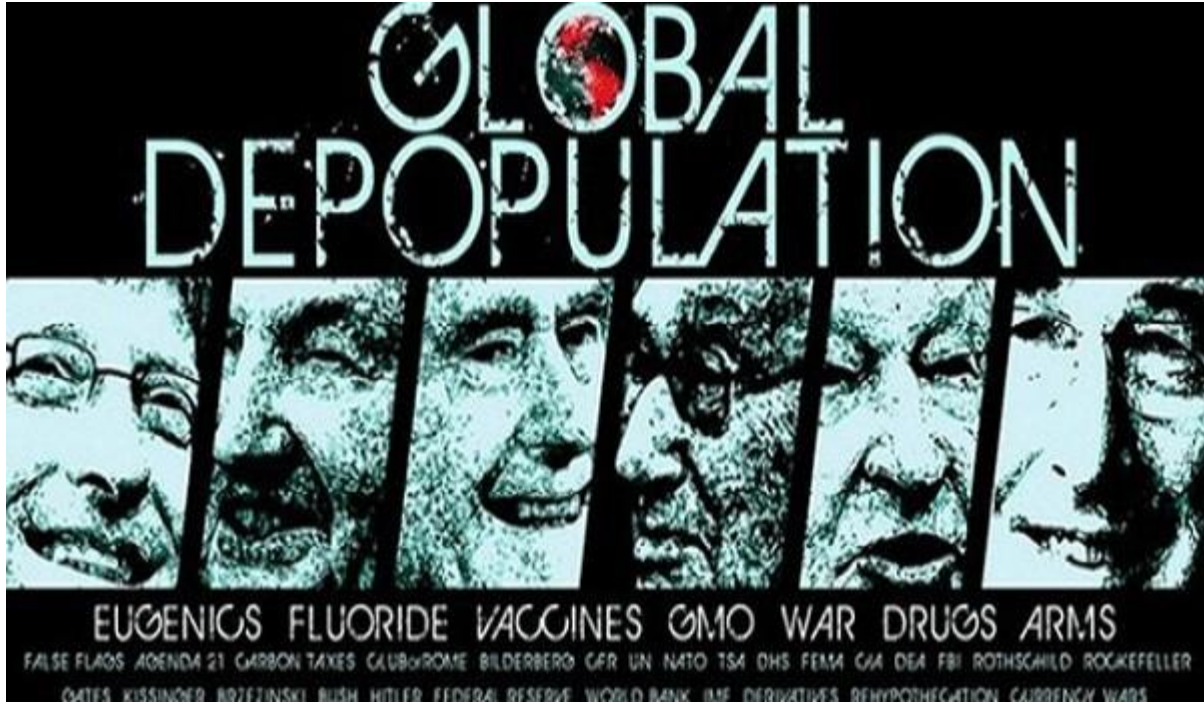
ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা টিকার বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক নিয়ে হেঁচকি করলেও ডলারের

লোভে সরকারগুলো টিকা কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় না। এসব টিকা কোম্পানীগুলো রাজনীতিবিদ, ডাক্তার, শিশু বিশেষজ্ঞ, সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের আমলাদের নানা রকম আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে হাত করে থাকে। সরকারী ডাক্তাররা অনেক ক্ষেত্রে এসব পাইকারী টিকাদান কর্মসূচীতে আগ্রহী না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের চাপে বাধ্য হয়ে করতে হয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পাইকারী টিকা কর্মসূচীর মাধ্যমে অজ্ঞ জনসাধারণকে বুঝানোর চেষ্টা করে যে, তাদের দল জনগণের কল্যাণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-তদ্বির করে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিভাগের ডাক্তার এবং আমলারা টিকা কোম্পানীর কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে সেখানে শিশুদের টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক করে আইন পাশ করিয়েছে। তারপরও সেখানে অনেকে আদালতের অনুমতি নিয়ে নিজেদের শিশুদের টিকা থেকে দূরে রাখেন। যেহেতু টিকা তৈরীতে বানর, শুকর, ইদুর, গিনিপিগ ইত্যাদি প্রাণীর রক্ত, মাংস ব্যবহৃত হয়, এজন্য অনেক বিজ্ঞ আলেম মুসলমানদের জন্য টিকা নেওয়া হারাম ঘোষণা করে ফতোয়া দিয়ে থাকেন। টিকা কোম্পানির কাছ থেকে আমেরিকান শিশু বিশেষজ্ঞরা যে বিপুল পরিমাণ কমিশন পান, তার লোভে জোর করে শিশুদের টিকা দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং টিকা না নেওয়া শিশুরা কোন রোগে আক্রান্ত হলে তাদেরকে চিকিৎসা করতে অস্বীকার করেন। এজন্য শিশুদের সাথে এবং তাদের অভিভাবকদের সাথে বর্বর আচরণ করতেও দ্বিধা করেন না। ফলে বিবেকবান লোকেরা এটিকে চিকিৎসার নামে স্বৈরতন্ত্র হিসেবে অভিহিত করেন। এই কারণে এসব শিশুরা সেখানকার হোমিওপ্যাথিক, ন্যাচারোপ্যাথিক, ইউনানী প্রভৃতি চিকিৎসকদের অধীনে চিকিৎসা নিয়ে বেশ ভালই থাকেন। টিকা কোম্পানি এবং

তাদের দালালদের এসব অমানবিক আচরণ ইদানীং সেখানে অনেক কমে এসেছে। কারণ ইদানীং টিকা নিয়ে মৃত্যুবরণ করা অথবা কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়া শিশুদের পিতা-মাতারা ফটাফট আদালতে মামলা ঠুকে দেন এবং আদালতও ঝটপট টিকা কোম্পানির কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা জরিমানা আদায় করে দেন।

লুই পাস্তুর জলাতঙ্কের টিকা আবিষ্কারেরও পঞ্চাশ বছর আগে আমেরিকান হোমিও চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডাঃ কন্সট্যান্টাইন হেরিং জলাতঙ্ক (Hydrophobia/Rabies) রোগের ভাইরাস থেকে জলাতঙ্কনাশী ঔষধ হাইড্রোফোবিনাম (Hydrophobinum/ Lyssinum) তৈরী করে জলাতঙ্ক চিকিৎসায়

সফলতার সাথে ব্যবহার করেছেন। বিজ্ঞানী কচ যক্ষ্মার টিকা আবিষ্কারেরও চার বছর পূর্বে ব্রিটিশ হোমিও চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডাঃ বার্নেট যক্ষ্মার জীবাণু থেকে ব্যাসিলিনাম (Bacillinum) নামক ঔষধ তৈরী করেছেন যা শতবর্ষ পরেও অদ্যাবধি যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধে কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ঔষধগুলি তৈরীতে সরাসরি রোগের জীবিত জীবাণু ব্যবহৃত হয় না, বরং ক্রমাগত ঘর্ষণের মাধ্যমে জীবাণুকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয় এবং খুবই সূক্ষ্মমাত্রায় শক্তিকৃত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই কারণে রোগ প্রতিরোধে এগুলো খুবই কার্যকর এবং এদের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নাই বললেই চলে। তাছাড়া এগুলো মুখে খেলেই চলে; ইনজেকশনের মতো নিষ্ঠুরতাও এতে নেই। তাই রোগ প্রতিরোধ বা টিকা নেওয়ার কথা চিন্তা করলে আমাদের হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ওপরই নির্ভর করা উচিত।



নোবেল বিজয়ী অস্ট্রিয়ার হোমিও চিকিৎসাবিজ্ঞানী জর্জ ভিথুলক্লাস মনে করেন, টিকা প্রথা ঔষধের প্রতি ব্যক্তির সংবেদনশীলতা বা সাসসেপটিবিলিটি নীতিকে লংঘন করে, এটি হোমিওপ্যাথির মূলনীতি বিরোধী এবং সমগ্র মানবজাতির স্বাস্থ্যকে অবনতির দিকে নিয়ে যায়। টিকা হলো নিষ্পাপ এবং অসহায় শিশুদের উপর একটি পৈশাচিক বর্বরতা। যেহেতু আমরা কেউ জানি না, আল্লাহ কোন শিশুর ভাগ্যে যক্ষ্মা-ডিপথেরিয়া লিখে রেখেছেন আর কোন শিশুর ভাগ্যে হুপিং কাশি-ধনুষ্টঙ্কার নির্ধারিত করে রেখেছেন; সেহেতু আন্দাজে আট-দশটি মারাত্মক রোগের জীবিত জীবাণু শিশুর অনুমতি ছাড়াই জোরপূর্বক তার শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়াকে একেবারেই অপ্রয়োজনীয় নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। টিকা নিলে শিশুর কোন না কোন ক্ষতি হবেই; হতে পারে তা ছোট কিংবা বড়। আবার টিকা নেওয়ার ক্ষতিটা প্রকাশ পেতে পারে কয়েক মিনিট, কয়েক ঘণ্টা, কয়েক দিন, কয়েক মাস, কয়েক

বছর এমনকি কয়েক যুগ পরে। অনেক জ্ঞানীব্যক্তি মনে করেন যে, শিশুদের রোগ মাত্রই মারাত্মক রোগ এমনটা ধারণা করা সঠিক নয়। তারা বিস্মিত হন এই ভেবে যে, শিশুদের ইমিউনিটি (Immunity) গঠনের জন্য এত কিছু করতে হবে কেন? বুকের দুধ এবং স্বাভাবিক খাবারই তাদের ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ শক্তি গঠনের জন্য যথেষ্ট। অনেক পিতা-মাতা প্রথমবার টিকা নেওয়ার পর শিশুর ওপর তাদের ক্ষতিকর ক্রিয়া লক্ষ্য করে ডাক্তারদের বললে (না জানার কারণে বা টিকার বদনাম হবে মনে করে) ডাক্তাররা সেটি টিকার কারণে হয়েছে বলে স্বীকার করেন না। ফলে ডাক্তারদের আশ্বাসে দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার টিকা নেওয়ার ফলে দেখা যায় শিশুর এমন মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যায়, যার আর কোন প্রতিকার করা যায় না।

যদিও বলা হয়ে থাকে যে, টিকা না নেওয়া শিশুরা টিকা নেওয়া শিশুদের জন্য বিপজ্জনক। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, টিকা নেওয়া শিশুরাই বরং অন্য শিশু এবং বয়স্ক লোকদের জন্য বিপজ্জনক। কেননা সম্প্রতি টিকা নেওয়া শিশুরা সে-সব রোগের জীবাণু তাদের শরীরে বহন করে থাকে, তাদের সংস্পর্শে এসে অন্য শিশুরা এবং বয়স্ক লোকেরা সে-সব রোগের আক্রান্ত হতে পারেন, বিশেষত যাদের ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল। আর এভাবেই ‘তথাকথিত’ অনেক মহামারী রোগের সৃষ্টি এবং বিস্তার করেছে টিকা নেওয়া শিশুরা; যদিও এজন্য দায়ী করা হয় টিকা না নেওয়া শিশুদেরকে। অন্যদিকে ঠিক একই প্রক্রিয়ায় টিকা না নেওয়া শিশুরা টিকা নেওয়া শিশুদের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট রোগের ইমিউনিটি লাভ করে থাকে। টিকার সমর্থকরা মনে করে থাকেন,

এভাবে সম্পূর্ণ ঝুঁকিমুক্তভাবে টিকা না নেওয়া শিশুরা উপকৃত হয়ে থাকেন। এটা একটি অদ্ভুত যুক্তি কেননা তারা একই সাথে বলে থাকেন যে, শিশুকে টিকা না দিয়ে তাদেরকে অতিমাত্রায় ঝুঁকির মধ্যে ফেলে রেখে সংশ্লিষ্ট পিতামাতা একটি দ্বায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ করে থাকেন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী পোলিও টিকা নেওয়া শিশুদের সংস্পর্শে আসার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর অন্তত দশ ব্যক্তি পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে চিরতরে পঙ্গু হয়ে থাকে। টিকার ব্যবসায়ের সবচেয়ে শয়তানী দিক হলো, এগুলো কিভাবে তৈরী করা হয় তা টিকা কোম্পানিগুলো বিস্তারিত প্রকাশ করে না। একচেটিয়া মাল কামানোর সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে ভেবে তারা এই গোপনীয়তা অবলম্বন করে। অথচ এ্যলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী, আয়ুর্বেদিকসহ পৃথিবীর সকল ঔষধেরই উৎপাদন প্রক্রিয়াতে কোন গোপনীয়তা নেই; এগুলো সবই একটি প্রকাশ্য বিষয়, সবার জন্য উন্মুক্ত।

ন্যাচারোপ্যাথিক ডাক্তারদের মধ্যে পরিচালিত একটি জরিপে দেখা গেছে যে, অধিকাংশ ন্যাচারোপ্যাথিক চিকিৎসক (Naturopathic Doctors) পাইকারী টিকা কর্মসূচীকে মনে করেন প্রাকৃতিক নীতিবিরুদ্ধ, অপ্রয়োজনীয় এবং বড়লোকী কারবার। ন্যাচারোপ্যাথিক চিকিৎসকদের এসোসিয়েশনের এক সাধারণ সভায় যে প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে, তাতে সুপারিশ করা হয়েছে যে, টিকা খুবই ক্ষতিকর এবং অদরকারী একটি বিষয় ; সুতরাং এসব বর্জনের জন্য শিশুদের পিতামাতাকে উৎসাহ দিতে হবে। শিশুদের অস্বাভাবিক সামাজিক আচরণ বা বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিত্ব অর্থাৎ অটিজমের একটি মূল কারণ যে এই টিকা, এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যপ্রমাণ সম্বলিত মোটামোটা বই-পুস্তক ইউরোপ-আমেরিকার বইয়ের দোকানগুলোতে দেখতে

পাবেন। মেনিনগোকক্কাল মেনিনজাইটিসের টিকা নেওয়ার পরে যখন খবর পাওয়া গেলো যে, অনেক লোক গুলেন-বেরি সিনড্রোমে (Guillain Barré Syndrome) আক্রান্ত হয়ে প্যারালাইসিস বা মৃত্যুর শিকার হচ্ছে, তখন ফ্রান্স সরকার সেটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। টিকার ক্ষতিকর দিক নিয়ে আজ পর্যন্ত যত গবেষণা হয়েছে, সেগুলো বিস্তারিত অধ্যয়ন করলে যে কারো এমন ধারণা হতে পারে যে, আধুনিক যুগে মানুষ এবং গৃহপালিত পশু-পাখিদের যত রোগ হয়, তার শতকরা নিরানব্বই ভাগ রোগই বুঝি এই টিকার কারণেই হয়। হ্যাঁ, সত্যি তাই ; এমন মনে হওয়াটা মিথ্যে নয়। সম্প্রতি ল্যানসেট (Lancet) নামক একটি বিখ্যাত মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রবন্ধে দাবী করা হয়েছে যে, তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলো জাতিসংঘের কাছ থেকে বেশী বেশী আর্থিক সাহায্যের আশায় তাদের দেশের শিশুদের বেশী বেশী টিকা নেওয়ার মিথ্যা তথ্য দিয়ে থাকে। শেষকথা হলো, রোগমুক্ত থাকার জন্য যে-সব শর্ত আমাদের মেনে চলা উচিত তা হলো- পুষ্টির খাবার গ্রহন করা, পর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করা এবং শরীরের জন্য ক্ষতিকর বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকা। অন্যথায় আপনি হাজার বার টিকা নিয়েও রোগের হাত থেকে নিস্তার পাবেন না। আসুন আমরা সবকিছু সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি এবং এভাবে নিজেদেরকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করি।

নিচে দেয়া এসব লিংকে গিয়ে জানুন টিকার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ঃ-

<http://www.thinktwice.com>

<http://www.909shot.com>

<http://www.vaclib.org>

<http://www.novaccine.com>

<http://www.vaproject.org>

<http://www.jabs.org>

<http://www.vacinfo.org>

আকিকা Vs টিকা :

টিকাঃ পোলিও টিকা বা বিভিন্ন টিকা যেমন ধুনুস্তঙ্কার / পলিও/ যক্ষ্মা , হাম বসন্ত

টিকা দেয়া হয়ে থাকে শিশুরা যেন এই সব রোগ থেকে দূরে থাকে ।

আকিকাঃ আকিকা দিয়ার মাধ্যমে শিশুর শারীরিক সকল প্রকার রোগ মুক্ত হয়।
রোগের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা জন্য দেয়া হয় আকিকা.

তাহলে আকিকা আর টিকা ২ তার উদ্দেশ্য একই । একটি হল সর্ব শ্রেষ্ঠ বেত্তি
মহানবির দেয়া নিয়ম , আরাকটি আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণা বের করা কিছু

প্রতিষেধক যার মাধ্যমে শিশু ভবিষ্যতের রোগ মুক্ত থাকবে ।

তাহলে এই দুই দিক বিবেচনায় অবশ্যই যিনি সর্ব শ্রেষ্ঠ বেত্তি মহানবির নিয়ম
সেটাই BEST.

Adv: আকিকার মাধ্যমে পশু জবাই রক্ত প্রবাহের দারা আল্লাহর কাছে সকল
নিরাপত্তা লাভ করে শিশু ।

রাসুল (সাঃ) বলেন ,

সামির ইবনে জনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসুল (সাঃ) বলেন ,

প্রত্যেক শিশু তার আকিকার বিনিময়ে আল্লাহর কাছে বন্ধকস্বরূপ থাকে। কাজেই সপ্তম দিনে তার পক্ষ হতে কুরবানি করবে এবং তার মাথা মুন্দন করে নাম রাখবে

| আবু দাউদ ২৭২৯

এই হাদিসে স্পষ্ট যে আকিকার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে শিশু নিরাপত্তা লাভ করে যে জিনিসের মাধ্যমে পূর্ণ ভাবে শিশু নিরাপত্তা পাচ্ছে সেখানে অন্য পদ্ধতি কেন দরকার?

হ্যাঁ টিকা জদি ভাল দিক থাকে তবে দরকার আছে | সব কিছু ত আল্লাহ আমাদের জন্যই করেছেন , তাহলে প্রশ্ন হল,

মানুষের তৈরি টিকার ভাল দিকের পাশাপাশি সমস্যা বা ক্ষতিকর দিক কোথায় ?

মানুষ যখন এই টিকা আবিষ্কার করে তখন শিশুর সু স্বাস্থ্য কথা ভেবে আর

ভবিষ্যতের ভালোর দিক চিন্তা করেই এই টিকার আবিষ্কার |

এই টিকা গুলা প্রচলন /আবিষ্কার প্রচার সব করে পশ্চিমারা |

টিকার ভয়ংকর ক্ষতিকর কিছু দিক

নাইজেরিয়ার ডা. হারুনা কায়েটা আজ থেকে আট বছর আগে ২০০৪ সালে তিনি মন্তব্যটি করেছিলেন। নাজেরিয়ান ফার্মাসিউটিক্যালস সাইন্টিস্ট ডা. হারুনা কায়েটার

সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, শিশুদের

খাওয়ানোর পোলিও টিকায় প্রথমত রয়েছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রজনন ক্ষমতা

চিরতরে নষ্ট করে দেয়ার উপাদান। দ্বিতীয়ত, বিগত নয় বছর ধরে গোটা পৃথিবীতে

লাখ লাখ শিশুকে খাওয়ানো পোলিও টিকায় ক্যান্সারের ভাইরাস মেশানো হচ্ছে এবং তৃতীয়ত, ওরাল পোলিও টিকা পঙ্গুত্ব প্রতিরোধের পরিবর্তে পঙ্গুত্বের জন্য দায়ী প্রমাণিত হওয়ায় আমেরিকা, বৃটেন ও কানাডায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এত ক্ষতিকর দিক থাকার পর ও প্রতিষেধকের এই সব নিউজ কর্মসূচি বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের লক্ষ লক্ষ শিশুকে খাওয়ানো হচ্ছে.

আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এইডস সহ নানা জিবানু যুক্ত রোগ এই সব টিকা কর্ম সুচির মাধ্যমে যে এই সব দেশ কে ধংস করে দেয়া গোপন আজেন্দা হতে পারে তা অনেকটাই পরিষ্কার

পাকিস্তানের প্রথম সারির জাতীয় পত্রিকা ডেইলি উম্মতঃ ইউনিসেফ'র পক্ষ থেকে পোলিও নির্মূলে শিশুদেরকে টিকা খাওয়ানোর কর্মসূচি প্রকৃতপক্ষে শিশুদের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়ারই পরিকল্পনা।' এটি কোনো 'চরমপন্থী মোল্লা' কিংবা কূপমণ্ডুক রক্ষণশীল ব্যক্তির উক্তি নয়।

সর্বের ভেতরেই ভূত/ অর্থাৎ পোলিও টিকা খাওয়ানো কারনে লক্ষ্য

ভারতের শিশু পলিও তে আক্রান্ত

কিছুদিন আগে ইন্ডিয়ায় পরিচালিত এক অনুসন্ধানী রিপোর্ট শিশুদের খাওয়ানোর পোলিও টিকা এর সামনে মস্তবড় এক প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

দেশটিতে এ বিষয়ে ৪৭ হাজার ৫০০ সমস্যার ঘটনা সামনে আসে। এসব ঘটনায় শিশুদের পোলিওর মতো ধ্বংসাত্মক রোগের বিষয়টি উঠে এসেছে। গুরুতর ব্যাপার হল, এ শিশুদের মধ্যে পঙ্গুত্বের দিকে ঠেলে-দেয়া পোলিও রোগের উপসর্গ লক্ষ্য করা গেছে। যাদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে পোলিও টিকা খাওয়ানো হচ্ছিল। যাতে প্রমাণিত হয় যে, খোদ পোলিও টিকার মধ্যেই রোগটির উপাদান রয়েছে। এ যেন সর্বের ভেতরেই ভূত!



অতিতে রয়েছে পলিও টিকার মাদ্ধমে মারাত্মক মানুষের মস্তিষ্ক, অন্ধ্র ও হাড়ের ক্যান্সার সৃষ্টি ঘটনা।

১৯৫৪/ ১৯৬৩ সালের মধ্যে গোটা বিশ্বের শিশুদের উপর প্রয়োগ করা পোলিও ভ্যাকসিন-এ ঝাঠ-৪০ নামের ভাইরাস মেশানো ছিল। যা মানুষের মস্তিষ্ক, অন্ধ্র ও হাড়ের ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। যদিও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা ১৯৬০ সালে শনাক্ত করতে সক্ষম হন যে, বানরের ঘাড় থেকে তৈরি করা পোলিও ভ্যাকসিনে ঝাঠ-৪০ ভাইরাস রয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলো বিষয়টি তখন থেকে ধামাচাপা দিতে তৎপর ছিলো।

পোলিও টিকা এই সব ক্ষতিকর দিক গবেষণা করে অনেকে এই টিকার বিরোধী/ তার মতামত দেয় যে

১/ পোলিও টিকা মেয়েদের বন্ধ্যা এবং ছেলেদের প্রজনন ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস করে দেয়।

২/ দ্বিতীয় অভিযোগ, এই টিকা রোগটি প্রতিরোধ তো দূরের কথা নিজেই রোগটি সৃষ্টির উপাদান বহন করে।

৩/ আর তৃতীয় অভিযোগটি সবচে' ভয়ানক পোলিও টিকা মানবদেহে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে!

উপরে এই ৩ কারনের ব্যাখ্যা সত্যতা বিষয়ে অকাট্য তথ্য-প্রমাণসমৃদ্ধ একাধিক প্রবন্ধ ইন্টারনেট এবং বইপত্র রয়েছে।

এখন সারা বিশ্বে পোলিও টিকা প্রয়োগের দু'রকমের পদ্ধতি চালু আছে। এ ছাড়া ভিটামিন ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় এই সব কর্ম সুছি দেয়া হয় WHO

এর দারা | তাদের নিয়ন্ত্রন করে ইয়াহুদি / খ্রিষ্টানরা | যারা ইসলামের ঘোরতর শত্রু |

ভিন্ন দেশের নিরপেক্ষ ও নীতিনিষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানী যারা পোলিও টিকার পরীক্ষা চালিয়েছেন তারা সবাই এতে মানবদেহের জন্য উল্লিখিত মারাত্মক ক্ষতিকর উপাদানগুলো শনাক্ত করেন। যা নিঃসন্দেহে ভয়ঙ্কর কিন্তু এই সব ইনফর্মেশন গোপন করে রাখা হয়েছে ,

তাঁদের কণ্ঠ চেপে রাখা হয়েছে/ আর অন্য দিকে এই সব কর্ম সূচি পালনে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে...

আমাদের দেশের কথা ভাবুন এখানে vitamin a capsul , সহ নানা কিছু দেয়া হয় যা আমাদের শত্রু দেশ ভারত থেকে আনা হয় ।

এই সব টিকার প্রভাবে সিলেটে কয়েক বসর আগে ৩০+ শিশু মারা যায় | এর বাহিরে এই বসর যার প্রভাবে Roto virus সহ নানা কিছু সমস্যা ধরা পড়ছে শিশুদের ।

যেহেতু ভারত ইয়াহুদির দালাল সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে ভারতের এই সব

vitamin a capsul , সহ নানা কিছু আমাদের দেশে শিশু কে পঙ্গু করে

দেয়া, সহ নানা ভাইরাস জনিত রোগের গোপন প্লান এজেন্দা থাকতে পারে ।

এই সব টিকার ডোজ শিশুদের উপর প্রভাব ফেলে নানা অঙ্গ অরগ্যানের ক্ষতি

করে । আর এত ভিটামিন ঘারতি সব শিশুর এক না সবার এক হয় না।

সুতরাং আকিকা দেয়া উত্তম এই গুলা থেকে। আর বিভিন্ন ভিটামিন ঘাড়টির জন্য
পরিমিত পুষ্টিকর খাবার ফল যথেষ্ট

“যে ব্যক্তি তার সন্তানের আকীকা করতে চায়, সে যেন উহা পালন করে”।

(আহমাদ ও আবু দাউদ)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেনঃ (كل غلام رهينة بعقيقته) অর্থ: প্রতিটি সন্তানই

আকীকার বিনিময়ে আটক থাকে”। (আহমাদ, তিরমিজী ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থ)

□ □ => পোলিও টিকার প্রকাশিত উপাদানের একটি হল ঞবিবহ ৮০। ‘টুইয়েন
এইটি’ সম্পর্কে আপনি ইন্টারনেটে প্রচুর বিশ্বস্ত ওয়েবসাইট পাবেন। ঞবিবহ ৮০
গুগলে লিখে সার্চ দিলে আপনি এর গুণাগুণ সম্পর্কে বহু তথ্য-উপাত্ত পেয়ে
যাবেন। এটি প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস করার পাশাপাশি মেয়েদের গর্ভধারণ ক্ষমতাকেও
নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

ডা. হারুনা কায়েটা ভারতের ল্যাবরেটরী বিশেষজ্ঞদের সামনেই পোলিও টিকার
নমুনাগুলো টেস্ট করেন। সবচেয়ে বড় কথা হল পরীক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য
সংস্থা কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় ওরাল
ভ্যাকসিনে মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর উপাদান রয়েছে।



ডা. হারুনা কায়েটা নিশ্চিত হন,

১/ নাইজেরিয়াকে পোলিও মুক্ত করার নামে ইউনিসেফ প্রকৃতপক্ষের আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিভিন্নভাবে পঙ্গু করে ফেলার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

২/ ' সাপ্তাহিক ট্রাস্টের সাংবাদিক কে ডা. হারুনার বলেন কাছে জানতে চান যে, ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক কোম্পানি এতে ক্ষতিকারক উপাদান মেশাবে তিনটি কারণে এক. প্রস্তুতকারক কোম্পানি ও এর প্রমোটকারীদের কোনো গোপন অ্যাজেন্ডা রয়েছে।

এর সমান্তরালে তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ হতে পারে। আর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মানে বুঝে ফেলা জায় ইহা মূলত ইয়েয়াহুদি গোপন সংস্থা দ্বারা মুসলিম সংস্থা হ্রাস

| মুসলিমদের পঙ্গু করতে এই কাজ করে |

ডা. হারুনা কায়েটা বলেন , আমাদের ভেতর থেকে অ্যাজেন্ট পেয়ে যায় ঐ সব সংস্থা।

আর এই সব কিছু থেকে প্রমানিত | টিকাতে কিছু রোগ প্রতিরোধ প্রতিশোধক থাকলেও ইহা দেহের জন্য ক্ষতি আর মসুলিমদের জন্য ক্ষতি করতে গভির ষড়যন্ত্র লিপ্ত |

এই সব টিকার আগে কি মানুষ সুস্থ থাকতনা বা অবশই থাকত | যেহেতু এটা রিস্কি, & এর উদ্দেশ্য খুব ভাল না, সেহেতু দূরে থাকাই উত্তমা আপনার ত আছেই **Protection**, আকিকা |

সুতরাং ভালর স্বার্থে আকিকাই যথেষ্ট সুতরাং আপনার বাচ্চার সুস্থতার জন্য আকিকা দিন এবং টিকাকে বর্জন করুন।

টিকা নিলেও সমস্যা, না নিলেও সমস্যা। করণীয় কি?

আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো টিকার অসারতা সম্পর্কে জেনে ফেলেছি। তাই অনেকেই নিয়ত করেছেন নিজের সন্তানকে টিকা দিবেন না। এখন এ ব্যাপারে আপনাদের সাথে বাস্তব কিছু উপকার ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবো, যেন আপনাদের সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হয়।

উপকার:

অনেকেই ভয়ে আছেন টিকা না দিলে কোনো ক্ষতি হবে কিনা? ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। মিডিয়া আমাদের ব্রেন ওয়াশড করে দিচ্ছে। যেমন এখন করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে সবাইকে আতংকিত করে রেখেছে। তাই আমরা মনে করি বাচ্চাকে টিকা না দিলে বিভিন্ন রোগ হতে পারে। ভুল। একদম ভুল চিন্তা ধারা। বরং

টিকা দিলেই আপনার বাচ্চার শরীরে আরো অনেকগুলো রোগের জীবাণু প্রবেশ করবে। আর টিকা না দিলে বাচ্চার কোনো ক্ষতি হবে না ইংশাআল্লাহ। বরং আপনার বাচ্চা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি সুস্থ, সবল, মেধাবী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকবে। দেখবেন টিকা নেয়া বাচ্চা গুলোর রোগ লেগেই থাকে।

এটা স্পষ্ট একটা যরযন্ত্র। তারা মুসলিম উম্মাহকে পঙ্গু করে দিতে চায়। বিল গেটস সহ এলিটরা কেউই এসব টিকা নেয় না। এ ব্যাপারে অনেক দলিল আছে অনলাইনে। এটা তো একটা কমন সেন্স আপনার এখন কোনো জ্বর বা কোনো অসুখ নেই। অথচ আপনি জ্বর আসতে পারে (যদিও কোনো লক্ষণ এখনো দেখা যায় নি) এ ভয়ে এখনই জ্বরের বা ডায়রিয়ার ঔষধ খেয়ে বসে আছেন। আপনার বাচ্চাকে আল্লাহ তাআলাই সমস্ত রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা দিয়েই পাঠিয়েছেন। টুকটাক ছোটোখাটো অসুখ গুলো আল্লাহর ইচ্ছায় প্রাকৃতিক ভাবেই সেড়ে যায়। কথায় কথায় ডাক্তার আর ঔষধের দিকে দৌড়ানোর অভ্যাস ভালো না। আল্লাহর উপর ভরসা করে প্রাথমিক সুনাহ চিকিৎসা (মধু, কালিজিরা তুলসী পাতা ইত্যাদি) নেয়ার অভ্যাস করুন। এক্ষেত্রে তিব্ব নববী কিতাবটা অনুসরণ করতে পারেন।

সমস্যা সমূহ ঃ

আপনার বাচ্চাকে টিকা না দিলে সর্বপ্রথম আপনার নিজের পরিবার ও আত্মীয় স্বজন থেকেই বাধাগ্রস্ত হবেন। তারা আপনাকে বিভিন্নভাবে পেরেশান করবে। কম বেশি সবাই আপনাকে কথা শুনাবে। এক্ষেত্রে আপনার ধৈর্য ও তাওয়াক্কুল থাকতে হবে। নয়ত টিকতে পারবেন না।

এরপর আরও সমস্যায় পরবেন ডাক্তার দেখাতে ও জন্ম সনদ বানাতে গিয়ে। টিকা কার্ড ছাড়া ডাক্তার আপনার বাচ্চাকে দেখতে চাবে না। আবার জন্ম সনদও দিবেনা। এক্ষেত্রে আপনাকে স্বাস্থ্য কর্মীর সাথে বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে একটা ফেক টিকা

কার্ড বানিয়ে রাখতে হবে। ব্যাস, কোনোরকমে ৩/৪ বছর পার করতে পারলে আর কোন সমস্যা হবে না ইংশাআল্লাহ। তবে বারবার বলি ইমান মজবুত না হলে আপনি এ যুদ্ধে টিকতে পারবেন না।

হামেলা মা দেরকে যে টীকা দেয়া হয়, সেটাও নিস্প্রয়জনা ওটা থেকেও বেঁচে থাকার চেষ্টা করবেন। ঘরে নরমাল ডেলিভারি করানোর চেষ্টা করবেন।

হামেলা (প্রেগন্যান্ট) অবস্থায় তালিম, তেলয়াত, জিকির, পর্দা ও স্বাস্থ্যসম্মত (বিশেষ করে খেজুর) খাবার খাবো। জাঙ্ক ফুড এড়িয়ে চলবো। টিভি, মিউজিক, গিবত থেকে ১০০ হাত দূরে থাকবো। তাহলে, আল্লাহ সব কিছুকে সহজ করে দিবেন। এবার সিদ্ধান্ত আপনার। আপনি কনফিউসনে থাকলে এস্তেখারা নামাজ পরে নিতে পারেন। আল্লাহ আপনাদের সহায় হন। আমিন।

বিঃ দ্রঃ আমি মোটেও এ কথা বলছি না যে, আপনারা একেবারে ডাক্তার দেখানো বা চিকিৎসা নেয়া ছেড়ে দেন। বলতে চেয়েছি টীকার মত ষড়যন্ত্র গুলকে বুঝতে শিখুন এবং এই ফাদ থেকে বেঁচে থাকুন।

আল্লাহ আপনি আমাদেরকে দাজ্জালের ফেত্না থেকে হেফাজত করুন, আমিন।

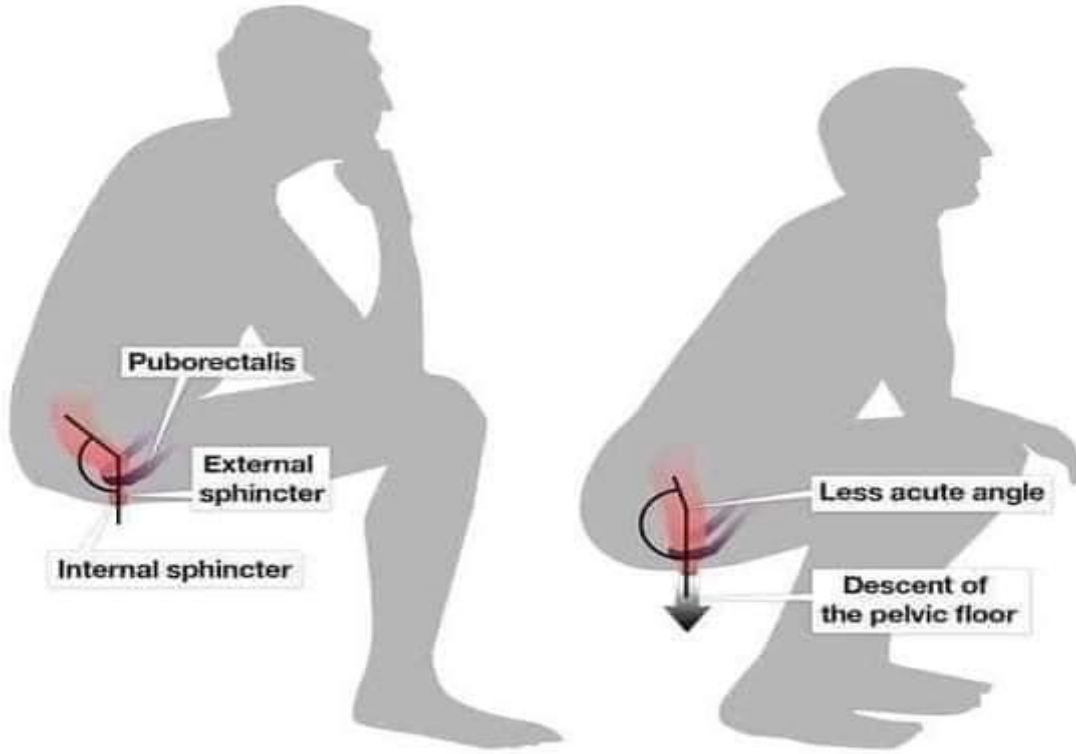
এস্তেঞ্জা, লজ্জাহুনের রোগব্যাধির কারণ (সুন্নাহ বনাম আধুনিকতা):

কোলন_ক্যান্সার:

বলিউডের ইরফান খানের পরে; হলিউডের চ্যাডউইক বোসম্যান মারা গেলেন

কোলন ক্যান্সারে। কোলন ক্যান্সারের অন্যতম কারণ দ্রুত মলত্যাগ করা ও মলত্যাগ

করতে বসার পদ্ধতি। প্রচলিত লো-কমোড ওয়াশরুমের চেয়ে হাই-কমোড/সিটিং কমোডে কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে। সিটিং কমোডে পায়ুনালী সোজা না হয়ে, বাঁকানো থাকে। ফলে পরিপূর্ণভাবে মলত্যাগ হয় না। যা ক্ষতের সৃষ্টি করে, ইহা পর্যায়ক্রমে ক্যান্সারে পরিণত হতে পারে। বিলাসিতার জন্য সিটিং কমোড এখন বহুল ব্যবহৃত হয়, তবে পায়ুনালী সোজা রাখতে পায়ের তলায় প্লাস্টিকের টুল ব্যবহার করতে পারেন।



বিঃদ্রঃ এখানে কোনো হাসির কথা বলা হয়নি, এটা সকলেরই জানা প্রয়োজন।

Courtesy : School of Engineers

RM: আল্লাহর রাসূল(স:) যখন সাহাবাদেরকে (রা:) এস্তেঞ্জার নিয়ম কানুন শিক্ষা দিতেন, তখন এটা নিয়ে কাফিররা ট্রল করতো। অথচ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ। উপরে আপনারা হাই কমোডের (আধুনিকতার) ফলাফল দেখলেন। এবার আসুন দেখি ইসলাম আমাদেরকে এ ব্যাপারে কি শিক্ষা দিয়েছে?



টয়লেট ব্যবহারে সঠিক নিয়ম:

১. টয়লেটে প্রবেশের পূর্বে এই দু'আ পড়া-

(দু'আ)

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজুবিকা মিনাল খবছি ওয়াল খাবাইছা

২. জুতা পরিধান করে মাথা ঢেকে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা।

৩. বাম দিকে ভর দিয়ে বসা।

৪. কথা-বার্তা, দু'আ-কালাম, জিকির-আযকার ইত্যাদি মুখে উচ্চারণ না করা।

৫. অপ্রয়োজনে লজ্জাস্থানে ডান হাতে স্পর্শ না করা।

৬. কিবলার দিকে মুখ ও পিঠ করে না বসা।

৭. পাথর, মাটির টিলা বা টয়লেট পেপার বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহারের পর পানি ব্যবহার করা।

৮. দাঁড়িয়ে বা হেলান দিয়ে বা বিবস্ত্র হয়ে এস্তেঞ্জা করা মাকরুহ।

৯. কবরস্থান, গোসলখানা, রাস্তার পাশে, ছায়াদার ও ফলগাছের নিচে এস্তেঞ্জা করা মাকরুহ।

১০. ডান পা দিয়ে বের হয়ে এই দু'আ পড়া-

(দু'আ)

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহ হিল্লাজী আজহাবা আন্নিল আযা ও-আফানী।

বর্তমানের আধুনিকতায় গা ভাসিয়ে দেয়া মানুষগুলো এস্তেঞ্জার সুন্নাহ মানছেন না বলে,

লজ্জাস্থানের বিভিন্ন রকমের রোগে ভুগছে। তাই এসব ব্যাপারে আমাদের

সকলেরই যত্নশীল হওয়া উচিত।

N:B: মুত্তাকীদের উচিত, হাই কমোডকে উপেক্ষা করে লো কমোডের প্রতি বেশি

গুরুত্ব দেয়া।

মেসওয়াক (বিজ্ঞান / সুন্নাহ) VS টুথপেস্ট ও টুথব্রাশ (অপবিজ্ঞান):

ফ্লোরাইড এক ধরনের বিষ, এটা হিটলারের বিজ্ঞানীরা নাজি বন্দী শিবিরগুলোতে বন্দীদের উপর প্রয়োগ করে সফলতা অর্জন করেছিল। এটা যেটা করে আমাদের মস্তিষ্কের পিটুইটারী গ্লান্ড বা আমরা যেটাকে তৃতীয় নয়ন বলে থাকে স্পিরিচুয়াল জগতে ঢোকান পথ যেটা সেটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

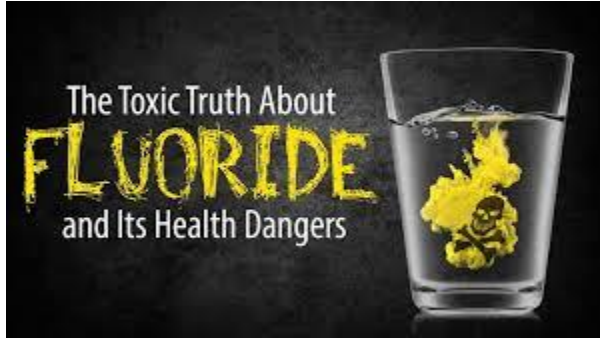


তারা মেডিকেল এডুকেশনে ডাক্তারদের শেখাল ফ্লোরাইড আসলে দাঁতের সুরক্ষায় ভাল কাজ করে। এবার তাঁরা টুথপেস্টে ফ্লোরাইড মেশানো শুরু করল। আমাদের দাঁতের সাথে মস্তিস্কের কানেকশন একেবারে সরাসরি। প্রতিটি দাঁতের সাথে সুক্ষ সুতার মত নার্ভগুলো ব্রেইনের সাথে কানেক্টেড। এ কারনে তৃতীয় নয়ন বা পিটুইটারী গ্লান্ডের সাথে দাঁতের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

১৯৩৮ সালে ড. এইচ ট্রেম্ভলি ডিন নামের এক আমেরিকান দন্ত বিশেষজ্ঞ দাবি করে যে খাবার পানিতে ফ্লোরাইডের উপস্থিতি দাঁতের ক্ষয়রোধে সাহায্য করে। ব্যস, উন্নত দেশগুলো সব পানিতে ফ্লোরাইডযুক্ত করতে থাকে। ব্যবসায়ীরা টুথপেস্ট, টুথপাউডারে যোগ করতে থাকে ফ্লোরাইড। কিন্তু ধীরে ধীরে এর বিষক্রিয়া টের পাওয়া যেতে থাকে। শুরু হয় গবেষণা। এই বিষয়ে সবচেয়ে বড় গবেষণাটি হয় ১৯৮৬-৮৭ সালে আমেরিকাতে। বেরিয়ে আসে ভয়ানক সব তথ্য।

গবেষণায় দেখা যায় ফ্লোরাইড দাঁতের ক্ষয়রোধে তেমন কোন ভূমিকা তো রাখেই না বরং জন্ম দেয় হাজারটা সমস্যার। ফ্লোরাইডে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় দাঁত ও হাড়।

দাঁতে ফ্লোরোসিস দেখা দেয়। এতে এনামেলের মসৃণ স্তর নষ্ট হয়ে যায়, দাঁতের রং নষ্ট হয়ে যায়, ছোপ ছোপ দাগ দেখা দেয়, সর্বোপরি দাঁত ভঙ্গুর হয়ে যায়। এর মাত্রা বেশি হলে দাঁতে ফ্লোরোসিসের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।



ফ্লোরাইড প্রজনন ক্ষমতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফ্লোরাইডের উপস্থিতিতে অ্যালুমিনিয়ামের জৈবিক প্রভাব বেড়ে যাওয়ার কারণে মস্তিষ্কে অ্যালুমিনিয়াম সঞ্চিত হওয়ার পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যায় যা অ্যালযাইমার্স (বিস্মরণ রোগ) রোগটিকে ত্বরান্বিত করে বলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন। এছাড়া ফ্লোরাইডের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতির কারণে শরীরের বেশ কিছু এনজাইমের কার্য ক্ষমতায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। ফলে দেখা দিতে পারে স্নায়বিক দুর্বলতা।

ফ্লোরাইডের সরাসরি সংস্পর্শে এলে শরীরের কোষকলা ধ্বংস হতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে বা মুখ ও ত্বকের মাধ্যমে বেশিমাাত্রায় ফ্লোরাইড গ্রহণ শ্বাসতন্ত্র, পাকস্থলী ও ত্বকে উত্তেজনা সৃষ্টি করে ক্ষতি সাধন করতে পারে। ফলে কালো পায়খানা, রক্তবমি, বেহুঁশ হওয়া, বমি বমি ভাব লাগা, অগভীর শ্বাস-প্রশ্বাস,

পাকস্থলীর পেশিতে খিঁচুনি বা ব্যথা, কাঁপুনি, অস্বাভাবিক উত্তেজনা, লালা নিঃসরণ অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়া, দুর্বলতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, ক্ষুধামন্দা, ত্বকে র্যাশ দেখা দেওয়া, মুখে অথবা ঠোঁটে ক্ষত বা অসাড়তা, ওজন কমা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

রাসুল সা: বলেছেন, “আমি দুইটা জিনিস ফরয করলাম না উম্মতের কষ্ট হবে বলে, একটি হল তাহাজ্জুদের নামায এবং আরেকটি হল মেসওয়াক।” মেসওয়াক এতই গুরুত্ব রাখে। কেন রাখে সেটা তো বললাম। আপনার নিজেরা চাক্ষুস প্রমাণ হাতে নাতেই পাবেন যদি আজ থেকে আপনারা টুথপেস্ট বাদ দিয়ে মেসওয়াক শুরু করেন। ১২০ দিনের মাথায় যে পরিবর্তন আপনারা নিজেদের ভিতর দেখতে পাবেন তার জন্য আপনারা আমাকে পরে ধন্যবাদ দিয়েন। এজন্য হাদিসে বলা হয়েছে মেসওয়াক করে সালাত পড়লে সে সালাতের মর্তবা ৭০ গুন বৃদ্ধি পায়। মর্তবা বলতে এখানে আপনার সংযোগ বা স্পিরিচুয়াল উচ্চতা বোঝানো হয়েছে। যাদের পড়া মুখস্ত হয় না স্বরন শক্তি কম তারাও জাদুকরী ফল লাভ করবেন এটাতে ১০০ %। কিন্তু শর্ত হল সুনত মেনে মেসওয়াক করতে হবে। যারা অবিশ্বাস করছেন তাঁরাও করে দেখতে পারেন ফলাফল হাতে নাতে পেয়ে যাবেন।

মেসওয়াক যেভাবে করতে হয়

>> মুখের ডানদিক থেকে মেসওয়াক শুরু করা।

>> দাঁতের প্রস্থের দিক থেকে মেসওয়াক করা। অর্থাৎ দৈঘ্যের দিক থেকে (উপর-নিচে) নয়।

>> ডান হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলী মেসওয়াকের নিচে রেখে আর তর্জনী, মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুল মেসওয়াকের ওপর রেখে বৃদ্ধাঙ্গুলীর পেট দ্বারা ভালভাবে ধরা।
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ নিয়মটি বর্ণিত রয়েছে।



মেসওয়াকের উত্তম সময়গুলো হলো-

- >> ঘুম থেকে ওঠার পর মেসওয়াক করা।
- >> অজুতে কুলি করার আগে মেসওয়াক করা। অনেকে ওজুর শুরু করার আগে মেসওয়াক করার কথা বলেছেন।
- >> নামাজ আদায়ের আগে মেসওয়াক করা।
- >> কুরআন-হাদিস পড়ার আগে মেসওয়াক করা। কুরআন-হাদিস পড়ার আগে মেসওয়াক করাকে অনেকে মুস্তাহাব বলেছেন।
- >> মানুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের আগে মেসওয়াক করা।
- >> কোনো মজলিসে যাওয়ার আগে মেসওয়াক করা।
- >> ঘরের প্রবেশ করে মেসওয়াক করা।
- >> মুখে দুর্গন্ধ ছড়ালে মেসওয়াক করা।

>> দাঁতে হলুদ আবরণ বা ময়লাযুক্ত হলে মেসওয়াক করা।

>> ক্ষুধা লাগলে মেসওয়াক করা।

>> জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে মেসওয়াক করা।

পরিশেষে...

মেসওয়াক করার ফলে মানুষের দারিদ্র্যতা দূর হয়ে সচ্ছলতা আসে এবং উপার্জন

বাড়ে। পাকস্থলী শক্তিশালী হয়, জ্ঞান ও স্মরণ শক্তি বাড়ে, কুলুষ্কমুক্ত অন্তর তৈরি

হয়, ফেরেশতারা মেসওয়াককারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। সর্বোপরি মেসওয়াকের ফলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে উল্লেখিত নিয়মে ও সময়ে মেসওয়াক করার

তাওফিক দান করুন। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় আমলটি বেশি

বেশি করার তাওফিক দান করুন। হাদিসে ঘোষিত ফজিলত ও উপকারিতা লাভের

তাওফিক দান করুন। আমিন।

অপবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার বিকল্প ইসলামিক (সুন্নাহ) চিকিৎসা:



নববী চিকিৎসা: কিছু প্রয়োজনীয় আলোকপাত

আত তিব্ব আননাবাবী বা নববী চিকিৎসা কী? এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। নববী চিকিৎসা বললে আমাদের মাথায় সাধারণত আসে মধু, কালোজিরা, হিজামা ইত্যাদি বিশেষ কিছু বিষয়ের কথা। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের চিকিৎসা বিষয়ক বক্তব্যগুলো দেখলে আমরা দেখতে পাই এর পরিসর আরো অনেক বিস্তৃত। আমার যেটা মনে হয়েছে, নববী চিকিৎসা মানে হলো কুরআন ও হাদীসে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সামগ্রিক নির্দেশনাসমূহ।

এর মাঝে কিছু আছে মানুষের অভিজ্ঞতা ও গবেষণায় আবিস্কৃত বা আবিস্কৃত হতে যাচ্ছে এমন সাধারণ চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে মূল্যায়ন, মন্তব্য, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা। যেমন, মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে আছে—এক বেদুইন সাহাবী এসে জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা কি চিকিৎসা গ্রহণ করবো? তিনি বললেন, আল্লাহর বান্দারা, চিকিৎসা নাও। আল্লাহ তাআলা যে রোগই দিয়েছেন, সাথে তার ওষুধও দিয়েছেন। শুধু একটি রোগ ছাড়া। জিজ্ঞেস করা হলো, সে রোগ কোনটি? তিনি বললেন, মৃত্যু। (মুসনাদে আহমদ)

সহীহ মুসলিমের অন্য এক হাদীসে আছে—প্রত্যেক রোগের ওষুধই আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে সৃষ্টি করেছেন। যখন সঠিক অষুধটি উপযুক্ত রোগের মধ্যে প্রয়োগ হয়, তখন আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় তা সুস্থ হয়ে উঠে। অন্য শব্দে বলা হয়েছে—তা যে জেনেছে, সে জেনেছে; আর যে জানেনি, সে জানেনি।



এখানে দুইটি নোট মনে রাখা যেতে পারে

এক হলো—নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিকিৎসার ব্যাপারে যে বিভিন্ন পদ্ধতির কথা বলে গেছেন, তা সব মিলিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি ব্যবস্থা না হলেও তার নির্দেশনা ও পদ্ধতির পরিমাণ কম নয়। অনেক অনেক রোগের চিকিৎসার কথা তিনি বাতলে দিয়েছেন। ইবনুল কাইয়ুম রহ. এর বিখ্যাত যাদুল মাআদ গ্রন্থটির পূর্ণ একটি খণ্ড রয়েছে একে নিয়ে সেখানে তিনি এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ধর্মীয় ও প্রায়োগিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ। এ ছাড়া ‘তিবেব নববী’ নামে স্বতন্ত্র অনেক গ্রন্থও রচিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। এ ছাড়া হাদীসের গ্রন্থগুলোতে রয়েছে এ সংক্রান্ত অসংখ্য হাদীস। নববী চিকিৎসা স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন ব্যবস্থা না হলেও এর মধ্যে গবেষণা করে চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভূত উন্নতি করতে পারে, সে সুযোগ রয়েছে।

দুই. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সরাসরি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্ত হতেন, তাই তার বিভিন্ন উক্তি ও নির্দেশনায় নানা চিকিৎসা বিষয়ক

সূত্র ও থিউরি উপস্থিত থাকবে এবং সেখান থেকে অনেক সূত্র আবিষ্কার করা যাবে, একে কেউ না করছে না।

বিশেষায়িত অর্থে তিব্ব নববী মানে হলো কুরআনুল কারীম ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাস্থ্য বিষয়ক সরাসরি যে নির্দেশনা ও কর্মগুলো করে গেছেন, সেগুলো। এর মধ্যে দুটি ভাগ রয়েছে। কিছু আছে স্বাস্থ্যের সুরক্ষা ও রোগের প্রাক-প্রতিরোধ। আরবিতে একে বলা হয়ে—আল হিময়াহা যেমন, মহামারী দেখা দিলে অন্য কোথাও না যাওয়া, ঘরে অবস্থান করা, রাতের বেলা খাবারের পাত্রগুলো ঢেকে রাখা, পানপাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলা, রাতের বেলা দ্রুত ঘুমিয়ে যাওয়া, খুব ভোরে জাগ্রত হওয়া ও না ঘুমানো, শরীর চর্চা করা, খাবার কম খাওয়া, উদরের তিনভাগের এক ভাগ পরিমাণ খাওয়া, কুকুরের মুখ দেওয়া পাত্র মাটি দিয়ে মেজে ধুয়ে ফেলা ইত্যাদি। রাতের বেলা দ্রুত ঘুমিয়ে পড়া ও সকালে খুব ভোরে জাগ্রত হওয়ার ধর্মীয় অন্যান্য দিক তো আছেই, শারিরিক উপকারীতার বিষয়েও একে আমরা গ্রহণ করতে পারি। এবং সামগ্রিকভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতলে দেওয়া সুন্নাহসম্মত জীবনপদ্ধতি মৌলিকভাবে পরকালীন উপকারীতার জন্য হলেও লক্ষ্য করে দেখা গেছে এর পাশাপাশি এ নিয়মের সবটাই স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সুস্থতা-বান্ধবা এবং এর বেশিরভাগই হলো এ পর্যায়ের—আত্মরক্ষামূলক।

দ্বিতীয় অংশটি হলো—রোগ হওয়ার পর তার চিকিৎসা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে চিকিৎসাগুলো করেছেন, ইবনুল কাইয়িম রহ. জাদুল মাআদ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে তিব্ব নববী পরিচ্ছেদে একে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন :

এক. প্রাকৃতিক ঔষধ দ্বারা।

দুই. আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ পথ্য দ্বারা।

তিন. উভয়টার সম্মিলনো এরপর তিনি এ সবেৰ ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত নমুনা উপস্থাপন করেছেন।

সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে আমি এখানে শুধু উদাহরণ স্বরূপ একটি করে নমুনা উল্লেখ করছি।

প্রাকৃতিক ঔষধ :

যেমন, জ্বরের চিকিৎসা হিসেবে তিনি বলেছেন রোগীর শরীরে পানি দেওয়ার কথা।
বুখারী ও মুসলিম রহ. বর্ণনা করেছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন : জ্বর বা জ্বরের প্রচণ্ডতা হলো জাহান্নামের উত্তাপ। একে তোমরা পানি
দিয়ে ঠাণ্ডা করো।

আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ পথ্য ও উভয়ের সম্মিলনে চিকিৎসা :

নানা রোগের চিকিৎসায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন দোয়া
শিখিয়েছেন, অনেক সময় বিভিন্ন দোয়া পড়ে রুকইয়া বা ঝাড়ফুক করেছেন।
অনেক সময় রুকইয়া করতে গিয়ে বিভিন্ন বস্তুও ব্যবহার করেছেন। যেমন, থুথু,
মাটি, পানি। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। যেমন, তিনি বলেছেন : চোখ লাগা সত্য।
এর চিকিৎসা হিসেবে তিনি তিনি কিছু দোয়া শিখিয়েছেন। যেমন, **اللَّهُ بِكَلِمَاتٍ أَعُوذُ**
وَمِنْ وَهَامَةٍ، شَيْطَانٍ كُلِّ مِنَ التَّامَّةِ، اللَّهُ بِكَلِمَاتٍ أَعُوذُ বা **خَلَقَ مَا شَرُّ مِنَ التَّامَاتِ**
لَا مُمْرَةَ عَيْنٍ كُلِّ ইত্যাদি।

কোন কিছুতে কারো চোখ যেন না লাগে, এ জন্য তিনি চোখের মালিককে
শিখিয়েছেন বিশেষ দোয়া। যেমন **اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** বা **عَلَيْهِ بَارَكَ اللَّهُمَّ**।
এমনিভাবে যার চোখ লেগেছে বিশেষ পদ্ধতিতে তার শরীর ধোয়া পানি দিয়ে
আক্রান্ত ব্যক্তির গা ধুয়ে দেওয়ার কথা সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে।

ঝাঁড়ফুকের বিষয়টি নিয়ে আমাদের সমাজে নানা রকমের ভুল ও বিভ্রান্তি রয়েছে। কেউ কেউ আছেন ঝাঁড়ফুকের নাম শুনলেই কপাল কুঁচকে ফেলেন। যেন এসব খুবই লজ্জার কথা। অবৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কার। এর বিপরীতে অনেকে এসব করতে গিয়ে হালাল, হারাম ও জায়েজ - নাজায়েজের পরোয়া করেন না। সুতরাং এ নিয়ে একটু লম্বা কথা বলা দরকার।



শুরুতেই দুটো কথা পরিষ্কার করি

এক. কারো কারো ধারণা হলো ঝাঁড়ফুক শুধুমাত্র জিনে ধরা বা বিপদাপদ কাটানোর জন্যই করা যেতে পারে। কিন্তু শারিরিক সমস্যার সমাধান ঝাঁড়ফুক দিয়ে নয়; ডাক্তারের কাছে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হবে। এমনভাবে অনেকে ঝাঁড়ফুককে ডাক্তারি চিকিৎসার বিপরীত ও প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচনা করেন। এটা ভুল চিন্তা। ঝাঁড়ফুক সব কিছুর জন্যই হতে পারে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শারিরিক ব্যথা বেদনার জন্যও ঝাঁড়ফুক করেছেন।

সাহাবায়ে কেরাম সর্পদংশনের চিকিৎসা হিসেবেও রুকইয়া করেছেন। নবীজি তা শুনে খুশি হয়েছেন। এবং এর সাথে সাধারণ ডাক্তারি চিকিৎসার কোন বিরোধ নেই। আগেই বলা হয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ চিকিৎসা গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেছেন। আপনি উভয়টিই করতে পারেন। সমাজের সাধারণ মানুষ যদি ঝাঁড়ফুকে আকৃষ্ট হয়ে প্রয়োজনীয় সাধারণ চিকিৎসাকে এড়িয়ে চলে, তাহলে

তাদেরকে সে ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে। একটার জন্য অপরটাকে খাটো করা বা প্রতিবন্ধক মনে করা আপনার চিন্তাগত সমস্যা।

দুই. সমাজে ঝাঁড়ফুকের নামে অনেক কুসংস্কার ও নাজায়েজ কর্মকাণ্ড প্রচলিত আছে। এগুলোতে লিপ্ত হওয়া যাবে না, এসবকে উৎসাহিতও করা যাবে না। বরং, চিহ্নিত করে করে এসবের মূলোৎপাটন করতে হবে। এর জন্য আগে প্রয়োজন হলো শরীয়ী রুকইয়া ও তাবিজের বিধানটি জেনে রাখা।

ঝাড়ফুক ও তাবিজের বিধান :

শরীয়তের অনেক বিধান আছে এমন, যেগুলোর ব্যাপারে শরীয়ত শুধুমাত্র একটি বক্তব্যই দেয় নি; বরং বিভিন্নভাবে নানাদিক থেকে এর উপর আলোকপাত করে হুকুমটিকে স্পষ্ট করেছে। এ হুকুমটির ব্যাপারে সমস্ত কথা একটি আয়াতে বা একটি হাদীসে থাকতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই। এ জন্য বিষয়টির ব্যাপারে শরীয়তের মূল সিদ্ধান্তটি বের করতে হলে খুঁজে খুঁজে এ সংক্রান্ত সবগুলো বক্তব্যকে হাজির করে সবগুলোর সমন্বয়ে মূল সিদ্ধান্তটি বের করতে হবে।

জাহেলী যুগে আরব জনগোষ্ঠি নানান কুসংস্কারে বিশ্বাসী ছিল। এর মধ্যে অন্যতম একটি ছিলো শিরকি আকিদা বিশ্বাসের সাথে ঝাঁড়-ফুক করা ও নানা রকমের তাবিজ ব্যবহার করা। মানুষের ক্ষেত্রে যেমন ব্যবহার করতো, তেমনি জন্তু জানোয়ারের বেলায়ও করতো।

অথচ সকল ক্ষমতার মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তিনিই রোগ দেন। তিনিই রোগ থেকে আরোগ্য দান করেন। কোন কিছুতেই তাঁর কোন শরীক বা সমকক্ষ নেই। ইসলাম এসে এ শিরকি কাজটিকে নিষেধ করে দিয়েছে। হাদীসে আছে-

شرك والتولة والتمايم الرقي إن

অর্থ : নিশ্চয়ই ঝাঁড়-ফুক, তাবিজ ও তিওয়ালা (এক ধরনের যাদু) শিরকা (সুনানে আবু দাউদ : তাবিজ ঝোলানো অধ্যায় : ৩৩৮) একবার একদল লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলে তিনি তাদের ৯জন থেকে বাইয়াত নিলেন একজন থেকে নিলেন না। তারা বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি নয়জন থেকে নিলেন, একজন থেকে নিলেন না! তখন তিনি বললেন : তার শরীরে তাবিজ ঝোলানো। অতঃপর হাত ঢুকিয়ে তাবিজ ছিড়ে ফেললেন এবং বললেন : যে ব্যক্তি তাবিজ ঝোলালো সে কুফরি করলো। (মুসনাদে আহমদ : ১৭৪২২)

তামিমাহ্ অর্থ তাবিজ। এর বহুবচন তামাইমা প্রথম হাদীসে শব্দটি বহুবচনে এসেছে। পরের হাদীসে এসেছে এক বচনো এখানে তাবিজ দ্বারা যে জাহেলী জামানায় প্রচলিত তাবিজ উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ পরিস্কার ভাষায় বলে গেছেন।

সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ইবনে হাজার র. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ফাতহুল বারীতে বলেন :

তামায়েম শব্দটি তামীমা শব্দের বহুবচন। যা পুঁতি বা মালা সাদৃশ্য। মাথায় লটকানো হয়। জাহেলী যুগে বিশ্বাস করা হতো যে, এর দ্বারা বিপদমুক্ত হওয়া যায়, মহিলারা এসব ব্যবহার করতো স্বামীর মোহাব্বত অর্জন করতে। এটি জাদুরই একটি প্রকার। এটি শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এর দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের থেকে বিপদমুক্ত হওয়া ও উপকার অর্জন করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কিন্তু এ শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে না যেসব তাবিজ কবচে আল্লাহর নাম বা কালাম থাকে। { ফাতহুল বারী-১/১৬৬, ঝারফুক অধ্যায় }

হাদীসের আরেক বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন-

সারমর্ম হলো : শিরকি ঝাঁড়-ফুক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন ঝাঁড়-ফুক যার মধ্যে মূর্তি বা শয়তানের নাম আছে, বা কুফরি কথা আছে অথবা এমন কোন কথা আছে যা শরীয়ত সমর্থিত নয়। শরীয়ত অসমর্থিতগুলোর একটি হলো এমন কোন কথা থাকা যার অর্থ বোধগম্য নয়। আর তামিমা মানে তাবিজ যা শিশুর গলায় ঝোলানো হয়। ইমাম তিবি কোন শর্ত ছাড়া সাধারণভাবেই একে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে উচিত হলো হলো শর্ত লাগিয়ে এভাবে বলা-শিরকি তাবিজ হলো ঐ তাবিজ যার মধ্যে আল্লাহ তাআলার নাম বা কুরআনুল কারীমের আয়াত বা কুরআন হাদীসে বর্ণিত দোয়া উল্লেখ নাই।

কেউ কেউ ‘তামিমা’ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন- তামিমা বলা হয় এমন মালা যা জাহেলী যুগে আরবরা তাদের ধারণা অনুযায়ী বদনজর থেকে বাঁচানোর জন্য শিশুর শরীরে লটকে দিতো। এটা বাতিল ও নিষিদ্ধ। অতঃপর তারা ব্যবহারগতভাবে এ অর্থের মধ্যে ব্যাপকতা এনে প্রত্যেক ঐ বস্তুকে তামিমা বলতে লাগলো যা ব্যবহার করে বিপদাপদ থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়। তাদের এ ব্যাখ্যাটি খুবই সুন্দর। (মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘মিরকাতুল মাফাতিহ’- এর চিকিৎসা অধ্যায়ে)

আরো লক্ষ্য করি-

যে হাদীস দিয়ে তাবিজের ব্যাপারে আপত্তি তোলা হয় সে হাদীসে ঝাঁড়-ফুককেও শিরকি কাজ বলা হয়েছে। কিন্তু ঝাঁড়-ফুকের ব্যাপারে বলা হয় এখানে বিশেষভাবে শুধু জাহেলী যুগের শিরকি ঝাঁড়-ফুককে বোঝানো হয়েছে। প্রশ্ন হলো, তাবিজের ব্যাপারেও একই কথা না বলে ব্যাপকভাবে সমস্ত তাবিজকে নাকচ করা হয় কেন? এটা ইনসাফের কথা নয়।

জাবের রা. থেকে বর্ণিত, আরেকটি হাদীসে তিনি বলেন : নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো নুশরা করা কেমন? তিনি বললেন : এটি শয়তানি কাজ। (সুনানে আবু দাউদ : ৪৫৫৩ : তিব্ব অধ্যায়)

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন : তাবিজকেও নুশরা বলা হয়। এমন প্রকার তাবিজ যা জাহেলী যুগের মানুষেরা ব্যবহার করতো এবং এটিই মানুষকে সুস্থ করে দেয় বলে বিশ্বাস রাখতো। (এটি নাজায়েজ ও শয়তানী কাজ) পক্ষান্তরে যে তাবিজে কুরআনুল কারীমের আয়াত লেখা বা আল্লাহ তাআলার নাম বা গুণবাচক নাম লেখা অথবা হাদীসে বর্ণিত দোয়া লেখা তাতে কোন সমস্যা নেই। বরং মুস্তাহাব। চাই এটি তাবিজ আকারে ব্যবহার করা হোক বা ঝাঁড়-ফুক হিসেবে ব্যবহার করা হোক। (মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘মিরকাতুল মাফাতীহ’-এর চিকিৎসা অধ্যায়ে)

সুতরাং :

১. জাহেলী যুগে প্রচলিত শিরকি আকিদায়ুক্ত তাবিজ বা ঝাঁড়-ফুক ব্যবহার করা হারাম।

২. যেগুলোর অর্থ দুর্বোধ্য সেগুলোর মধ্যে শিরকি কথা থাকার আশংকা থাকায় সেগুলো ব্যবহার করাও নাজায়েজ।

৩. জাহেলী যুগে প্রচলিত ঝাঁড়-ফুক-তাবিজ আর কুরআন সুন্নাহ সমর্থিত ঝাঁড়-ফুক-তাবিজ এক নয়। উভয়টার হুকুমও এক নয়।

দেখা যাচ্ছে, কুরআন সুন্নাহ সমর্থিতগুলো ব্যবহার করা শুধু জায়েজই নয়; বরং মুস্তাহাব। এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার করার জন্য নীচে আমরা আরো কিছু হাদীস উল্লেখ করলাম।

লম্বা একটি হাদীসের সারমর্ম : এক সফরে এক সাহাবী এক বেদুইন গোত্রের

সর্দারকে এক পাল বকরির বিনিময়ে সূরা ফাতেহা দিয়ে ঝাঁড়-ফুক করলেন। নবীজী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোনার পর বললেন তোমাদেরকে কে বললো এ দিয়ে ঝাঁড়-ফুক করা যায়! বেশ ভালো করেছে। বকরি থেকে আমাকেও একটা ভাগ দিও। (সুনানে আবু দাউদ : ঝাঁড়-ফুক করার নিয়ম অধ্যায় : ৩৪০১) এখানে থেকে বুঝা যাচ্ছে কুরআনের আয়াত দিয়ে ঝাঁড়-ফুক করা যাবে।

আরেকটি হাদীসের মূল অংশ : মানুষ অসুস্থ হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তর্জনী মাটিতে ছুঁইয়ে উপরে উঠাতেন এরপর এই দোয়া পড়তেন- بِاسْمِ رَبِّنَا بِإِذْنِ سَقِيمِنَا بِهِ لِيَشْفَى بَعْضُنَا بِرِيقَةِ أَرْضِنَا تَرِبَةُ اللَّهِ (সহীহ মুসলিম : বদ নজর... থেকে ঝাঁড়-ফুক করা মুস্তাহাব হওয়া প্রসঙ্গে : ৪০৬৯)

কোন হাদীসে আছে ফু দেওয়ার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুগির ব্যাথার স্থানে হাত রেখে দোওয়া পড়তেন। এছাড়া এ সংক্রান্ত আরো অনেক হাদীস আছে।

এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে, হাদীসে বর্ণিত দোয়াগুলো দ্বারা ঝাঁড়-ফুক করা যাবে। এটি শুধু এ হাদীস নয়, এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস আছে, রোগ হলে কুরআন হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন দোয়া পড়ে ঝাঁড়ফুক করা অত্যন্ত উপকারী একটি আমলা। সকল যুগেই মুসলমানগণ তা পালন করে এসেছেন।

এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা জাহেলী জামানায় ঝাঁড়-ফুক করতাম। এখন এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন? বললেন : ঝাঁড়-ফুক করার কথাগুলো আমাকে দেখাও। শিরকি কিছু না থাকলে ঝাঁড়-ফুক করতে কোন সমস্যা নেই। (সহীহ মুসলিম : ৪০৭৯) এ হাদীস দ্বারা এটা একদম পরিষ্কার যে, ঝাঁড়-ফুক করতে হলে কুরআনের আয়াত বা হাদীসে বর্ণিত দোয়া হতে হবে এমন কোন কথা নেই; বরং শিরকি কথা না থাকলে অন্য কোন ভালো কথা দ্বারা এ তাদবীর করা যাবে।

আরেকটি হাদীস লক্ষ্য করুন- এক সাহাবী বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভয় ও বিপদের সময় পড়ার জন্য তাদেরকে কিছু কথা শিখিয়েছেন। কথাগুলো হলো এই- همزات ومن عباده وشر غضبه من التامة الله بكلمات أعوذ- يحضرون وأن الشياطين

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. কথাগুলো তাঁর ছেলেদের মধ্য থেকে যে বুঝমান তাকে শিখিয়ে দিতেন আর যারা বুঝমান ছিলো না কথাগুলো লিখে তার শরীরে বেঁধে দিতেন (সুনানে আবু দাউদ : ৩৩৯৫)

বিখ্যাত হাদীসের কিতাব মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাতে গ্রন্থকার সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, আতা, মুজাহিদ, আবু জাফর, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর, যাহহাক প্রমুখ থেকে তাবিজ ব্যবহার করা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে বক্তব্য নকল করেছেন। (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ৪র্থ খণ্ড, ২৭৭ পৃ. কিতাবুত তিব্ব)

এখান থেকে আমরা বুঝলাম ঝাঁড়-ফুকের মত শরীয়ত সমর্থিত বক্তব্য লিখে তাবিজও ব্যবহার করা যাবে।

পেছনে আমরা দেখে এসেছি যে, হাদীসে তাবিজের ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জাহেলী যুগের শিরকি তাবিজ। শরীয়ত সমর্থিত তাবিজের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে একটি হাদীসও নাই। এবং এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো পাঠ করলে বুঝা যায় যে এ ধরনের তাবিজকে নিষেধ করার কোন কারণও নাই। পাশাপাশি অনেক সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত হক্কানী ইমামগণ ও উলামায়ে কেরাম তাবিজ ব্যবহার করে এসেছেন, মানুষকে তাবিজ লিখে দিয়েছেন এবং এর জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য দিয়েছেন। পেছনে এর কিছু উদ্ধৃতিও দেওয়া হয়েছে।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন : আক্রান্ত বা অন্য যে কোন রুগির জন্য কুরআনুল কারীম থেকে ও তার স্মরণ থেকে জায়েজ কালি দ্বারা কিছু লিখে দেওয়া এবং তা ধুয়ে পান করানো জায়েজ আছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল অন্যান্য ইমামগণ এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে জায়েজ হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রমাণ স্বরূপ ইবনে তাইমিয়া রহ. তাবিজ জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে আসার উল্লেখ করেছেন। (মাজমুআতুল ফাতাওয়া : ১৯/৬৪), (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ৪র্থ খণ্ড, ২৭৭ পৃ. কিতাবুত তিব্বা

কুরআন দিয়ে নিজের চিকিৎসা করুন

মহান আল্লাহর বাণী

“আর আমি কুরআনে যা কিছু নাযিল করছি তা হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে তাদের রোগের উপশমকারী ও রহমত। কিন্তু এসত্ত্বেও তা, যালিমদের জন্যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।”

- সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৮২.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

“তোমরা যাবতীয় রোগ-ব্যাধির নিরাময়ে (চিকিৎসায়) দুটো জিনিসকে আঁকড়ে ধর-মধু এবং কুরআন।”

- সুনানে ইবনে মাজাহঃ ৩৪৫২

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

“সর্বোত্তম ঔষধ হচ্ছে, আল কুরআন।”

- সুনানে ইবনে মাজাহঃ ৩৫০১



রোগ থেকে বেঁচে থাকা চিকিৎসার চেয়ে উত্তম

সব ধরনের না হলেও অনেক ব্যাধিই শয়তানের কারণে হয়ে থাকে। কেননা শয়তানই হচ্ছে অনিষ্টতার অগ্নিগর্ভ আর ফাসাদের কূপা। যে সকলগরোগের মূল কারণ শয়তান, তার মধ্যে কিছু রয়েছে মানসিক যেমন: মৃগী রোগ, হিংসা, যাদু আর কিছু রয়েছে দৈহিক। যেমন: প্যারালাইসিস, শ্বেত বিক্ষিপ্ত শুভ্রতা, ফোড়া, মস্তিষ্ক বিকৃতি, এইডস ইত্যাদি। যদিও বাহ্যিকভাবে এগুলো রোগ জীবাণু ও ভাইরাস-এর সংক্রমণে হয়ে থাকে। তবে তার গোঁড়াতে রয়েছে শয়তান, সে-ই মূলত এ জাতীয় বিষাক্ত জীবাণু ছড়িয়ে দেয়া আল্লাহ তাআলা বলেন,

“(হে নবী!) আপনি আমার বান্দা আইয়ুবের কথা স্মরণ করুন। যখন সে তার মালিককে ডেকে বলেছিল (হে আল্লাহ), শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলে দিয়েছে।” (সূরা ৩৮; ৪১)

এর কারণ হচ্ছে শয়তানের স্পর্শ। শয়তানই রোগ বালাইয়ের মূল উৎস। মানুষের প্রতি প্রতিহিংসা এবং প্রতিশোধ স্পৃহায় পাগলপারা হয়ে সে তাদের মাঝে স্পর্শ ও অন্যান্য পদ্ধতিতে রোগ জীবাণু ছড়িয়ে দেয়। এ কারণে যে ব্যক্তি রোগের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা, নিষ্কৃতি ও মুক্তি চায় তার জন্যে অতীব জরুরী হলো শয়তানকে নিজের মন এবং শরীর থেকে বের করার আশ্রয় চেষ্টা করা।

রাসূল সা:- এর চিকিৎসা বিধান

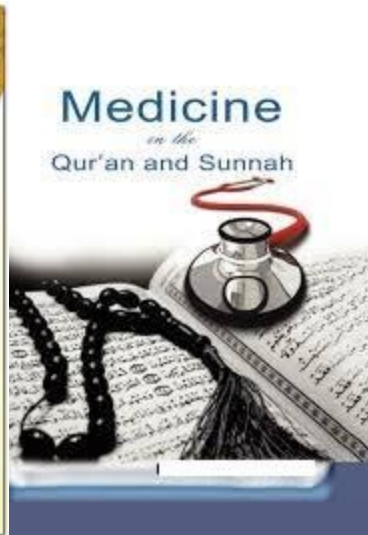
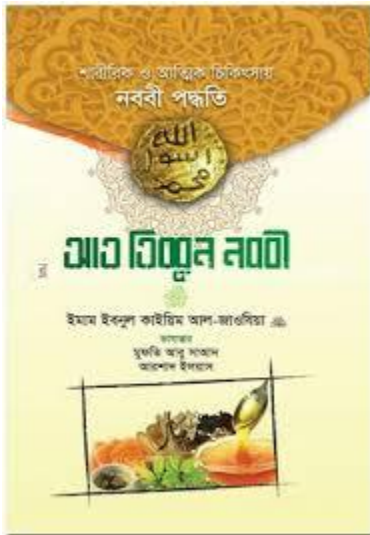
Article-1

তিব্বুন নব্বী বা বিশ্বনব্বী সা:-এর চিকিৎসা বিধান মানবজাতির স্বাস্থ্যসেবার ইতিহাসে একটি অনন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিব্বুন নব্বী বলতে আমরা রোগ, ওষুধ ও চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, সুস্থতা, স্বাস্থ্যের হিফাজত ইত্যাদি সম্পর্কে নব্বী করীম সা:-এর কথা, কাজ ও নির্দেশনাকে বুঝে থাকি। বিভিন্ন সহি হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, অসুস্থ ব্যক্তির প্রায়ই নব্বী করীম সা:-এর কাছে আগমন করতেন এবং তিনি তাদের আরোগ্যের জন্য ব্যবস্থাপত্র দিতেন ও আল্লাহর কাছে আরোগ্য লাভের জন্য দু'আ করতেন। তাঁর রোগ ও চিকিৎসাসংক্রান্ত এসব বাণীর ওপর ভিত্তি করে তদানীন্তন আরব সমাজে তিব্বুন নব্বী সা: নামে একটি বিশেষ চিকিৎসাব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যা অত্যন্ত যৌক্তিক ও কার্যকর ব্যবস্থা একটি।

ওই সময় আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কার বলতে কিছুই ছিল না। কিন্তু রোগ-ব্যাধি তখনো ছিল। যদিও নব্বী করীম সা:-এর আগমন ডাক্তার বা ফার্মাসিস্ট হিসেবে ছিল না, তথাপি তিনি রোগ নিরাময়ে ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অনেক ব্যবস্থাপত্রসংবলিত বক্তব্য রেখেছেন এবং অসুস্থ ব্যক্তি তাঁর ব্যবস্থাপত্রে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছেন।

অজ্ঞাত কারণে এটি মুসলিম সমাজে দীর্ঘ দিন লুকায়িত থাকলেও বর্তমানে এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটেছে এবং মানুষ ক্রমশ তিব্বুন নববী সা:-এর মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এবং দেশ-বিদেশে অনেক বই প্রকাশ হচ্ছে।

এ বিষয়ে কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, ‘তিনি নিজ থেকে কোনো কথাই বলেন না’ (সূরা নজম : ৫৩:৩)। তাই সব ধরনের চিকিৎসার পরও যখন কোনো রোগী আরোগ্য লাভে ব্যর্থ হন তখন চিকিৎসক তাকে এ বিকল্প পদ্ধতির চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।



রাসূল সা:-এর চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে আধুনিক মেডিক্যাল সায়েন্সের ভাষ্য হচ্ছে, এ চিকিৎসা পদ্ধতির ওষুধের কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই, যা প্রাকৃতিক ও নিরাপদ। এ চিকিৎসায় ব্যয় অত্যন্ত কম ও সহজলভ্য। এ পদ্ধতির চিকিৎসার কাঁচামাল দেশেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। এ পদ্ধতি রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ প্রতিরোধকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বস্তুত আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কার বলতে যখন কিছুই ছিল না, ঠিক সে সময়ে ইসলামের মহান নবী সা: তাঁর উম্মাহর সার্বিক কল্যাণে ল্যাবরেটরিতে কোনো প্রকার গবেষণা ছাড়াই আসমানি প্রেরণার ওপর ভিত্তি করে

গাছগাছড়া, ফলমূল এবং সঠিক ও পরিমিত খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে এ স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতি চালু করেছিলেন, যা খুবই যৌক্তিক এবং আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

রাসূল সা:-এর চিকিৎসাব্যবস্থার সাথে আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে কল্পনা, অভিজ্ঞতা, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার ফলাফল। অপর দিকে নবী করিম সা:-এর মেডিসিন নির্ভর করে নবুয়তের বিশেষ মর্যাদা, বুদ্ধির পূর্ণতা ও জ্ঞানের উৎকর্ষতার ওপর।

Modern medicine is based on conjecture, supposition and experimentations. On the other hand, Medicines of the Nabi (SAWS) are based on revelation or divine wisdom. They are based on niche of prophecy and perfection of human intellect. They are not based on speculation or results of laboratory investigations.

হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) বর্ণনা করেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘প্রত্যেক রোগেরই ওষুধ রয়েছে। সুতরাং যখন রোগ অনুযায়ী ওষুধ প্রয়োগ করা হয়, তখন আল্লাহর হুকুমে রোগী আরোগ্য লাভ করে থাকে’। (সহিহ মুসলিম)

অপর দিকে আবু হুরায়রা (রা:) বর্ণনা করেন যে, নবী করিম সা: বলেছেন, ‘আল্লাহ পাক এমন কোনো রোগ বা ব্যাধি সৃষ্টি করেননি যার প্রতিষেধক তিনি পাঠাননি বা ওষুধ সৃষ্টি করেননি’ (সহিহ আল বুখারি)

তিব্বুন নববীর মূলকথা হচ্ছে, ‘প্রত্যেক রোগেরই ওষুধ রয়েছে’ চিকিৎসার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, ওষুধ ও ডাক্তারই রোগ নিরাময়ের একমাত্র অবলম্বন; অন্য কিছু নয়। কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক ও ইসলামি বিধিসম্মত নয়। সূরা আশ-শুয়ারার ৮০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, ‘রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন’।

নবী করিম সা:-এর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নির্দেশনা সঠিকভাবে সঠিক খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ ও পানীয় পান সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তার চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্য সর্বদা ভালো ও অটুট থাকবে। মানুষ সহসা অসুস্থ হবে না। সহসা রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে না। ফলে ডাক্তার ও ওষুধের প্রয়োজনও কম হবে। তাই জনস্বাস্থ্যের পরিধি বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি অথবা বিকল্প চিকিৎসাপদ্ধতি হিসেবে আমাদের এই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজে ‘বিশ্ব নবীর চিকিৎসা বিধান’ নামে এ চিকিৎসাব্যবস্থা চালু করা বর্তমান সময়ের দাবি।

নবী করিম সা: ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন বিষয়ে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। নিয়মিত হাতের নখ কাটা, গোঁফ ছাঁটা, নাভি ও বগলের নিচের লোম তুলে ফেলা ইত্যাদি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য অটুট রাখার উল্লেখযোগ্য দিক বর্ণনা করেছেন তিনি। তিনি ঘুম থেকে উঠে হাত না ধুয়ে কোনো খাবার পাত্রে হাত দিতে নিষেধ করেছেন। বস্তুত তিনিই প্রথম হাত ধোয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন, যার ওপর

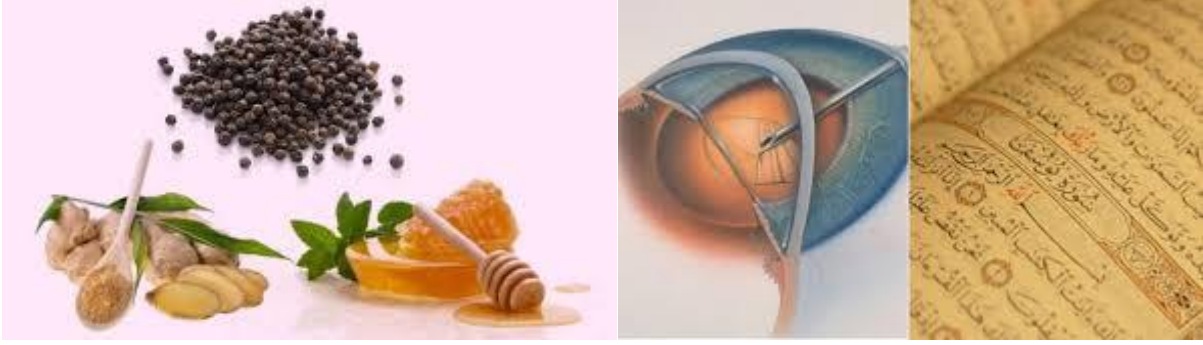
ভিত্তি করে বর্তমান বিশ্বে ‘হাত ধোয়া দিবস’ পালিত হচ্ছে। তিনি Quarantine নামক concept-এর প্রথম আবিষ্কারক। তিনি প্লেগ রোগের আবির্ভাবে Quarantine (NO IN NO OUT) নীতি প্রবর্তন করেছিলেন। ময়লা, নোংরা আর্বজনা বাড়ির আশপাশে জমিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি প্রায় ৪০টি রোগের নিরাময় বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রেখেছেন, যা এই স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

তিব্বুন নব্বী সম্পর্কে অধিক জ্ঞান লাভের জন্য বিজ্ঞ পাঠক www.prophets-medicine.com ওয়েবসাইটটি ভিজিট করতে পারেন। এ বিষয়ে ‘ইসলামের আলোকে চিকিৎসাবিজ্ঞান’ নামে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড (১২৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০) ২০১৩ সালে বিষয়ভিত্তিক অনেক রঙিন ছবিসহ পাঁচ রঙে ছাপা, ৩৮৬ পৃষ্ঠার রয়েল সাইজের একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ প্রকাশ করেছে।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পর্কিত নবীজীর বক্তব্য সমগ্র বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য। এসব বিধিবিধান শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, বরং তা সব যুগে সব জাতির ও জনগোষ্ঠীর লোকের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর দেয়া অক্সিজেন ও আলো-বাতাস যেমন সব মানুষের কল্যাণ ও জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য, তেমনি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নবী করিম সা:-এর দিকনির্দেশনাও সব দেশের সব এলাকার, সব সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও কল্যাণের জন্যই।

বর্তমান চিকিৎসাব্যবস্থায় এর অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে। অধিকন্তু ধর্মীয় মূল্যবোধের কারণে সাধারণ মানুষ এ পদ্ধতির চিকিৎসা গ্রহণে বেশি আকৃষ্ট হবে। অতএব দেশের জন্য জনস্বাস্থ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ার কারণে

বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য বিভাগে এ তিব্বুন নববীর অন্তর্ভুক্তি এ দেশের চিকিৎসাসেবার ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। আর এ মহান কাজে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশের কাছে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে পরিণত হবে।



দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে তিব্বুন নববীর আওতাধীন হার্বাল ওষুধের উৎপাদন, প্রাপ্তি ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সহিহ হাদিসে বর্ণিত নবীজী সা:-এর ওষুধগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে **Formulary of Prophetic Medicine** নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ যথাসম্ভব দ্রুত হাতে নিতে হবে, যে কাজটি বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ বলে গ্রহণ করতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আশা করা যায়, বাংলাদেশ যদি ২০৩০ সালের মধ্যে **Universal Health Coverage (UHC)** অর্জন করতে চায়, তাহলে জনস্বাস্থ্যের মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে তিব্বুন নবী চিকিৎসাব্যবস্থা চালু করতে পারে। বস্তুত এ স্বর্গীয় চিকিৎসাব্যবস্থা চালুর এখনই উপযুক্ত সময়।

Article-2

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) চিকিৎসক ছিলেন না। কিন্তু নবীজী (সা.) ১৪০০ বছর আগে উম্মতের মানসিক ও দৈহিক রোগ ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেসব মূল্যবান তথ্য প্রদান করে গেছেন, তা যুগে যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য একটা সুস্পষ্ট পথ পদর্শক। ‘তিব্বের নববী’ গ্রন্থটির আলোকে মহানবী সাঃ-এর চিকিৎসা বিধানের সামান্য কিছু তথ্য তুলে ধরা হলোঃ

নবী করিম (সা.) নামাজকে আরোগ্যদানকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন। উনার কথাটির বিশ্লেষণে যাওয়া যাক, সুস্থ দেহ ও মনের জন্য একান্ত জরুরি বিষয় হচ্ছে ব্যায়াম। যা নামাজের মাধ্যমেই উত্তমভাবে পালন করা যায়। লক্ষ্য করুন, যদি আমরা শুদ্ধ নিয়মে নামাজ আদায় করি তাহলে আমাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গেরই মুভমেন্ট হয়। ফলে রক্তসঞ্চালনও সুন্দরভাবে চলতে থাকে। যেমন সেজদা অবস্থায় হাত, পা, পেট, পিঠ, কোমর, রান ও শরীরের সব অঙ্গের জোড়া টানটান অবস্থায় থাকে। এ সময় রক্ত মস্তিষ্ক পর্যন্ত সঞ্চালিত হয়। আর সেজদা অবস্থায় মহিলাদের বুক রানের সাথে মিশে থাকে। এতে তাদের অভ্যন্তরীণ রোগ ব্যাধির উপশম হয়। অর্থাৎ নামাজ আত্মিক উন্নতির পাশাপাশি দৈহিক সুস্থতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

হাদিস শরিফে বিভিন্ন রোগ ও প্রতিষেধকেরও উল্লেখ আছে। যেমন নবীজী মেহেদিকে মাথাব্যথার প্রতিষেধক বলেছেন। তিনি এটাকে ফোঁড়া পাকায় এবং কাঁটা বিধলেও ব্যবহার করতেন। সূরা নাহলে মধুকে শেফাদানকারী ঘোষণা করা হয়েছে। আর নবীজীরও নির্দেশ, ‘যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন সকাল বেলায় মধু সেবন করবে তার কোনো কঠিন ব্যাধি হবে না।’



আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আজ এটাই প্রমাণ করেছে, মধু অগণিত রোগের ওষুধ এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াহীন। তবে হ্যাঁ, মধু কোন রোগে কতটুকু ব্যবহার প্রয়োজন সে বিষয়ে গবেষণা করার দায়িত্ব চিকিৎসকদেরই। হাদিসে কালোজিরা ও সিনাকে সর্বরোগের ওষুধ বলা হয়েছে। সিনা মস্তিষ্ক পরিষ্কার, বেদনানাশক, কৃমিনাশক, মাথাব্যথানাশক, গিঁটবাত ও নিউমোনিয়া রোগে উপকারী। অপর দিকে কালোজিরা বিভিন্ন ঠাণ্ডাজাতীয় ব্যাধির ওষুধ ছাড়াও যকৃৎ, পাকস্থলী, মূত্রাশয়ের শক্তিবর্ধক।

মহানবী সাঃ বলেছেন, ‘যখন রোগ যন্ত্রণা খুব কষ্টদায়ক হয় তখন এক চিমটি কালোজিরা, অতঃপর পানি ও মধু সেবন করবো’ এ ছাড়াও ঘৃতকুমারী ত্বকের লাভণ্যতায়, যাইতুন নিউমোনিয়ায়, আগরকাঠ গলগণ্ডে, চিরতা ফোঁড়ার সমস্যায়, খেজুর ও বিহিদানা হৃদরোগে, যব পেট ব্যথায়, সুরমা দৃষ্টিশক্তিতে, বিলাতি ডুমুর অর্শ ও গেটে বাতে, ঠাণ্ডা পানি জ্বরে, লবণ হজম শক্তিতে ব্যবহারের নির্দেশ হাদিসে উল্লেখ আছে। হাদিস ও ইতিহাস বিশ্লেষকদের মতে নবীজীর প্রিয় খাবারের তালিকায় ছিল তরমুজ, মধু, লাউ, দুধ, যাইতুন, খেজুর, ভুনা গোশত, পাখির গোশত, মাছ আর তিনি অত্যধিক গরম ও বাসি খাবার এড়িয়ে চলতেন। তিন দুধ ও

মাছ যেমন কখনো একসঙ্গে খেতেন না, তেমনি দু’টি গরম, দু’টি ঠাণ্ডা, নরম বা আঠালো জিনিসও একসাথে খেতেন না। নবীজী আমাদের ক্ষুধার সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং পরিমিত আহারেরও পরামর্শ দিয়েছেন।

৩০ জুলাই, ২০১৫/এমটিনিউজ২৪

ইসলামের দৃষ্টিতে শিঙ্গা ও কাপিং (হিজামা) থেরাপি:

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় এটিকে কাপিং থেরাপি (Cupping therapy) বলা হয়। আমাদের দেশে সাধারণ অর্থে একে ‘শিঙ্গা লাগানো’ বলা হয়। আরবিতে একে বলা হয় ‘হিজামা’। আরবি ‘আল হাজম’ থেকে এ শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ চোষা বা টেনে নেওয়া। এই প্রক্রিয়ায় সুচের মাধ্যমে নেগেটিভ প্রেশার দিয়ে (টেনে/চুষে) নিস্তেজ প্রবাহহীন দূষিত রক্ত (Toxin) বের করে আনা হয়। এতে শরীরের মাংসপেশিগুলোর রক্তপ্রবাহ দ্রুততর হয়। পেশি, চামড়া, ত্বক ও শরীরের ভেতরের অরগানগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। এটি মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) নির্দেশিত একটি চিকিৎসাব্যবস্থা।

কাপিং থেরাপি কী ও কেন?

কাপিং থেরাপি একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে স্থানিক রক্তাধিক্য তৈরি করা হয়। কাপের ভেতরে আংশিক বায়ুশূন্যতা সৃষ্টি করে ত্বকের ওপর তা বসিয়ে দেওয়া হয়। এরপর নেগেটিভ পাম্প ব্যবহার করে কাপের ভেতর বায়ুশূন্যতা তৈরি করা হয়। এটা ত্বকের নিচের টিস্যুতে টান দেয়। ত্বকের ওপর কয়েক মিনিট কাপ বসিয়ে রাখলে কাপের নিচে রক্ত কেন্দ্রীভূত হয়।

দেহের মেরিডিয়ানকে (নালিগুলো) প্রতিবন্ধকতামুক্ত করার জন্য কাপিং থেরাপি বর্তমানে উন্নত করা হয়েছে। মেরিডিয়ান হলো দেহের অভ্যন্তরের নালি, যার ভেতর দিয়ে দেহের প্রতিটি অংশে, প্রতিটি অঙ্গে ও টিস্যুতে শক্তি প্রবাহিত হয়। দেহের অভ্যন্তরের মেরিডিয়ান নালিগুলো বন্ধ হলে রোগ ও অসুস্থতা ঘটে। এই বন্ধ নালিগুলো মুক্ত করলে রোগমুক্তি দ্রুততর হয়। আমাদের পিঠে পাঁচটি নালি আছে। যখন এগুলো মুক্ত থাকে, তখন তারুণ্য শক্তি সারা দেহে প্রবাহিত হয়। সম্ভবত কাপিংই হলো শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে মেরিডিয়ানগুলো মুক্ত করা যায়। এটি আরবি হিজামার আধুনিক রূপ।

হিজামা হলো এমন প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি, যাতে মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বিদ্যমান। মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘জিব্রাইল (আ.) আমাকে জানিয়েছেন যে মানুষ চিকিৎসার জন্য যত উপায় অবলম্বন করে, তার মধ্যে হিজামাই হলো সর্বোত্তম।’ (মুস্তাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৭৪৭০)

মহানবী (সা.) আরো বলেছেন, ‘আমি মেরাজের রাতে যাদের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করেছি, তাদের সবাই আমাকে বলেছে, ‘হে মুহাম্মদ, আপনি আপনার উম্মতকে হিজামার আদেশ করবেন’।’’ (তিরমিজি শরিফ, হাদিস : ২০৫৩)

উচ্চ রক্তচাপ রোধে হিজামা বা শিঙ্গা পদ্ধতি খুবই কার্যকর। মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘গরম বৃদ্ধি পেলে হিজামার সাহায্য নাও। কারণ কারো রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলে তার মৃত্যু হতে পারে।’ (মুস্তাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৭৪৮২)



হিজামা দূষিত রক্ত টেনে বের করে আনো। এর ফলে দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়। মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘হিজামা গ্রহণকারী কতই উত্তম লোক। সে দূষিত রক্ত বের করে মেরুদণ্ড শক্ত করে এবং দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে।’ (তিরমিজি শরিফ, হাদিস : ২০৫৩)

মহানবী (সা.)-এর যুগে আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা ছিল না। সে সময়ের মানুষেরও অসুখ হতো। তারা প্রাকৃতিক উপায়ে চিকিৎসা গ্রহণ করত। প্রাকৃতিক চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘রোগমুক্তি তিনটি জিনিসের মধ্যে নিহিত। এগুলো হলো—শিঙ্গা লাগানো, মধু পান করা ও আগুন দিয়ে গরম সঁক দেওয়া। তবে আমি আমার উম্মতকে আগুন দিয়ে গরম দাগ দিতে নিষেধ করি।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৬৮১)

কাপিং থেরাপি নানাভাবে কাজ করে। ব্যথা কমানোর জন্য অনেক ব্যথা সহ্য করতে হবে আপনাকে।

বেস্টর ইউনিভার্সিটি অব ওয়শিংটনের আকুপাংচার ও ওরিয়েন্টার মেডিসিনবিষয়ক সহকারী অধ্যাপক ক্যাথলিন লুমিয়ার বলেন, ‘ধারণা করা হয়, এই থেরাপি রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করে’



হিজামার মাধ্যমে ব্যাকপেইন, উচ্চ রক্তচাপ, পায়ে ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা, মাথাব্যথা (মাইগ্রেন), ঘাড়ের ব্যথা, কোমরের ব্যথা, জয়েন্টে ব্যথা, আর্থ্রাইটিস, বাত, ঘুমের ব্যাঘাত, থাইরয়েডের ব্যাঘাত, স্মৃতিশক্তিহীনতা, ত্বকের বর্জ্য পরিষ্কার, অতিরিক্ত শ্রাব নিঃসরণ বন্ধ করা, অর্শ, অণ্ডকোষ ফোলা ও ফোড়া-পাঁচড়া ইত্যাদি প্রতিরোধ হয়। হিজামার ফলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, শরীর সতেজ হয় ও কর্মস্পৃহা বাড়ে।

হিজামা (حِجَامَة) একটি নব্বী চিকিৎসা ব্যবস্থা।

হিজামা কি? কেন? কিভাবে করে? ও হিজামার ফজিলত বা উপকারিতা।

রিও অলিম্পিকে ১৯তম সোনারজয়ের মুহূর্তে জলদানবখ্যাত মাইকেল ফেলপসের শরীরজুড়ে থাকা কালচে-গোলাপি রঙের দাগ দেখা যাওয়ার প্রেক্ষিতে আলোচনায় উঠে এসেছে এক ধরনের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির কথা। আধুনিক পরিভাষায় কাপিং (Cupping) থেরাপি নামের এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে আরবিতে বলা

হয় হিজামা (حِجَامَة)। এটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণিত ও নির্দেশিত একটি চিকিৎসা ব্যবস্থা।

আরবি ‘আল হাজম’ থেকে এসেছে এই শব্দের উৎপত্তি। যার অর্থ চোষা বা টেনে নেওয়া। এই প্রক্রিয়ায় সূঁচের মাধ্যমে নেগেটিভ প্রেশার দিয়ে (টেনে/চুষে) নিস্তেজ প্রবাহহীন দূষিত রক্ত (Toxin) বের করে আনা হয়। এতে শরীরের মাংসপেশীসমূহের রক্তপ্রবাহ দ্রুততর হয়। পেশী, চামড়া, ত্বক ও শরীরের ভেতরের অরগানসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। ফলে শরীর সতেজ ও শক্তিশালী হয়।

আমাদের দেশে হিজামাকে সাধারণ অর্থে শিঙা লাগানো বলা হয়। অতি প্রাচীন এ চিকিৎসাপদ্ধতির উৎপত্তি আরবদেশে। হিজামাকে নবীর দেখানো বা বলা চিকিৎসা পদ্ধতি বলা হয়। হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজামার উপকারিতা সম্পর্কে উম্মতকে অবহিত করেছেন। তিনি নিজে এ পদ্ধতির চিকিৎসা ব্যবহার করেছেন এমনকি অন্যকে হিজামা পদ্ধতির চিকিৎসা নিতে উৎসাহিতও করেছেন। হিজামার ব্যবহার রাসূলুল্লাহ(সা.) ও সাহাবাদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।



কেন হিজামা করাবেন?

হাদিসে আছে, হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজামা করেছেন মাথাব্যথার প্রতিষেধক হিসেবে। পিঠের ব্যথার জন্য দুই কাঁধের মাঝে ও ঘাড়ের দু’টি রগে হিজামার

উপকারিতা সম্পর্কে সিহাহ সিত্তার গ্রন্থসমূহে বহু হাদিস রয়েছে। আপনার রোগ হলে যেমন ডাক্তারের কাছে যানাতারপর প্রয়োজন পড়লে অস্ত্রপোচারও করান। তেমনি আপনার রোগের জন্য **হিজামা** করাবেন। তাহলে ফায়দা স্বরূপ রোগ থেকে ইনশাআল্লাহ মুক্তি পাবেন এবং রাসূল সাঃ এর একটি সুন্নাতের উপরও আমল করা হলো।

হিজামা সংক্রান্ত হাদীসঃ

(১) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে নবী করিম (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রোগমুক্তি তিনটি জিনিসের মধ্যে নিহিত। এগুলো হলো- শিঙা লাগানো, মধু পান করা এবং আগুন দিয়ে গরম দাগ দেওয়া। তবে আমি আমার উম্মতকে আগুন দিয়ে গরম দাগ দিতে নিষেধ করি।’ —সহিহ বোখারি: ৫৬৮১

(২) হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কেউ **হিজামা** করতে চাইলে সে যেন আরবী মাসের ১৭, ১৯ কিংবা ২১ তম দিনকে নির্বাচিত করে। রক্তচাপের কারণে যেন তোমাদের কারো মৃত্যু না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবো” সুন্নাতে ইবনে মাজা, হাদীছ নম্বর: ৩৪৮৬

(৩) হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “আমি মেরাজের রাতে যাদের মাঝখান দিয়ে গিয়েছি, তাদের সবাই আমাকে বলেছে, হে মুহাম্মদ, আপনি আপনার উম্মতকে হিজামার আদেশ করবেনা” সুন্নাতে তিরমিযী হাদীছ নম্বর: ২০৫৩

(৪) হযরত জাবির রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় হিজামায় শেফা রয়েছে।” সহীহ মুসলিম, হাদীছ নম্বর: ২২০৫

(৫) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “খালি পেটে হিজামাই সর্বোত্তম। এতে শেফা ও

বরকত রয়েছে এবং এর মাধ্যমে বোধ ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়” সুনানে ইবনে মাজা, হাদীছ নম্বর: ৩৪৮৭

(৬) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “হিজামাকারী কতইনা উত্তম লোক। সে দূষিত রক্ত বের করে মেরুদণ্ড শক্ত করে ও দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে” সুনানে তিরমিযী, হাদীছ নম্বর: ২০৫৩

হিজামা (শিঙ্গা/CUPPING) এর মাধ্যমে যে সব রোগের চিকিৎসা করা হয়ে থাকেঃ

- ১। মাইগ্রেন জনিত দীর্ঘমেয়াদী মাথাব্যথা
- ২। রক্তদূষণ
- ৩। উচ্চরক্তচাপ
- ৪। ঘুমের ব্যাঘাত (insomnia)
- ৫। স্মৃতিভ্রষ্টতা (perkinson's disease)
- ৬। অস্থি সন্ধির ব্যাথা/ গেটে বাত
- ৭। ব্যাক পেইন
- ৮। হাঁটু ব্যাথা
- ৯। দীর্ঘমেয়াদী সাধারণ মাথা ব্যাথা
- ১০। ঘাড়ের ব্যাথা
- ১১। কোমর ব্যাথা
- ১২। পায়ে ব্যাথা
- ১৩। মাংসপেশীর ব্যাথা (muscle strain)
- ১৪। দীর্ঘমেয়াদী পেট ব্যাথা
- ১৫। হাড়ের স্থানচ্যুতি জনিত ব্যাথা

- ১৬। থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যা
- ১৭। সাইনোসাইটিস
- ১৮। হাঁপানি (asthma)
- ১৯। হৃদরোগ (Cardiac Disease)
- ২০। রক্তসংবহন তন্ত্রের সংক্রমণ
- ২১। টনসিল
- ২২। দাঁত/মুখের/জিহ্বার সংক্রমণ
- ২৩। গ্যাস্ট্রিক পেইন
- ২৪। মুটিয়ে যাওয়া (obesity)
- ২৫। দীর্ঘমেয়াদী চর্মরোগ (Chronic Skin Diseases)
- ২৬। ত্বকের নিম্নস্থিত বর্জ্য নিষ্কাশন
- ২৭। ফোঁড়া-পাঁচড়া সহ আরো অনেক রোগ।
- ২৮। ডায়াবেটিস (Diabetes)
- ২৯। ভাটিব্রাল ডিস্ক প্রোল্যাক্স/ হারনিয়েশান
- ৩০। চুল পড়া (Hair fall)
- ৩১। মানসিক সমস্যা (Psychological disorder)...সহ আরও অনেক রোগ।

হিজামার প্রকারভেদ

এক. স্বাভাবিক অবস্থায় যেভাবে করবো যথা :

ক. আরবী মাসের ১৭, ১৯ ও ২১ তারিখের কোন একটি নির্বাচন করবো।

খ. সোম, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবারের কোনটিকে নির্বাচন করবো।

উল্লেখ্য, তারিখ ও দিনের মধ্যে বিরোধ হলে তারিখকে অগ্রাধিকার দিবো।

গ. খালি পেটেই হিজামা করবো সকালে খালি পেটে হিজামা করা উত্তম।

ঘ. ফজরের পর হতে দুপুর ১২টার মধ্যে করবো।

ঙ. হিজামার আগের ও পরের দিন সঙ্গম না করা উত্তম।

দুই. জরুরী অবস্থায় যেভাবে করবো।

এতে মাস ও দিনের কোনো ধর্তব্য নেই। যখনই সমস্যা তখনই করা যেতে পারে।

একসময় রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোড়া থেকে পড়ে পায়ের আঘাত পাওয়ায় **হিজামা** করেছিলেন।

হিজামার নির্দিষ্ট স্থানসমূহ

১. মাথার উপরিভাগ তথা মধ্যভাগ।

২. মাথার ঠিক মাঝখানে।

৩. ঘাড়ের উভয় পাশে।

৪. ঘাড়ের নীচে উভয় কাঁধের মাঝখানে।

৫. উভয় পায়ের উপরিভাগে।

৬. মাথার নীচে চুলের বুটির স্থলে।

ইহরাম ও রোযায় হিজামা

মুহরিম ও রোযাদারের জন্য **হিজামা** বৈধ। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম ও রোযাদার অবস্থায় হিজামা করেছেন।” সুনানে তিরমিযী হাদীছ নম্বর : ৭৭৫

হিজামা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। এটি কি আসলে উপকারী কোন চিকিৎসা?

হিজামার উপকারিতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেলে যে কেউ এই চিকিৎসা নিতে চাইবে। হিজামাতে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক থিওরি, ফিজিওলজি, এনাটমি রয়েছে।

সেই সাথে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উপশম রয়েছে। হিজামা কে অনেকে শিঙ্গা বলে থাকেন কিন্তু আধুনিক মেশিনের সাহায্যে শরীরের সামগ্রিক জ্ঞান লাভের পর যে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে তা আরো বেশি ফলপ্রসূ।

হিজামা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। এটি কি আসলে উপকারী কোন চিকিৎসা? এতে কি মানুষের ক্ষতি হতে পারে কিনা? যথেষ্ট তত্ত্ব ও উপাত্ত অনুসারে আমরা আজ এটি বলতে পারি দক্ষ হিজামা থেরাপিস্ট সহকারে কারো হিজামা করা হলে তার কোন ক্ষতি হবার আশংকা নেই। কাপিং মূলত দুই ধরনের। **dry cupping** এবং ওয়েট কাপিং। **Wet cupping** কে মূলত হিজামা বলা হয়। উপকারিতার দিক থেকে হিজামা সর্বোত্তম। এটি শুধু ইসলামিক চিকিৎসা বলে উত্তম, তা নয়। গবেষণা দ্বারা এটাই প্রমাণিত। আমাদের শরীরের প্রথম বৃহত্তম অঙ্গ ত্বক। দ্বিতীয় লিভার। শরীরের আরেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কিডনি।

আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখার পিছনে এই লিভার ও কিডনি প্রধান ভূমিকা পালন করে। গবেষণা থেকে জানা গেছে হিজামাতে ত্বককে যে নেগেটিভ প্রেশার দেয়া হয় তা ৩৫ গুণ বেশি এই একই কাজ করে। অর্থাৎ ত্বকে নেগেটিভ প্রেশার দেয়া হলে যে পদার্থ টেনে নিয়ে আসে তাতেই থাকে সেসব বর্জ্য যা লিভার ও কিডনি ডায়ালাইসিস করে। আর এটিই হিজামা। আরেক ধরনের কাপিং আছে যাতে কাটা হয় না এটিও ব্যথার জন্য অত্যন্ত উপকারী।

বিশেষ করে যারা খেলাধুলা করেন তাদের মাংসপেশির স্টিফনেস দূর করতে এটি বিশ্বজুড়ে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও মুখের ত্বক, সেলুলিয়েটের (ত্বকে ভাঁজ পড়া) সমস্যা, মুখের লোমকূপ বড় হয়ে যাওয়া যাকে পোরস বলে, পেটের দাগ ইত্যাদির জন্য কাপিং ম্যাসাজ (ড্রাই কাপিং) কার্যকরী ভূমিকা রাখে।



হিজামা চিকিৎসাতে ত্বকে খুব ই সামান্য কাটতে হয় এবং নেগেটিভ প্রেশার দিয়ে বদ-রক্ত বের করা হয়। আমাদের ত্বক একটা রক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করে। হিজামাতে ত্বকের তিনটি স্তরের কেবল উপরের স্তরটি কাটা হয় যার ফলে নিচের ত্বক ছাকনী হিসেবে কাজ করে।

কিন্তু কেউ যদি এর নিচের ত্বক কেটে দেয় তবে ভাল রক্ত বের হয়ে যাবো এতে যথেষ্ট ক্ষতি ও ইনফেকশনের আশংকা থাকে।

ইন্টারন্যাশনাল কাপিং থেরাপি এসোসিয়েশন বলেছে কাপিং একই সাথে একজন মানুষের একাধিক শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার উপশম করতে পারে।

আমরা একটা ওষুধ একটা মাত্র সমস্যার জন্য খেয়ে থাকিকিন্তু হিজামাতে যে দূষিত প্লাজমা বেরিয়ে আসে তাতে থাকে একাধিক রোগের জীবাণু যেমন ঠাণ্ডা, কাশি, বিষন্নতা, আরথ্রাইটিস, কোমরের সায়াটিকার ব্যথা, চিন্তা, ঘুমের সমস্যা, মাংসপেশির

ব্যথা এবং অন্যান্য সকল রোগের তীব্রতাও কমে আসে।

কাপিং থেরাপীর আন্তর্জাতিক সংস্থা ICTA থেকে হিজামার কিছু উপকারিতা:

১. হিজামা শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে

হিজামা কাপিং থেরাপী একটি অতি প্রাচীন চিকিৎসা। মিশরীয় এবং সৌদি আরব গবেষকরা বলেছেন এই থেরাপি

কা মানুষের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

খা আমরা যে ওষুধ খাই তার প্রভাবকে আরো কার্যকরী করে।

গা অনেক রোগ সৃষ্টিকারী এবং শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর পদার্থ রক্ত থেকে নিঃসৃত করে।

তারা তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন প্রচলিত ওষুধ এর ১৫শতাংশ কম সময়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। হিজামা যখন ওষুধের সাথে নেয়া হয় তখন তা ১৫৬ শতাংশ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আর ওষুধ ছাড়া একক ভাবে হিজামা কাজ কড়ে ১৩৩ শতাংশ হারে।

২. দীর্ঘকালীন রোগ কমায়

গবেষণায় আরো পাওয়া গেছে যে, হিজামা থেরাপি ব্যবহারে দীর্ঘমেয়াদী ব্যথার তীব্রতা হ্রাস পায়।

টেস্টের রিপোর্ট থেকে পাওয়া গেছে এক মাস পর ৩৪%, দুই মাস পর ৪০% এবং তিন মাস পর প্রায় ৬০% শতাংশ ব্যথা কমেছে।

রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বা গাঁটে ব্যথা, বাতের ব্যথা, পিঠের ব্যথা ও মেরুদন্ডের ব্যথা, ফিব্রোমায়ালজিয়া, হাটুর অস্ট্রিওআর্থরাইটিস অর্থাৎ হাটু ক্ষয়, হার্নিয়ার সমস্যা, ঘাড় ও কাঁধের ব্যথা, দীর্ঘকালীন পিঠের ব্যথা, মাংশপেশীর ব্যথা, মচকে যাওয়া, পায়ে পানি আসা, ফুলে যাওয়া কিংবা আঘাতের কারণে ফেটে যাওয়ার ব্যথায় হিজামা খুব ভালো কাজ করে।

৩. ভাইরাল এবং ইনফেকশাস রোগ কমায় ও প্রতিরোধ বাড়ায়

হারপিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ভাইরাল হেপাটাইটিস, ব্রণ, ডার্মাটাইটিস, এবং সেলুলাইটিস এসব স্বাস্থ্য সমস্যা যা হিজামা কাপিং থেরাপি দ্বারা চিকিৎসা করা যায়।

একযোগে একাধিক শারীরিক উপশমে ভূমিকা রাখে স্নায়ুতন্ত্রের সিস্টেমে সেরোটোনিন, ডোপামাইন, এন্ডোরিফিনের মতো নিউরোট্রান্সমিটার এর মাধ্যমে।

এছাড়াও হিজামাতে তে যে সাময়িক সংকুচন-প্রসারণ ও কাটা হয় তা প্রতিরোধ সিস্টেমকে সক্রিয় করে রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে।

৪. কার্ডিওভাস্কুলার রোগের জন্য

স্টাডির রিপোর্ট অনুযায়ী উচ্চরক্তচাপ, হার্ট এটাক, হাত-পায়ের খিচুনি, DVT (Deep vein Thrombosis for blood clot in deep vein), মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন যার কারণে ঘাড় ও গলায়, কাঁধে, বাহুতে, পিঠে অথবা চোয়ালে ব্যথা হয় নিয়মিত হিজামা থেরাপিতে কমে।

৫. মাথা ব্যথা কমায়

মানুষকে সরাসরি কষ্ট দেয় এমন রোগ মানেই ব্যথা। আর তাদের ভেতর মাথা ব্যথা অন্যতম। এর কারণে রোগী এতটা দুর্বল হয়ে পড়ে যে সুস্থ ভাবে চিন্তা করতে অক্ষম হয়ে পারে। এমনকি তা আর্থিক কাজেও সমস্যা করে। ভাল খবর হলো ক্লিনিক্যালি হিজামা মাথা ব্যথার জন্য খুব ভালো ওষুধ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।



তাদের এ স্টাডি থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে রোগীরা ২৮ দিনের ভেতর ৩ বার হিজামা করিয়েছে তাদের ব্যথার তীব্রতায় ৬৬% সুস্থতা এসেছে। তাদের এই পেপারের মত হিজামার উপর কৃত অনেক পেপার ই স্বীকার করেছে ক্লিনিক্যালি হিজামা মাথাব্যথার জন্য উপকারী। এছাড়াও হিজামার সাথে অন্যান্য রোগের রিসার্চে হিজামার উপকারিতার কথাই কেবল উঠে এসেছে যা আমাদের

♦♦রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ১৪০০ বছর আগেই বলে গিয়েছিলেন- হযরত আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জিবরীল আমাকে জানিয়েছেন যে, মানুষ চিকিৎসার জন্য যতসব উপায় অবলম্বন করে, তন্মধ্যে হিজামাই হল সর্বোত্তম।”

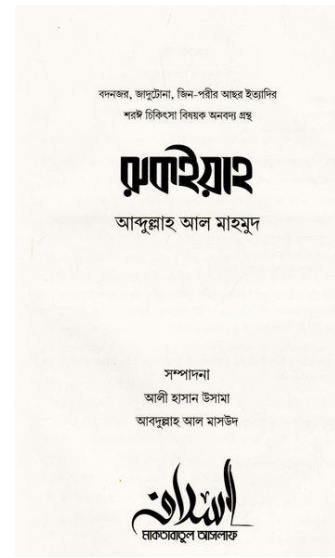
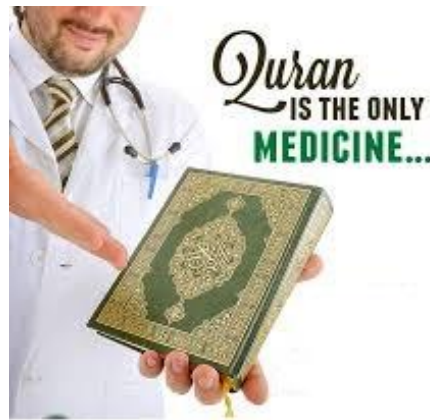
আল-হাকিম, হাদীছ নম্বর : ৭৪৭০

মুখতাসার রুকইয়াহ শারইয়্যাহ / সারসংক্ষেপ রুকইয়াহ শারইয়্যাহ!

[১] অবতরণিকা-

রুকইয়া শারইয়াহ বিষয়ে অনেক লম্বা চওড়া লেখা আছে, ইতোমধ্যে আমাদের রুকইয়াহ শারইয়াহ সিরিজও শেষা আল্লাহর অনুগ্রহে “রুকইয়াহ” (আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ) নামে একটি বইও প্রকাশ হয়েছে। এসব যায়গায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আজ আমরা সংক্ষেপে রুকইয়াহ পরিচিতি এবং বিভিন্ন সমস্যার জন্য রুকইয়াহ করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানবো। বলতে পারেন এই লেখাটি অতীত ও ভবিষ্যতের পুরো রুকইয়াহ সিরিজের সারাংশ।

প্রবন্ধটির প্রথম সংস্করণ ১৭ই জুন ২০১৭তে প্রকাশ হয়েছিল। এরপর অনেক কিছু সংশোধন এবং সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে। এটি পঞ্চম সংস্করণ। এখানে আরও কিছু যোগ করার পরামর্শ থাকলে জানাবেন, আর কোনো পুস্তক-পত্রিকা অথবা ফেসবুকের বাহিরে অন্য কোথাও প্রকাশ করতে চাইলে অনুগ্রহ করে অনুমতি নিবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হিফাজত করুন। আমীন!



[২] প্রাথমিক ধারণা-

রুকইয়া, রুকইয়াহ, রুকিয়া, রুকিয়াহ, রুকাইয়া সহ বিভিন্ন উচ্চারণ প্রচলিত রয়েছে, যার মূল হচ্ছে আরবি শব্দ (رُقِيَّة) আর শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ রুকইয়াহ অথবা রুকইয়া।

রুকইয়াহ কী? - রুকইয়াহ অর্থ ঝাড়ফুঁক করা, মদ্র পড়া, তাবিজ-কবচ, মাদুলি ইত্যাদি আর রুকইয়াহ শারইয়াহ (شريعة رقية) মানে শরিয়াত সম্মত রুকইয়াহ, কোরআনের আয়াত অথবা হাদিসে বর্ণিত দোয়া দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা। তবে স্বাভাবিকভাবে ‘রুকইয়া’ শব্দটি দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা বুঝায়। এই ঝাড়ফুঁক সরাসরি কারো ওপর হতে পারে, অথবা কোনো পানি বা খাদ্যের ওপর করে সেটা খাওয়া অথবা ব্যবহার করা হতে পারে। এক্ষেত্রে রুকইয়ার পানি, অথবা রুকইয়ার গোসল ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহার হয়। আর সবগুলোই সালাফে সালাহিন থেকে বর্ণিত আছে।

রুকইয়ার বিধানঃ রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “রুকইয়াতে যদি শিরক না থাকে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই” (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৫৪৪)

বিশুদ্ধ আক্ফিদাঃ উলামায়ে কিরামের মতে রুকইয়া করার পূর্বে এই আক্ফিদা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া উচিত ‘রুকইয়া বা ঝাড়ফুঁকের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই, সব ক্ষমতা আল্লাহ তা’আলার, আল্লাহ চাইলে শিফা হবে, নইলে নয়’

ফিক্কাহী বিধানঃ ফক্কাহদের মতে রুকইয়াহ বৈধ হওয়ার জন্য ৪ শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যিক, যথা-

১. এতে কোন শিরক বা কুফরির সংমিশ্রণ না থাকা।
২. ঝাড়ফুঁকের নিজের কোন সক্ষমতা আছে; এমন কোন বিশ্বাস না রাখা। বরং বিশ্বাস করা, আল্লাহর ইচ্ছাতেই এর প্রভাব হয়, আল্লাহর হুকুমেই এর দ্বারা আরোগ্য হয়।

৩. এখানে পাঠ করা জিনিসগুলো স্পষ্ট আরবি ভাষায় হওয়া।

৪. যদি অন্য ভাষায় হয়, তবে এমন হওয়া; যার অর্থ স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

রুকইয়া প্রকারভেদঃ বিভিন্ন ভাবে রুকইয়া করা হয়, যেমনঃ দোয়া বা আয়াত পড়ে ফুঁ দেয়া হয়, মাথায় বা আক্রান্ত স্থানে হাত রেখে দোয়া/আয়াত পড়া হয়। এছাড়া পানি, তেল, খাদ্য বা অন্য কিছুতে দোয়া অথবা আয়াত পড়ে ফুঁ দিয়ে খাওয়া এবং ব্যবহার করা হয়।

পূর্বশর্তঃ রুকইয়া করে উপকার পেতে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন।

১. নিয়্যাত (কেন রুকইয়া করছেন, সেজন্য নির্দিষ্টভাবে নিয়্যাত করা)
২. ইয়াক্বিন (এব্যাপারে ইয়াক্বিন রাখা যে, আল্লাহর কালামে শিফা আছে)
৩. মেহনত (অনেক কষ্ট হলেও, সুস্থ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে রুকইয়া চালিয়ে যাওয়া)।

লক্ষণীয়ঃ রুকইয়ার ফায়দা ঠিকমতো পাওয়ার জন্য দৈনন্দিনের ফরজ অবশ্যই পালন করতে হবে, পাশাপাশি সুনাতের প্রতিও যত্নবান হতে হবে। যথাসম্ভব গুনাহ থেকে বাঁচতে হবে। (মেয়েদের জন্য পর্দার বিধানও ফরজ) ঘরে কোনো প্রাণীর ছবি / ভাস্কর্য রাখা যাবেনা। আর সুরক্ষার জন্য সকাল-সন্ধ্যার মাসনুন আমলগুলো

অবশ্যই করতে হবে। আর ইতিমধ্যে শারীরিক ক্ষতি হয়ে গেলে, সেই ঘাটতি পোষানোর জন্য রুকইয়ার পাশাপাশি ডাক্তারের চিকিৎসাও চালিয়ে যেতে হবে।

[৩] বদনজর সমস্যা-

আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ:

বদনজর আক্রান্ত হওয়ার অনেকগুলো লক্ষণ রয়েছে, এর মাঝে কয়েকটি হচ্ছে-

1. পড়ালেখা বা কোন কিছুতে অনেক ভাল ছিল, হঠাৎ ধ্বস নামা।
2. কোন কাজে মনোযোগ না থাকা। নামায, যিকর, পড়াশোনাতে মন না বসা।
3. প্রায়শই শরীর দুর্বল থাকা, ক্ষুধামন্দা, বমি বমি ভাব লাগা।
4. বুক ধড়পড় করা, দমবন্ধ অস্বস্তি লাগা। মেজাজ বিগড়ে থাকা।
5. অতিরিক্ত চুল পড়া। পেটে প্রচুর গ্যাস হওয়া।
6. একেরপর এক অসুখ লেগে থাকা, দীর্ঘ চিকিৎসাতেও ভালো না হওয়া।
7. ব্যবসায়-লেনদেনে ঝামেলা লেগেই থাকা। সব কিছুতেই লস হওয়া।



বদনজরের জন্য রুকইয়াহ:

যদি বুঝা যায় অমুকের জন্য নজর লেগেছে, তাহলে তাকে অযু করতে বলুন, এবং ওযুর পানি গুলো আক্রান্তের গায়ে ঢেলে দিন। এরপর চাইলে ভালো পানি দিয়ে গোসল করুন। এতটুকুতেই নজর ভালো হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ।

আর বদনজরের সেলফ রুকইয়া হচ্ছে, বদনজরের রুকইয়া তিলাওয়াত করবেন, অথবা তিলাওয়াত শুনবেন (ডাউনলোড লিংক নিচে)। এর পাশাপাশি ১ম অথবা ২য় নিয়মে রুকইয়ার গোসল করবেন। আর এভাবে লাগাতার ৩ থেকে ৭ দিন করবেন। প্রয়োজনে কয়েকদিন বিরতি দিয়ে আবার শুরু করুন, প্রতিদিন কয়েকবার রুকইয়া শুনুন, আর একবার রুকইয়ার গোসল করুন। এভাবে সমস্যা ভালো হওয়া পর্যন্ত করতে থাকুন। সমস্যা ভালো হওয়ার পরেও কয়েকদিন রুকইয়াহ করা উচিত।

[৪] রুকইয়ার গোসল-



১ম নিয়ম: একটা বালতিতে পানি নিবেন। তারপর পানিতে দুইহাত ডুবিয়ে যেকোনো দরুদ শরিফ, সুরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি, সুরা ইখলাস, ফালাক, নাস, শেষে আবার কোনো দরুদ শরিফ-সব ৭বার করে পড়বেন। পড়ার পর হাত উঠাবেন এবং এই পানি দিয়ে গোসল করবেন।

২য় নিয়ম: একটা বালতিতে পানি নিন। ওপরের দোয়া-কালামগুলো পড়ুন আর মাঝেমাঝে ফুঁ দিন। এরপর ওই পানি ইদিয়ে গোসল করুন।

ওয় নিয়ম: (জাদুর সমস্যার জন্য বিশেষভাবে উপকারী বরই পাতার গোসল) এটা বরই পাতা বেটে পানিতে গুলিয়ে নিন, এবং সেখানে আয়াতুল কুরসি, সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস- ওবার করে পড়ে ফুঁ দিন। এরপর এই পানি থেকে তিন ঢোক পান করুন, আর বাকিটা দিয়ে গোসল করুন।

(যদি টয়লেট আর গোসলখানা একসাথে থাকে, তাহলে অবশ্যই বালতি বাহিরে এনে এসব পড়বেন। প্রথমে এই পানি দিয়ে গোসল করে এরপর চাইলে অন্য পানি দিয়ে ইচ্ছামত গোসল করতে পারেন। যার সমস্যা সে পড়তে না পারলে অন্য কেউ তার জন্য পড়বে, এবং অসুস্থ ব্যক্তি শুধু গোসল করবেন।)

[৫] জিনের স্পর্শ-

আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ:

জিন দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার অনেকগুলো লক্ষণ রয়েছে, এরমধ্যে কয়েকটি হচ্ছে-

1. রাতে ঠিকমত ঘুমাতে না পারা। ঘুমালেও বারবার জেগে ওঠা।
2. প্রায়শই ঘুমের মাঝে বোবা ধরা।
3. ভয়ংকর স্বপ্ন দেখা। উঁচু থেকে পড়ে যেতে, কোন প্রাণীকে আক্রমণ করতে দেখা।
4. দীর্ঘ মাথাব্যথা, অথবা অন্য কোন অঙ্গে সবসময় ব্যথা থাকা।
5. নামাজ, তিলাওয়াত, যিকির আযকারে আগ্রহ উঠে যাওয়া।
6. মেজাজ বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকা, একটুতেই রেগে যাওয়া।

7. আযান বা কোরআন তিলাওয়াত সহ্য না হওয়া।

জ্বিনের আসরের জন্য রুকুইয়াহ:

যিনি রুকুইয়া করবেন তিনি প্রথমে সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক, সুরা নাস পড়ে হাতে ফুঁ দিয়ে নিজের শরীরে হাত বুলিয়ে নিবেন। এরপর রুকুইয়া শুরু করবেন। রুগীর পাশে বসে জোর আওয়াজে রুকুইয়ার আয়াতগুলো পড়তে থাকুন। রুকুইয়ার অনেক আয়াত আছে সেগুলো শেষে বলা হবে। তবে জ্বিনের রোগীর রুকুইয়ার জন্য স্বাভাবিকভাবে-

১. সুরা ফাতিহা

২. আয়াতুল কুরসি

৩. বাকারার শেষ ২ আয়াত

৪. সুরা ইখলাস, ফালাক, সুরা নাস। সম্ভব হলে এর সাথে-

৫. সুরা মু'মিনূনের ১১৫-১১৮ নং আয়াত

৬. সুরা সফফাতের প্রথম ১০ আয়াত এবং

৭. সুরা জিনের ১-৯ আয়াত পড়া যেতে পারে।

জ্বিন ছেড়ে দেয়া পর্যন্ত এগুলো বারবার পড়তে থাকুন, পড়ার মাঝেমাঝে রুগীর ওপর ফুঁ দিতে পারেন, (বৈধ ক্ষেত্রে) মাঝেমাঝে রুগীর মাথায় হাত রেখে পড়ুন। আর পানিতে ফুঁ দেয়ার পর মুখে এবং হাতে-পায়ে ছিটিয়ে দিন। জিন কথা বলতে শুরু করলে মাঝেমাঝে তাকে চলে যাওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ দিতে হবে, এরপর আবার অবিরত তিলাওয়াত চালু রাখতে হবে। জ্বিনের রুগীর ক্ষেত্রে সাধারণত কথাবার্তা বলে জ্বিন বিদায় করতে হয়। এক্ষেত্রে জ্বিনের কথায় ঘাবড়ানো যাবেনা,

তার কথা সহজে বিশ্বাসও করা যাবে না। হুমকিধামকি দিলে তাকেই উল্টা ধমক দিতে হবে। মোট কথা, যিনি রুকইয়া করবেন তাঁকে উপস্থিতবুদ্ধির পরিচয় দিতে হবে। একদিনে না গেলে পরপর কয়েকদিন কয়েকঘন্টা করে এভাবে রুকইয়া করে যেতে হবে। ইনশাআল্লাহ এক পর্যায়ে জ্বিন পালাতে বাধ্য হবে।

[৬] বাড়িতে জ্বিনের উৎপাত থাকলে-

বাড়িতে জ্বিনের কোনো সমস্যা থাকলে পরপর তিনদিন পূর্ণ সুরা বাক্বারা তিলাওয়াত করুন, এরপর আযান দিন। তাহলে ইনশাআল্লাহ সমস্যা ঠিক হয়ে যাবে। তিলাওয়াত না করে প্রতিদিন যদি সুরা বাক্বারা প্লে করা হয় তাহলেও ফায়দা পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। তবে সবচেয়ে ভালো ফল পেলে তিলাওয়াত করা উচিত। এরপর প্রতিমাসে অন্তত এক দুইদিন সুরা বাক্বারা পড়বেন। অধিক ফায়দার জন্য চাইলে সুরা বাক্বারা পড়া শেষে পানিতে ফুঁ দেয়ার পর পুরো বাড়িতে ছিটিয়ে দিতে পারেন।

আর ঘরে প্রবেশের সময়, বের হবার সময়, দরজা-জানালা বন্ধের সময় বিসমিল্লাহ বলবেন। সন্ধ্যা বেলায় জানালা বন্ধ রাখবেন। ঘরে কোন প্রাণী বা মানুষের ছবি অথবা মূর্তি ঝুলিয়ে রাখবেন না। ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই সমস্যা কেটে যাবে।

[৭] যাদুগ্রন্থ-



জাদু বা ব্ল্যাক ম্যাজিকে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ:

অনেক সময় যাদু করতে জ্বিনের সাহায্য নেয়া হয়, তাই যাদুগ্রন্থ রোগীর মাঝে জিন আক্রান্তের কিছু লক্ষণও দেখা যেতে পারে। এছাড়াও যাদুগ্রন্থ রোগীর মাঝে কিছু বিশেষ লক্ষণ দেখা যেতে পারে যেমন:

1. হঠাৎ কারও প্রতি বা কোন কিছুর প্রতি তীব্র ভালবাসা অথবা ঘৃণা তৈরি হওয়া, যা আগে ছিল না।
2. বিশেষ কোন কারন ছাড়াই জটিল-কঠিন রোগে ভোগা। যার চিকিৎসা করলেও সুস্থ না হওয়া।
3. পরিবারের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি লেগেই থাকা। বিশেষতঃ স্বামীস্ত্রীর মাঝে।
4. দৃষ্টিভঙ্গি বা ব্যক্তিত্বে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যাওয়া। যাতে নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, চারপাশের মানুষও কষ্ট পায়।

5. অদ্ভুত আচরণ করা। যেমন, কোন কাজ একদমই করতে না চাওয়া। কিংবা দিন-রাতের নির্দিষ্ট কোন সময়ে ঘরের বাইরে যেতে না চাওয়া।

6. মেরুদণ্ডের নিচের দিকে ব্যাথা করা।

7. বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত মেজাজ খারাপ, মাথা ব্যথা অথবা অসুস্থ থাকা।

যাদু আক্রান্ত হলে বুঝার উপায়:

ওপরের এক বা একাধিক লক্ষণের সাথে মিল পাওয়া যাবে আর যাদু আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর রুকইয়ার আয়াতগুলো পড়লে, অথবা অডিও শুনলে অস্বাভাবিক অনুভূতি হবে। যেমন, প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, বমি আসা, বুক ধড়ফড় করা, শরীর অবশ হয়ে আসা ইত্যাদি।

জাদুর সমস্যার জন্য রুকইয়া:

সমস্যার ধরণ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার রুকইয়া করতে পরামর্শ হয়। তবে প্রসিদ্ধ সেলফ রুকইয়া হচ্ছে- প্রথমে সমস্যার জন্য নিয়াত ঠিক করে, ইস্তিগফার দরুদ শরিফ পড়ে শুরু করুন। তারপর রুকইয়ার আয়াতগুলো পাঠ করে অথবা কোন রুকইয়া শুনে নিশ্চিত হয়ে নিন আসলেই সমস্যা আছে কি না! শাইখ সুদাইস অথবা লুহাইদানের রুকইয়া শুনে পারেন (ডাউনলোড লিংক নিচে)। সবশেষে একটি পাত্রে পানি নিন, এরপর নিচের আয়াতগুলো ৩বার অথবা ৭বার করে পড়ুন, পড়ার মাঝেমাঝে পানিতে ফুঁ দিন-

ক. সুরা ফাতিহা এবং আয়াতুল কুরসি

খ. সুরা আ'রাফ ১১৭-১২২, ইউনুস ৮১-৮২ সুরা ত্বহা ৬৯নং আয়াত

وَبَطَلَ الْحَقُّ فَوْقَ - يَأْفِكُونَ مَا تَلَقَّفُ هِيَ فَإِذَا عَصَاكَ أَتَى أَنْ مُوسَى إِلَى وَأَوْحَيْنَا ١٠
 قَالُوا- سَاجِدِينَ السَّحَرَةَ وَالْقِي - صَاغِرِينَ وَانْقَلَبُوا هُنَالِكَ فَعَلِبُوا - يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا
 - وَهَارُونَ مُوسَى رَبِّ - الْعَالَمِينَ رَبِّ آمَنَّا

يُصْلِحُ لَا إِلَهَ إِلَّا سَيُبْطِلُهُ اللَّهُ إِنَّ السَّحَرَ بِهِ جِئْتُمْ مَا مُوسَى قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا ٢٠
 - الْمُجْرِمُونَ وَلَوْ كَرِهَ بِكَلِمَاتِهِ الْحَقُّ اللَّهُ وَيُحِقُّ - الْمُفْسِدِينَ عَمَلِ

السَّاحِرُ يُفْلِحُ وَلَا سَاحِرٌ كَيْدُ صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا مَا تَلَقَّفَ يَمِينِكَ مَا فِي وَأَلْقَى ٣٠
 - أَتَى حَيْثُ

গ. এরপর সুরা ইখলাস, ফালাক, নাস- সব ৩বার করে।

সমস্যা অনুযায়ী সাতদিন অথবা এরচেয়ে বেশি সময় যাবত প্রতিদিন সকাল-বিকাল
 এই পানি খেতে হবে, এবং গোসলের পানিতে মিশিয়ে গোসল করতে হবে। আর
 জাদুর সমস্যার থেকে সুস্থতা লাভের নিয়ত করে প্রতিদিন রুকইয়ার আয়াতগুলো
 তিলাওয়াত করতে হবে, অথবা দেড়-দুইঘণ্টা রুকইয়ার অডিও শুনতে হবে। কোন
 ক্লারির সাধারণ রুকইয়া একবার, আর সুরা ইখলাস, ফালাক, নাসের রুকইয়াহ
 একাধিকবার (ডাউনলোড লিংক নিচে)। এর পাশাপাশি আল্লাহর কাছে সুস্থতার জন্য
 দোয়া করতে হবে।

এভাবে রুকইয়াহ করার পর সপ্তাহ শেষে আপনার অবস্থা পর্যালোচনা করুন,
 প্রয়োজনে চিকিৎসার মেয়াদ বাড়িয়ে নিন। রুকইয়াহ চলাকালীন সমস্যা বেড়ে
 গেলেও বাদ দিবেন না, হাল ছাড়বেন না। সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া পর্যন্ত রুকইয়া অবিরত
 রাখুন।

দ্বিতীয়ত: শুরুতে বর্ণনা করা রুকইয়ার গোসলগুলোর মাঝে ৩য় পদ্ধতিটি জাদুর চিকিৎসায় খুব উপকারী। সমস্যা বেশি হলে প্রথমে কয়েকদিন উল্লেখিত নিয়মে বরই পাতার গোসল করে এরপর সেলফ রুকইয়াহ শুরু করা যেতে পারে। ইনশাআল্লাহ খুব দ্রুতই জাদুর সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন।

যাদুর কোন জিনিশ অথবা তাবিজ খুঁজে পেলেন:

সন্দেহজনক কোন তাবিজ পেলে অথবা কি দিয়ে যাদু করেছে যদি পাওয়া যায়, তাহলে সেসব বের করে আলাদা আলাদা করে ফেলুন, কোন গিরা বা বাধন থাকলে কেটে ফেলুন, শক্ত কিছু দিয়ে বাধা থাকলে ভেঙ্গে ফেলুন। এরপর একটা পাত্রে পানি নিয়ে ওপরে বলা জাদুর রুকইয়ার আয়াতগুলো পড়ে পানিতে ফুঁ দিন, এরপর তাবিজ অথবা যাদুর জিনিশগুলো ডুবিয়ে রাখুন কিছুক্ষণ, তাহলে ইনশাআল্লাহ যাদু নষ্ট হয়ে যাবে। পরে সেগুলো পুড়িয়ে বা নষ্ট করে ফেলুন।

[৮] একাধিক সমস্যায় আক্রান্ত হলে:

একসাথে যাদু, জ্বিন কিংবা বদনজর সম্পর্কিত একাধিক সমস্যায় আক্রান্ত হলে প্রথমে কিছুদিন বদনজরের জন্য রুকইয়া করতে হবে, এরপর জ্বিনের জন্য এবং যাদুর জন্য রুকইয়া করতে হবে। এর মাঝেমাঝে শারীরিক রোগব্যাধির জন্য চিকিৎসা নেয়া বা ডাক্তারের ঔষধ সেবন করতেও কোন সমস্যা নেই। কিন্তু রুকইয়াহ করার কারণে ব্যাথা শুরু হলে এজন্য ঔষধ খাবেন না। বরং রুকইয়ার গোসল করলে অনেকটা স্বস্তি পাবেন ইনশাআল্লাহ।

[৯] ওয়াসওয়াসা রোগ-

আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ:

1. অকারণে সর্বদা চিন্তিত থাকা। মাথায় বিক্ষিপ্ত চিন্তা ঘোরাঘুরি করার কারণে কোন কিছুতে মন দিতে না পারা।
2. ওযু-গোসল অথবা নামাজের বিশুদ্ধতা নিয়ে অতিরিক্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকা।
3. পরীক্ষার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করা। টয়লেট বা গোসলখানায় অতিরিক্ত সময় ব্যয় করা। এক অঙ্গ বারবার ধোয়া, এরপরেও তৃপ্ত হতে না পারা।
4. বারবার মনে হওয়া ওযু ভেঙ্গে যাচ্ছে, অথবা প্রসাবের ফোঁটা পড়ছে, অথবা বায়ু বের হয়ে যাচ্ছে। বিশেষতঃ নামাজের সময় এমন হওয়া।
5. আল্লাহ তা'আলা, রাসূল ﷺ অথবা ইসলামের ব্যাপারে বারবার মাথায় অবমাননাকর চিন্তা আসা।
6. বারবার নামাজের রাকাত ভুলে যাওয়া, কিরাত, রুকু-সাজদা ইত্যাদির ব্যাপারে সন্দেহে ভোগা।

সমস্যা বেশিদিন পুরনো হয়ে গেলে এসব থেকে আরও শারীরিক-মানসিক সমস্যা তৈরি হতে পারে। আর জিন সংক্রান্ত কোন সমস্যা (জিনের বদনজর বা জিনের আসর) থাকলেও ওয়াসওয়াসার সমস্যা প্রকট হতে পারে।

ওয়াসওয়াসার প্রতিকার-

১. এই দোয়াটি বেশি বেশি পড়া। প্রতি নামাজের আগে-পরে, অন্যান্য ইবাদতের সময়, কোন গুনাহের জন্য ওয়াসওয়াসা অনুভব করলে এটা পড়া -

هَمَزَاتٍ مِنْ وَ عِبَادِهِ، وَشَرِّ وَعِقَابِهِ، غَضَبِهِ مِنَ التَّائِمَاتِ، اللَّهُ بِكَلِمَاتٍ أَعُوذُ
يَحْضُرُونَ وَأَنْ الشَّيَاطِينِ،

ঈমান নিয়ে সংশয় উদিত হলে পড়া (সূরা হাদীদ, আয়াত নং ৩)

عَلَيْكُمْ شَيْءٌ بِكُلِّ وَهُوَ ۖ وَالْبَاطِنُ وَالظَّاهِرُ وَالْآخِرُ الْأَوَّلُ هُوَ

[এছাড়া "আমানতু বিল্লাহ বলা" এবং "সূরা ইখলাস পড়ার" কথাও বর্ণিত হয়েছে]
এবং এরপর ওয়াসওয়াসা পাত্তা না দিয়ে অন্য কিছুতে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া।

২. পুরুষ হলে জামাআতের সাথে নামাজ পড়া, মুত্তাকী পরহেজগারদের সাথে
উঠাবসা করা।

৩. নামাজে ওয়াসওয়াসা হলে বামে হালকা করে ওবার খুতু ফালানো। আর রাকাত
ভুলে গেলে- মনে থাকাকাম সংখ্যাটা ধরে, এরপর প্রতি রাকাতে আত্মাহিয়াতু পড়া,
আর নামাজের শেষে সাহ্ সাজদা দেয়া।

৫. সকাল-সন্ধ্যায় ও ঘুমের আগের আমলগুলো গুরুত্বের সাথে করা। টয়লেটে
প্রবেশের দোয়া পড়া।

৬. আয়াতুল হারক (আযাব এবং জাহান্নাম সংক্রান্ত আয়াত) বেশি বেশি তিলাওয়াত
করা। এবং প্রতিদিন এসবের তিলাওয়াত শোনা। (ডাউনলোড লিংক নিচে)

৭. সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি, ইখলাস, ফালাক, নাস - ওবার করে। এরপর শুধু
সূরা নাস অনেক বার (৭বার/৩৩বার/আরও বেশি) পড়ে পানি আর অলিভ অয়েলে
ফুঁ দেয়া। এরপর সুস্থতার নিয়াতে প্রতিদিন ২-৩ বেলা এই পানি পান করা। মাথায়
এবং বুকে অলিভ অয়েল ব্যবহার করা।

৮. বদনজর বা জিনের সমস্যা থাকলে সে অনুযায়ী রুকইয়াহ করা। যথাসম্ভবত ওয়াসওয়াসা পাত্তা না দেয়া; ইগনোর করা, এমনকি মুখে বিরক্তির ভাবও প্রকাশ না করা। আর আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকা।

[১০] সাধারণ অসুস্থতার জন্য রুকইয়াহ:

বিভিন্ন অসুখ-বিসুখের রুকইয়ার জন্য রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম রা. এবং বিভিন্ন যুগের সালাফদের থেকে অনেক দু’আ-কালাম পাওয়া যায়, সুস্থতা লাভের নিয়াতে সেসব গুরুত্বের সাথে পড়া।

যেমন, কোরআন থেকে প্রসিদ্ধ কয়েকটি রুকইয়া হচ্ছে- সূরা ফাতিহা, ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস এবং ৬টি আয়াতে শিফা- (সূরা তাওবাহ/১৪, ইউনূস/৫৭, নাহল/৬৯, বানী ইসরাইল/৮২, শু’আরা/৮০, ফুসসিলাত/৪৪)

১. مُؤْمِنِينَ قَوْمٍ صُدُورَ وَيَشْفِ
২. لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً وَهُدًى الصُّدُورِ فِي لِمَا وَشِفَاء
৩. لِلنَّاسِ شِفَاء فِيهِ أَلْوَانُهُ مُخْتَلِفٌ شَرَابٌ بُطُونَهَا مِنْ يَخْرُجُ
৪. لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً شِفَاء هُوَ مَا الْقُرْآنِ مِنْ وَنَزَّلُ
৫. يَشْفِينِ فَهُوَ مَرَضْتُ وَإِذَا
৬. وَشِفَاء هُدًى آمَنُوا لِلَّذِينَ هُوَ قُلُ

এছাড়া রাসুল স. থেকে বর্ণিত রুকইয়ার উপযোগী অনেক দো’আ আছে, যেমন-

لَا شِفَاءَ شِفَاؤُكَ إِلَّا شِفَاءَ لَا الشَّافِي وَأَنْتَ اشْفِهِ الْبَاسَ، أَذْهَبَ النَّاسِ رَبِّ اللَّهُمَّ ۱.
سَقَمًا يُغَادِرُ

اللَّهُ حَاسِدٍ، عَيْنٍ أَوْ نَفْسٍ كُلِّ شَرٍّ مِنْ يُؤْذِيكَ، شَيْءٍ كُلِّ مِنْ أَرْقِيكَ، اللَّهُ بِسْمِ ٢.
أَرْقِيكَ اللَّهُ بِسْمِ يَشْفِيكَ

ذِي كُلِّ وَشَرٍّ حَسَدٍ، إِذَا حَاسِدٍ شَرٍّ وَمِنْ يَشْفِيكَ، دَاءٍ كُلِّ وَمِنْ يُبْرِيكَ، اللَّهُ بِسْمِ ٣.
عَيْنٍ

يَشْفِيكَ أَنْ الْعَظِيمِ، الْعَرْشِ رَبِّ الْعَظِيمِ، اللَّهُ أَسْأَلُ ٤.

وَأَحَازِرُ أَجْدُ مَا شَرٍّ مِنْ وَقْدَرْتِهِ، اللَّهُ بِعِزَّةِ أَعُوذُ اللَّهُ، بِسْمِ اللَّهِ، بِسْمِ ٥.

এসব আয়াত এবং দোয়াগুলো ৩বার অথবা ৭বার পড়ুন, ব্যাথার যায়গায় অথবা
রুগীর মাথায় হাত রেখে পড়ুন, অথবা এসব পড়ার পর রুগীর ওপর ফুঁ দিন। পানিতে
ফুঁ দিয়ে পান করুন, গোসল করুন অথবা অলিভ অয়েলে ফুঁ দিয়ে মালিশ করুন।
মধু-কালোজিরায়ে ফুঁ দিয়ে প্রতিদিন পানিতে গুলিয়ে খান। এসবের পাশাপাশি শাইখ
লুহাইদান অথবা সা'দ আল গামিদির রুকইয়াহ শোনা যেতে পারে। (ডাউনলোড
লিংক নিচে)

[১১] শিশুদের জন্য রুকইয়ার নিয়ম:

শুরুতে মনে মনে নিয়াত করে নিন কোন সমস্যার জন্য রুকইয়াহ করবেন, এরপর
শিশুর মাথায় হাত রেখে কয়েকবার এই দুয়াটি পড়ুন, আর মাঝেমাঝে দিন। চাইলে
সাথে ওপরের দোয়াগুলোও পড়া যেতে পারে।

لَا مَظْهَرُ عَيْنٍ كُلِّ وَمِنْ ، وَهَامَّةٍ شَيْطَانٍ كُلِّ مِنْ ، التَّامَّةِ اللَّهُ بِكَلِمَاتٍ أُعِيدُكُمْ

এরপর সুরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি এবং সুরা ইখলাস, ফালাক, নাস - ৩ বার করে
পড়া।

সমস্যার মাত্রা বেশি হলে উল্লেখিত পদ্ধতিতে রুকইয়া করা শেষে আরেকবার এগুলো পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে পান করান এবং গোসল করান। সমস্যা ভালো হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন রুকইয়াহ এবং এই কাজগুলো করতে থাকুন। এছাড়া কোন অঙ্গে বিশেষ রোগব্যাধি থাকলে এসব দোয়া-কালাম পড়ে অলিভ অয়েল বা কালোজিরার তেলে ফুঁ দিয়ে প্রতিদিন মালিশ করা।

ছোটদের পাশাপাশি বড়দের মাঝে কেউ নিজে নিজে রুকইয়াহ করতে অক্ষম হলে তার ওপরেও একই নিয়মে রুকইয়াহ করা যায়।

[১২] রুকইয়ার আয়াত:

কোরআন মাজিদের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা রুকইয়া করা হয়, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কিছু আয়াত হচ্ছে-

1. সুরা ফাতিহা
2. সুরা বাকারা ১-৫
3. সুরা বাকারাহ ১০২
4. সুরা বাকারাহ ১৬৩-১৬৪
5. সুরা বাকারাহ ২৫৫
6. সুরা বাকারাহ ২৮৫-২৮৬
7. সুরা আলে ইমরান ১৮-১৯
8. সুরা আ'রাফ ৫৪-৫৬

9. সূরা আ'রাফ ১১৭-১২২
10. সূরা ইউনুস ৮১-৮২
11. সূরা ত্বহা ৬৯
12. সূরা মু'মিনুন ১১৫-১১৮
13. সূরা সফফাত ১-১০
14. সূরা আহকাফ ২৯-৩২
15. সূরা আর-রাহমান ৩৩-৩৬
16. সূরা হাশর ২১-২৪
17. সূরা জিন ১-৯
18. সূরা ইখলাস
19. সূরা ফালাক
20. সূরা নাস

এই আয়াতগুলো একসাথে পিডিএফ করা অবস্থায় নিচে লিংক দেয়া ওয়েবসাইটে পাবেন।

[১৩] যাদু, জিন, শয়তান ইত্যাদির ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায়:

১. প্রতিটি কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা। যেমন, খাবার পূর্বে, ঘরে ঢুকতে - বের হতে, দরজা-জানালা বন্ধ করতে ইত্যাদি।

২. বিষ, যাদু এবং অন্যান্য ক্ষতি থেকে বাঁচতে সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়া তিনবার পড়াঃ

خَلَقَ مَا شَرَّ مِنَ النَّامَاتِ اللَّهُ بِكَلِمَاتٍ أَعُوذُ

আ’উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্তা-স্মা-তি, মিৎ-শাররি মা-খলাফ্ফা (জামে তিরমিযী, ৩৫৫৯)

৩. সব ধরনের ক্ষতি এবং বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ থাকতে এই দোয়া সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পড়াঃ

الْعَلِيمُ السَّمِيعُ وَهُوَ السَّمَاءِ فِي وَلَا الْأَرْضِ فِي شَيْءٍ اسْمِهِ مَعَ يَضُرُّ لَا الَّذِي اللَّهُ بِسْمِ

বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা-ইয়াদুররু মা’আসমিহী, শাইউং ফিলআরদ্বী ওয়ালা- ফিসসামা-ই, ওয়াহুওয়াস সামি’উল ‘আলীমা (জামে তিরমিযী, ৩৩৩৫)

৪. প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক, সুরা নাস তিনবার করে পড়া। এবং এটা বিশেষ গুরুত্বের সাথে করা। (সুনানে আবি দাউদ)

৫. ঘুমের আগে আয়াতুল কুরসি এবং সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়া। সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক, সুরা নাস পড়ে হাতের তালুতে ফু দিয়ে পুরো শরীরে হাত বুলিয়ে নেয়া। (বুখারী)

৬. টয়লেটে ঢোকান পূর্বে দোয়া পড়া-

وَالْخَبَائِثِ الْخُبْثِ مِنْ بِكَ أَعُوذُ إِنِّي اللَّهُمَّ

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ’উযুবিকা, মিনাল খুবসি ওয়াল খবা-ইছা (মুসলিম, ৩৭৫)

৭. তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া প্রতিদিনের অন্যান্য মাসনুন আমল করতে থাকা এবং আল্লাহর কাছে সবসময় দোয়া করতে থাকা।

(সংক্ষেপে বিভিন্ন সমস্যার জন্য ইসলাম সম্মত ঝাড়ফুক) - রচনায়:

আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ- প্রথম প্রকাশ: ১৭ - জুন - ২০১৭- সর্বশেষ

আপডেট: (৫.০) পঞ্চম সংস্করণ, ০৭ - আগস্ট - ২০১৯-

রুকইয়াহ অডিও ডাউনলোড:

<https://ruqyahbd.org/download>- রুকইয়াহ সাপোর্ট

গ্রুপ: <https://facebook.com/groups/ruqyahbd>-

রুকইয়াহ বিষয়ক অন্যান্য তথ্যের জন্য: www.ruqyahbd.org

যাদুটোনা থেকে নিরাময়ের উপায়

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যাদুটোনায় আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে: এক: যাদুকর কিভাবে যাদু করেছে সেটা আগে জানতে হবে। উদাহরণতঃ যদি জানা যায় যে, যাদুকর কিছু চুল নির্দিষ্ট কোন স্থানে অথবা চিরুনির মধ্যে অথবা অন্য কোন স্থানে রেখে দিয়েছে। যদি স্থানটি জানা যায় তাহলে সে জিনিসটি পুড়িয়ে ফেলে ধ্বংস করে ফেলতে হবে যাতে যাদুর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়, যাদুকর যা করতে চেয়েছে সেটা বাতিল হয়ে যায়। দুই: যদি যাদুকরকে শনাক্ত করা যায় তাহলে তাকে বাধ্য করতে হবে যেন সে যে যাদু করেছে সেটা নষ্ট করে ফেলো। তাকে বলা হবে: তুমি যে তদবির করেছ সেটা নষ্ট কর নতুবা তোমার গর্দান যাবো। সে যাদুর তদবিরটি ধ্বংস করে ফেলার পর মুসলিম শাসক তাকে হত্যা করার নির্দেশ

দিবেন। কারণ বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, যাদুকরকে তওবার আহ্বান জানানো ছাড়া হত্যা করা হবো যেমনটি করেছেন- উমর (রাঃ)।



নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন:

“যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে তরবারির আঘাতে তার গর্দান ফেলে দেয়া।” যখন হাফসা (রাঃ) জানতে পারলেন যে, তাঁর এক বাঁদি যাদু করে তখন তাকে হত্যা করা হয়।

তিন: যাদু নষ্ট করার ক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁকের বড় ধরনের প্রভাব রয়েছে: এর পদ্ধতি হচ্ছে- যাদুতে আক্রান্ত রোগীর উপর অথবা কোন একটি পাত্রে আয়াতুল কুরসি অথবা সূরা আরাফ, সূরা ইউনুস, সূরা ত্বহা এর যাদু বিষয়ক আয়াতগুলো পড়বে। এগুলোর সাথে সূরা কাফিরুন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়বে এবং রোগীর জন্য দোয়া করবে। বিশেষতঃ যে দুআটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে:

“আল্লাহুম্মা, রাব্বান নাস! আযহিবিল বা’সা ওয়াশফি, আনতাশ শাফি। লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআন লা যুগাদিরু সাকামা।”

(অর্থ- হে আল্লাহ! হে মানুষের প্রতিপালক! আপনি কষ্ট দূর করে দিন ও আরোগ্য দান করুন। (যেহেতু) আপনিই রোগ আরোগ্যকারী। আপনার আরোগ্য দান হচ্ছে প্রকৃত আরোগ্য দান। আপনি এমনভাবে রোগ নিরাময় করে দিন যেন তা রোগকে নির্মূল করে দেয়।)

জিব্রাইল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে দোয়া পড়ে ঝাড়ফুঁক করেছেন সেটাও পড়া যেতে পারে। সে দু'আটি হচ্ছে- “বিসমিল্লাহি আরফ্বিকা মিন কুল্লি শাইয়িন যুফিকা ওয়া মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও আইনিন হাসিদিন; আল্লাহু ইয়াশফিকা বিসমিল্লাহি আরফ্বিকা”

(অর্থ- আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি। সকল কষ্টদায়ক বিষয় থেকে। প্রত্যেক আত্মা ও ঈর্ষাপরায়ণ চক্ষুর অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য করুন। আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি।)

এই দোয়াটি তিনবার পড়ে ফুঁ দিবেন। সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিনবার পড়ে ফুঁ দিবেন। আমরা যে দোয়াগুলো উল্লেখ করলাম এ দোয়াগুলো পড়ে পানিতে ফুঁ দিতে হবে। এরপর যাদুতে আক্রান্ত ব্যক্তি সে পানি পান করবে। আর অবশিষ্ট পানি দিয়ে প্রয়োজনমত একবার বা একাধিক বার গোসল করবে। তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় রোগী আরোগ্য লাভ করবে। আলেমগণ এ আমলগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আব্দুর রহমান বিন হাসান (রহঃ) ‘ফাতহুল মাজিদ শারহু কিতাবিত তাওহিদ’ গ্রন্থের ‘নাশরা অধ্যায়ে’ এ বিষয়গুলো ও আরো কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন। চার: সাতটি কাঁচা বরই পাতা সংগ্রহ করে পাতাগুলো গুঁড়া করবে। এরপর গুঁড়াগুলো পানিতে মিশিয়ে সে পানিতে উল্লেখিত আয়াত ও দোয়াগুলো পড়ে ফুঁ দিবে। তারপর সে পানি পান করবে; আর কিছু পানি দিয়ে গোসল করবে। যদি কোন পুরুষকে স্ত্রী-সহবাস থেকে অক্ষম করে রাখা হয় সেক্ষেত্রেও এ আমলটি উপকারী। সাতটি বরই পাতা পানিতে ভিজিয়ে রাখবে। তারপর সে পানিতে উল্লেখিত আয়াত ও দোয়াগুলো পড়ে ফুঁ দিবে। এরপর সে পানি পান করবে ও কিছু পানি দিয়ে গোসল করবে।

যাদুগ্রস্ত রোগী ও স্ত্রী সহবাসে অক্ষম করে দেয়া ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য বরই পাতার পানিতে যে আয়াত ও দোয়াগুলো পড়তে হবে সেগুলো নিম্নরূপ:

১- সূরা ফাতিহা পড়া।

২- আয়াতুল কুরসি তথা সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াত পড়া।

فِي وَمَا السَّمَوَاتِ فِي مَا لَهُ نَوْمٌ وَلَا سِنَّةٌ تَأْخُذُهُ لَا الْقَيُّومُ الْحَيُّ هُوَ إِلَّا إِلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَلَا ۤ خَلْفَهُمْ وَمَا بَيْنَ مَا يَعْلَمُ ۖ بِأَذْنِهِ إِلَّا عِنْدَهُ يَشْفَعُ الَّذِي ذَا مَنْ الْأَرْضِ
يُؤَدُّهُ وَلَا ۚ وَالْأَرْضَ السَّمَوَاتِ كُرْسِيِّهِ وَسِعَ شَاءَ بِمَا إِلَّا عِلْمِهِ مِّنْ بِشَيْءٍ يُحِيطُونَ
الْعَظِيمُ الْعَلِيُّ وَهُوَ حِفْظُهُمَا

(আয়াতটির অর্থ হচ্ছে-“আল্লাহ্; তিনি ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারকা তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আসমানসমূহে যা কিছু রয়েছে ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে সে সবকিছু তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তাঁর ‘কুরসী’ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। তিনি সুউচ্চ সুমহান।)

৩- সূরা আরাফের যাদু বিষয়ক আয়াতগুলো পড়া। সে আয়াতগুলো হচ্ছে-

فَإِذَا عَصَاهُ فَأَلْقَى (106) الصَّادِقِينَ مَنْ كُنْتَ إِِنْ بِهَا فَأَتِ بِآيَةٍ جِئْتَ كُنْتَ إِِنْ قَالَ
مِنَ الْمَلَأُ قَالَ (108) لِلنَّاظِرِينَ بَيَضَاءُ هِيَ فَإِذَا يَدُهُ وَنَزَعَ (107) مُبِينٌ تُعْبَانُ هِيَ
فَمَاذَا أَرْضَكُمْ مِنْ يُخْرِجَكُمْ أَنْ يُرِيدُ (109) عَلِيمٌ لِّسَاحِرٍ هَذَا إِنَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَ
بِكُلِّ يَأْتُوكَ (111) حَاشِرِينَ الْمَدَائِنِ فِي وَأَرْسِلْ وَأَخَاهُ أَرْجِهْ قَالُوا (110) تَأْمُرُونَ
الْغَالِبِينَ نَحْنُ كُنَّا إِنَّ لَأَجْرًا لَّنَا إِنَّ قَالُوا فِرْعَوْنَ السَّحَرَةَ وَجَاءَ (112) عَلِيمٌ سَاحِرٍ
أَنْ وَإِمَّا تُلْقِي أَنْ إِمَّا مُوسَى يَا قَالُوا (114) الْمُقَرَّبِينَ لِمَنْ وَإِنَّكُمْ نَعَمْ قَالَ (113)

وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ النَّاسِ أَعْيُنَ سَحَرُوا أَلْفُوا فَلَمَّا أَلْفُوا قَالَ (115) الْمَلْئِيقَ نَحْنُ نَكُونُ
مَا تَلَقَّفُ هِيَ فَإِذَا عَصَاكَ أَلْقَى أَنْ مُوسَى إِلَى وَأَوْحَيْنَا (116) عَظِيمٍ بِسِحْرِ وَجَاءُوا
وَأَنْقَلَبُوا هُنَالِكَ فَعُلبُوا (118) يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا وَبَطَلَ الْحَقُّ فَوَقَعَ (117) يَأْفِكُونَ
(121) الْعَالَمِينَ بِرَبِّ آمَنَّا قَالُوا (120) سَاجِدِينَ السَّحَرَةَ وَالْقِيَّ (119) صَاغِرِينَ
(122) وَهَارُونَ مُوسَى رَبِّ

(অর্থ- সে বলল, তুমি যদি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা পেশ কর যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক। তখন তিনি নিজের লাঠিখানা নিক্ষেপ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ তা জলজ্যাস্ত এক অজগরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আর বের করলেন নিজের হাত এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বল দেখাতে লাগল। ফেরাউনের সাজ-পাঙ্গরা বলতে লাগল, নিশ্চয় লোকটি বিজ্ঞ-যাদুকর। সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এ ব্যাপারে তোমাদের মতামত কি? তারা বলল, আপনি তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দান করুন এবং শহরে বন্দরে সংগ্রাহক পাঠিয়ে দিন। যাতে তারা পরাকাষ্ঠাসম্পন্ন বিজ্ঞ যাদুকরদের এনে সমবেত করে।

বস্তুতঃ যাদুকররা এসে ফেরাউনের কাছে উপস্থিত হল। তারা বলল, আমাদের জন্যে কি কোন পারিশ্রমিক নির্ধারিত আছে, যদি আমরা জয়লাভ করি? সে বলল, হ্যাঁ এবং অবশ্যই তোমরা আমার নিকটবর্তী লোক হয়ে যাবো। তারা বলল, হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা আমরা নিক্ষেপ করছি। তিনি বললেন, তোমরাই নিক্ষেপ কর। যখন তারা বান নিক্ষেপ করল তখন লোকদের চোখগুলো যাদুগ্রস্ত হয়ে গেল, মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল এবং মহাযাদু প্রদর্শন করল। তারপর আমি ওহীযোগে মূসাকে বললাম, এবার নিক্ষেপ কর তোমার লাঠিখানা। অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা সে সমুদয়কে গিলতে লাগল, যা তারা যাদুর বলে বানিয়েছিল। এভাবে সত্য

প্রকাশ হয়ে গেল এবং ভুল প্রতিপন্ন হয়ে গেল যা কিছু তারা করেছিল। সুতরাং তারা সেখানেই পরাজিত হয়ে গেল এবং অতীব লাঞ্ছিত হল। এবং যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল। বলল, আমরা ঈমান আনছি মহা বিশ্বের প্রতিপালকের প্রতি যিনি মূসা ও হারুনের প্রতিপালক।)[সূরা আরাফ, আয়াত: ১০৬-১২২]

৪- সূরা ইউনুসের যাদুবিষয়ক আয়াতগুলো পড়া। সেগুলো হচ্ছে-

أَلْقُوا مُوسَى لَهُمْ قَالَ السَّحَرَةُ جَاءَ فَلَمَّا (79) عَلِيمٍ سَاحِرٍ بِكُلِّ ائْتُونِي فِرْعَوْنُ وَقَالَ إِنَّ سَيَبْطُلُهُ اللَّهُ إِنَّ السَّحَرُ بِهِ جِئْتُمْ مَا مُوسَى قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا (80) مُلْقُونَ أَنْتُمْ مَا الْمُجْرِمُونَ كَرِهَ وَلَوْ بِكَلِمَاتِهِ الْحَقُّ اللَّهُ وَيُحَقُّ (81) الْمُفْسِدِينَ عَمَلٍ يُصْلِحُ لَا اللَّهُ

(অর্থ- আর ফেরাউন বলল, আমার কাছে নিয়ে এস সুদক্ষ যাদুকরদিগকে। তারপর যখন যাদুকররা এল, মূসা তাদেরকে বললেন: নিষ্ক্ষেপ কর, তোমরা যা কিছু নিষ্ক্ষেপ করে থাক। অতঃপর যখন তারা নিষ্ক্ষেপ করল, মূসা বললেন, যা কিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু-এবার আল্লাহ এসব ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দুষ্কর্মীদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না। আল্লাহ সত্যকে সত্যে পরিণত করেন স্বীয় নির্দেশে যদিও পাপীদের তা মনঃপুত নয়।)[সূরা ইউনুস, আয়াত: ৭৯-৮২]

৫- সূরা ত্বহা এর আয়াতগুলো পড়া। সেগুলো হচ্ছে-

فَإِذَا أَلْقُوا بَلَّ قَالَ (65) أَلْقَى مَنْ أَوَّلَ نَكُونِ أَنْ وَإِمَّا تُلْقِي أَنْ إِمَّا مُوسَى يَا قَالُوا خِيفَةَ نَفْسِهِ فِي فَأَوْجَسَ (66) تَسْعَى أَنَّهَا سِحْرِهِمْ مِنْ إِلَيْهِ يُخَيَّلُ وَعَصِيَّتُهُمْ حِبَالُهُمْ مَا تَلَقَّفَ يَمِينِكَ فِي مَا وَأَلْقَى (68) الْأَعْلَى أَنْتَ إِنَّكَ تَخَفُ لَا قُلْنَا (67) مُوسَى (69) أَتَى حَيْثُ السَّاحِرُ يُفْلِحُ وَلَا سَاحِرٍ كَيْدُ صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا

(অর্থ-তারা বললঃ হে মূসা, হয় তুমি নিষ্ক্ষেপ কর, নাহয় আমরা প্রথমে নিষ্ক্ষেপ করি। মূসা বললেনঃ বরংতোমরাই নিষ্ক্ষেপ কর। তাদের যাদুর প্রভাবে হঠাৎ তাঁর মনে

হল, যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে। অতঃপর মূসা মনেমনে কিছুটা ভীতি অনুভব করলেন। আমি বললামঃ ভয় করোনা, তুমি বিজয়ী হবো। তোমার ডান হাতে যা আছে তুমি তা নিক্ষেপ কর। এটা তারা করেছে যা কিছু সেগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তাতো কেবল যাদুকরের কলাকৌশল। যাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবেনা।)[সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৬৫-৬৯]

৬- সূরা কাফিরুন পড়া।

৭- সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস ৩ বার করে পড়া।

৮- কিছু দোয়া দরুদ পড়া। যেমন-

“আল্লাহুম্মা, রাব্বান নাস! আযহিবিল বা’সা ওয়াশফি, আনতাশ শাফি। লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআন লা যুগাদিরু সাকামা” [৩ বার]

এর সাথে যদি এ দোয়াটিও পড়াও ভাল “বিসমিল্লাহি আরফিক মিন কুল্লি শাইয়িন যুযিকা ওয়া মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও আইনিন হাসিদিন; আল্লাহ ইয়াশফিকা বিসমিল্লাহি আরফিকা”[৩ বার] পূর্বোক্ত আয়াত ও দোয়াগুলো যদি সরাসরি যাদুতে আক্রান্ত ব্যক্তির উপরে পড়ে তার মাথা ও বুকে ঝুঁক দেয় তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাময় হবো।

বদনজর — যা মানুষকে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে দেয়

হাদিস থেকে প্রমান

১.সাহল ইবনু হুнайফ (রা:) আনহু কোথাও গোসলের জন্য জামা খুলেছিলেন।তিনি অত্যন্ত সুশ্রী এবং ফর্সার অধিকারি ছিলেন।বদরি সাহাবী আমির ইবনু রাবীয়া (রা:)

তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, এতো সুন্দর কাউকে আমি জীবনে কখনো দেখিনি ; এমনকি সুন্দরী যুবতিও এত সুন্দর দেহবিশিষ্ট দেখিনি। আমার এই কথা বলার সাথে সাথে সাহল ইবনু হুнайফ সেখানে বেহুশ হয়ে পরল। তার গায়ে জ্বর চলে আসলো এবং তিনি জ্বরের প্রচণ্ডভাবে ছটফট করতে লাগলেন। অন্য সাহাবিরা রাসূল (সাঃ) — কে অবস্থা জানালেন। সংবাদ পেয়ে নবিজী (সাঃ) দেখতে আসলেন। সাহল রা. কে হঠাত করে এমনটা হবার কারন জিজ্ঞেস করলে তিনি পুরো ঘটনা খুলে বললেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন বললেন, তোমরা কেন তোমাদের ভাইকে নজর দিয়ে হত্যা করছ? তুমি যখন তাকে দেখলে, তখন বরকতের দোয়া কেন করলেনা? নিশ্চয়ই বদ নজর সত্য। (অর্থাৎ দোয়া করলে আর নজর লাগতেনা) এরপর নবিজী (সাঃ) আমার ইবনু রাবিয়া (রাঃ) আনহা কে বললেন, তার জন্য অজু করা তখন তিনি অজু করলেন। তারপর নবিজী সাঃ এর নির্দেশে অজুর পানি সাহল ইবনু হুнайফ (রাঃ) এর গায়ে ঢেলে দিলেন। তখন আল্লাহর রহমতে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। (মুয়াত্তা মালিক: ১৬৮১)

২. রাসূল (সাঃ) বারবার বদ নজরের সাথে ভাগ্যের তুলনা করেছেন। যেমন ঃ-
আল্লাহর ফায়সালা এবং ভাগ্যের পরে আমার উম্মত সবচেয়ে বেশি মৃত্যু বরন করবে বদ নজরের কারনো (মুসনাদে আবু দাউদ তয়ালিসি: ১৮৫৮)

৩. যদি কোনকিছু ভাগ্যেকে অতিক্রম করতে পারতো, তবে তা হত বদনজর। (সুনানে আত তিরমিজি : ২০৫৯)

3. الْعَيْنُ: قَالَ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ عَنهُ، اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي حَدِيثِ حَقِّ

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বদ নজর লাগা সত্য। (বুখারী পর্ব ৭৬ অধ্যায় ৩৬ হাদীস নং ৫৭৪০; মুসলিম ৩৯/২১, হাঃ ২১৯৩)

4. “আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বদ নযর এর জন্য রুকইয়াহ (ঝাড়-ফুক) করার হুকুম করতেনা” (সহীহ মুসলিম, ৫৫৩২, ৫৫৩৩, ৫৫৩৪)



অভিজ্ঞতা থেকে

ছেলেটির বয়স ৯-১০ বছর। বাড়ী তার চট্টগ্রামে ছেলেটি খুবই হাসিখুশি প্রকৃতির ছিলো। কথাবার্তা এমন ভাবে বলতো মানুষ অবাক হয়ে যেত! একেবারেই জ্ঞানী মানুষের মতো কথা বলতো। হঠাৎ করে একেবারে নির্জিত হয়ে গেলো। কারো সাথে কোন কথাবার্তা বলেনা।

এমনকি মা বাবার সাথেও না। খাওয়া দাওয়া ঠিকমতো করেনা। সারাক্ষণ মন খারাপ করে বসে থাকে। বিষন্ন মনে কথাগুলি বললেন চট্টগ্রাম থেকে ট্রিটমেন্ট নিতে আসা

ছেলেটির বাবা।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম প্রলম্ব শুরু কখন থেকে?

তিনি জানান: আমাদের সাথে একদিন বেড়াতে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফেরার পথে গাড়ীতে বসে কথাবার্তা বলছিল, হটাৎ করে দেখি সে নিশ্চুপ, তখন আমরা বিষয়টি লক্ষ্য করিনি ; কিন্তু তখন থেকেই প্রলম্ব শুরু এরপর ডাক্তার দেখিয়েছি, ওজা — ফকির, কাউকে বাদ রাখেনি কিন্তু কোন কাজ হয়নি।

আমি ছেলেটির অভিভাবকদের বললাম, আপনাদের ছেলের মারাত্মক বদ নজর লেগেছে এবং এর ইফেক্ট এতই সিরিয়াস যে, আপনারা নিজেই তার প্রমান পাচ্ছেন। যাইহোক, আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। ঘাবড়ানোর কিছুই নেই। এরপর তার উপর রুকইয়াহ শুরু করা হলো। প্রথম যখন তার উপর রুকইয়াহ করলাম, তখন কোন প্রতিক্রিয়া হলোনা।

পরে যখন আবার একটানা রুকইয়াহ করলাম। তখন কিছুক্ষণ পর তার প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো। সাথে সাথেই সে কিছুটা সাভাবিক হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ। সাথে দুই সপ্তাহের আমল বলে দিলাম এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বলে দিলাম। তাদেরকে ধৈর্যের সাথে আমল করতে বললাম। দুই সপ্তাহের মধ্যেই সে সুস্থ হয়ে ওঠে।

বদনজরের লক্ষন

মুন্সাইয়ের একজন অভিজ্ঞ আলেম মুফতি জুনাইদ সাহেব নজর লাগার অনেকগুলো আলামত বর্ণনা করেছিলেন। যেমনঃ

১। শরীরে জ্বর থাকা, কিন্তু থার্মোমিটারে না উঠা।

২। কোনো কারণ ছাড়াই কান্না আসা

- ৩। প্রায়সময় কাজে মন না বসা, নামায যিকর ক্লাসে মন না বসা।
- ৪। প্রায়শই শরীর দুর্বল থাকা, ক্ষুধামন্দা, বমি বমি ভাব লাগা।
- ৫। চেহারা ধুসর/হলুদ হয়ে যাওয়া।
- ৬। বুক ধড়পড় করা, দমবন্ধ অস্বস্তি লাগা।
- ৭। অহেতুক মেজাজ বিগড়ে থাকা।
- ৮। আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুদের সাথে দেখা হলেই ভালো না লাগা।
- ৯। অতিরিক্ত চুল পড়া। শ্যাম্পুতে কাজ না করা।
- ১০। পেটে প্রচুর গ্যাস হওয়া।
- ১১। বিভিন্ন সব অসুখ লেগে থাকা, দীর্ঘদিন চিকিৎসাতেও ভালো হয় না। (সর্দিকাশি, মাথাব্যথা ইত্যাদি)
- ১২। হাত-পায়ে মাঝেমধ্যেই ব্যাথা করা, পুরো শরীরে ব্যাথা দৌড়ে বেড়ানো।
- ১৩। ব্যবসায় ঝামেলা লেগে থাকা।
- ১৪। যে কাজে অভিজ্ঞ সেটা করতে গেলেই অসুস্থ হয়ে যাওয়া।
- ১৫। স্বপ্নে উঁচু থেকে পড়ে যেতে দেখা, মৃত মানুষ দেখা। অথবা স্বপ্নে কাউকে মরে যেতে দেখা।

বদনজরে চিকিৎসা

لَا مَـمَّةَ عَيْنٍ كُلِّ وَمِنْ ، وَهَامَّةٍ شَيْطَانٍ كُلِّ مِنْ ، التَّامَّةِ اللّهِ بِكَلِمَاتٍ أُعِيذُكُمْ
 اللّهُ حَاسِدٍ، عَيْنٍ أَوْ نَفْسٍ كُلِّ شَرٍّ مِنْ يُؤْذِيكَ، شَيْءٍ كُلِّ مِنْ أَرْقِيكَ، اللّهُ بِسْمِ
 أَرْقِيكَ اللّهُ بِسْمِ يَشْفِيكَ،
 ذِي كُلِّ وَشَرٍّ حَسَدٍ، إِذَا حَاسِدٍ شَرٍّ وَمِنْ يَشْفِيكَ، دَاءٍ كُلِّ وَمِنْ يُبْرِيكَ، اللّهُ بِاسْمِ
 عَيْنٍ

لَا شِفَاءَ شِفَاؤُكَ إِلَّا شِفَاءٌ لَا الشَّافِيَ وَأَنْتَ أَشْفَى الْبَاسِ، أَذْهَبَ النَّاسِ رَبَّ اللَّهُمَّ
سَقَمًا يُغَادِرُ

এরপর চাইলে সাথে ৩ বার অথবা ৭ বার করে করে সুরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি,
ইখলাস, ফালাক, নাস পড়বেন এরপর পানি/রুগীকে ফুঁ দিবেন। শেষে দুর্জাদ শরীফ
পড়ে রুক্যাহ শেখ করতে হবে।

এরপর আরও পড়ুন

সূরা বাকারাহ, ২০, ৬০, ৬৯, ১০৯, ১১০, ২৪৬, ২৬৯, ২৮৬

قَامُوا عَلَيْهِمْ أَظْلَمَ وَإِذَا فِيهِ مَشَوْا لَهُمْ أَضَاءَ كُلَّمَا ۖ أَبْصَرَهُمْ يَخْطَفُ الْبَرْقُ يَكَادُ
﴿٢٠﴾ قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللَّهِ إِنَّ ۖ وَأَبْصَرَهُمْ بِسَمْعِهِمْ لَذَهَبَ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ

اِثْنَا مِنْهُ فَانْفَجَرَتْ ۖ الْحَجَرَ بَعْصَاكَ اضْرِبْ فَقُلْنَا لِقَوْمِهِ مُوسَى اسْتَسْقَى وَإِذَا
فِي تَعْنُوا وَلَا إِلَهَ إِلَّا رَزَقِ مِنْ وَاشْرَبُوا كُلُّوا ۖ مَشَرَهُمْ أَنْاسٍ كُلُّ عِلْمٍ قَدْ ۖ عَيْنًا عَشْرَةَ
﴿٦٠﴾ مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ

لَوْهَا فَاقْعَ صَفَرَاءَ بَقْرَةَ إِنَّهَا يَقُولُ إِنَّهُ قَالَ ۖ لَوْهَا مَا لَنَا يُبَيِّنُ رَبَّكَ لَنَا ادْعُ قَالُوا
﴿٦٩﴾ النََّاظِرِينَ تَسْرُ

أَنْفُسِهِمْ عِنْدَ مَنْ حَسَدًا كُفَّارًا إِيْمَانِكُمْ بَعْدَ مَنْ يَرُدُّونَكُمْ لَوْ الْكِتَابِ أَهْلٍ مِنْ كَثِيرٍ وَدَّ
عَلَى اللَّهِ إِنَّ ۖ بِأَمْرِ اللَّهِ يَأْتِي حَتَّى وَاصْفَحُوا فَاعْفُوا ۖ الْحَقُّ لَهُمْ تَبَيَّنَ مَا بَعْدَ مَنْ
خَيْرٍ مَنْ لَأَنْفُسِكُمْ تُقَدِّمُوا وَمَا ۖ الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا ﴿١٠٩﴾ قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ
﴿١١٠﴾ بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ إِنَّ ۖ اللَّهُ عِنْدَ تَجِدُوهُ

عَلَيْنَا الْمُلْكُ لَهُ يَكُونُ أَنِّي قَالُوا ۖ مَلِكًا طَالُوتَ لَكُمْ بَعَثَ قَدْ اللَّهُ إِنَّ نَبِيَّهُمْ لَهُمْ وَقَالَ
عَلَيْكُمْ اصْطَفَاهُ اللَّهُ إِنَّ قَالَ ۖ الْمَالِ مِنْ سَعَةٍ يُؤْتِ وَلَمْ مِنْهُ بِالْمُلْكِ أَحَقُّ وَنَحْنُ

عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ َ يَشَاءُ مَنْ مُلْكُهُ يُؤْتِي وَاللَّهُ ُ وَالْجِسْمِ الْعِلْمِ فِي بَسْطَةٍ وَزَادَهُ
﴿٢٤٧﴾

إِلَّا يَذَّكَّرُ وَمَا ُ كَثِيرًا خَيْرًا أُوتِيَ فَقَدْ الْحِكْمَةَ يُؤْتِ وَمَنْ َ يَشَاءُ مَنْ الْحِكْمَةَ يُؤْتِي
﴿٢٦٩﴾ الْأَلْبَابِ أُولُو

تُؤَاخِذُنَا لَا رَبَّنَا ُ اكْتَسَبْتُ مَا وَعَلَيْهَا كَسَبْتُ مَا لَهَا َ وَسُعِيَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا
َ قَبْلُنَا مِنَ الَّذِينَ عَلَى حَمَلْتُهُ كَمَا إِصْرًا عَلَيْنَا تَحْمِلُ وَلَا رَبَّنَا َ أَخْطَأْنَا أَوْ نَسِينَا إِنْ
مَوْلَانَا أَنْتَ َ وَارْحَمْنَا لَنَا وَاعْفِرْ عَنَّا وَاعْفُ ُ بِهِ لَنَا طَاقَةَ لَا مَا تُحْمِلُنَا وَلَا رَبَّنَا
﴿٢٨٦﴾ الْكَافِرِينَ الْقَوْمِ عَلَى فَانصُرْنَا

সূরা আল-ইমরান-১৪৩

﴿١٤٣﴾ تَنْظُرُونَ وَأَنْتُمْ رَأَيْتُمُوهُ فَقَدْ تَلَقَّوهُ أَنْ قَبْلِ مِنَ الْمَوْتِ تَمْنُونَ كُنْتُمْ وَلَقَدْ

সূরা নিসা-৫৩

الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ آلَ آتَيْنَا فَقَدْ ُ فَضْلِهِ مِنَ اللَّهِ آتَاهُمْ مَا عَلَى النَّاسِ يَحْسُدُونَ أَمْ
﴿٥٤﴾ عَظِيمًا مُلْكًا وَآتَيْنَاهُمْ وَالْحِكْمَةَ

সূরা মায়েদাহ-৪৫

بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا
يَحْكُمُ لَمْ وَمَنْ َ لَهُ كَفَّارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ َ قِصَاصٌ وَالْجُرُوحَ بِالسِّنِّ وَالسِّنَّ
﴿٤٥﴾ الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا

সূরা আন'আম-১০৩

﴿١٠٣﴾ الْخَبِيرُ اللَّطِيفُ وَهُوَ ُ الْأَبْصَارَ يُدْرِكُ وَهُوَ الْأَبْصَارُ تُدْرِكُهُ لَا

সূরা আ'রাফ-১০৮

﴿١٠٨﴾ لِلنَّازِظِينَ بَيْضَاءُ هِيَ فَإِذَا يَدُهُ وَنَزَعَ

সূরা আনফাল-৬

﴿٦﴾ يَنْظُرُونَ وَهُمْ الْمَوْتِ إِلَى يُسَاقُونَ كَأَنَّمَا تَبَيَّنَ مَا بَعْدَ الْحَقِّ فِي يُجَادِلُونَكَ

সূরা তওবাহ-১২৭

انصَرَفُوا ثُمَّ أَحَدٍ مِّنْ يَّرَاكُمْ هَلْ بَعْضٍ إِلَىٰ بَعْضِهِمْ نَظَرَ سُورَةٌ أُنزِلَتْ مَا وَإِذَا
﴿١٢٧﴾ يَفْقَهُونَ لَا قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ قُلُوبُهُمُ اللَّهُ صَرَفَ

সূরা ইউসুফ-৬৭

عَنكُمْ أَغْنِي وَمَا ۖ مُتَفَرِّقَةً أَبْوَابٍ مِّنْ وَّادْخُلُوا وَاحِدٍ بَابٍ مِّنْ تَدْخُلُوا لَا بَنِيَّ يَا وَقَالَ
الْمُتَوَكِّلُونَ فَلْيَتَوَكَّلْ وَعَلَيْهِ ۖ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ ۖ لِلَّهِ إِلَّا الْحُكْمُ إِنَّ ۖ شَيْءٍ مِّنَ اللَّهِ مِّن
﴿٦﴾

সূরা হিজর -৮৮

جَنَاحَكَ وَاخْفِضْ عَلَيْهِمْ تَحْزَنُ وَلَا مِّنْهُمْ أَزْوَاجًا بِهِ مَتَّعْنَا مَا إِلَىٰ عَيْنَيْكَ تَمُدَّنَّ لَا
﴿٨٨﴾ لِلْمُؤْمِنِينَ

সূরা কাহাফ, ৩৯-৪০

مَا لَا مِنْكَ أَقَلَّ أَنَا تَرَنَ إِن ۖ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ لَا اللَّهُ شَاءَ مَا قُلْتَ جَنَّتَكَ دَخَلْتَ إِذْ وَلَوْلَا
السَّمَاءِ مِّنْ حُسْبَانًا عَلِمَهَا وَيُرْسِلَ جَنَّتَكَ مِّنْ خَيْرًا يُؤْتِينَ أَنْ رَبِّي فَعَسَىٰ ﴿٣٩﴾ وَوَلَدًا
﴿٤٠﴾ زَلَقًا صَعِيدًا فَتُصْبِحُ

সূরা আশ্বিয়া -৬১

(٦١) يَشْهَدُونَ لَعَلَّهُمُ النَّاسَ أَعْيُنَ عَلَىٰ بِهِ فَأَتُوا قَالُوا

সূরা নামল, ১৫-১৬

مَنْ كَثِيرٍ عَلَىٰ فَضْلِنَا الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ وَقَالَا ۖ عَلِمَا وَسُلَيْمَانَ دَاوُودَ آتَيْنَا وَلَقَدْ
مَنْطِقَ عَلِمْنَا النَّاسُ أَهْيَا يَا وَقَالَ ۖ دَاوُودَ سُلَيْمَانُ وَوَرِثَ ﴿١٥﴾ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادِهِ
﴿١٦﴾ الْمُبِينُ الْفَضْلُ لَهُوَ هَذَا إِنَّ ۖ شَيْءٍ كُلِّ مِنْ وَأُوتَيْنَا الطَّيْرَ

সূরা ইয়াসিন-৯

﴿٩﴾ يُبْصِرُونَ لَا فَهُمْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ سَدًّا خَلْفَهُمْ وَمِنْ سَدًّا أَيْدِيهِمْ بَيْنَ مِنْ وَجَعَلْنَا

সূরা সাফফাত, ৮৮-৮৯, ৯৮

﴿٩٠﴾ مُدْبِرِينَ عَنْهُ فَتَوَلَّوْا ﴿٨٩﴾ سَقِيمٌ إِنِّي فَقَالَ ﴿٨٨﴾ النَّجُومُ فِي نَظْرَةٍ فَنَظَرَ
﴿٩٨﴾ الْأَسْفَلِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ كَيْدًا بِهِ فَأَرَادُوا

সূরা গাফির-১৯

﴿١٩﴾ الصُّدُورُ تُخْفِي وَمَا الْأَعْيُنُ خَائِنَةٌ يَعْلَمُ

সূরা কফ-৬

﴿٦﴾ فُرُوجٍ مِنْ لَهَا وَمَا وَرَيْتَاهَا بَنَيْنَاهَا كَيْفَ فَوْقَهُمُ السَّمَاءُ إِلَى يَنْظُرُوا أَفَلَمْ

সূরা যারিয়াত-৪৪

﴿٤٤﴾ يَنْظُرُونَ وَهُمْ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْهُمْ رَبَّهُمْ أَمْرٍ عَنْ فَعَتُوا

সূরা কুমার-১২

﴿١٢﴾ قُدِرَ قَدْ أَمْرٍ عَلَى الْمَاءِ فَالْتَقَى عُيُونًا الْأَرْضَ وَفَجَّرْنَا

সূরা রহমান, ৬৬-৬৭

﴿٦٧﴾ تُكَذِّبَانِ رَبِّكُمَا آلَاءٍ فَبِأَيِّ ﴿٦٦﴾ نَضَاحَتَانِ عَيْنَانِ فِيمَا

সূরা ওয়াকিয়া, ৮৩-৮৪

﴿٨٤﴾ تَنْظُرُونَ حِينِيذٍ وَأَنْتُمْ ﴿٨٣﴾ الْحُلُقُومَ بَلَّغَتْ إِذَا فَلَوْلَا

সূরা মূলক, ৩-৪

فَارْجِعِ ۖ تَفَافُتٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ خَلْقٍ فِي تَرَىٰ مَا ۖ طِبَاقًا سَمَاوَاتٍ سَبْعَ خَلْقَ الَّذِي
خَاسِنًا الْبَصَرَ إِلَيْكَ يَنْقَلِبُ كَرَّتَيْنِ الْبَصَرَ ارْجِعِ ثُمَّ ﴿٣﴾ فُطُورٍ مِّن تَرَىٰ هَلْ الْبَصَرَ
﴿٤﴾ حَسِيرٌ وَهُوَ

সূরা কলম, ৫১-৫২

لَمْ جُنُونَ إِنَّهُ وَيَقُولُونَ الذِّكْرَ سَمِعُوا لَمَّا بِأَبْصَارِهِمْ لِيُزْلِقُونَكَ كَفَرُوا الَّذِينَ يَكَاذُ وَإِنْ
﴿٥٢﴾ لِلْعَالَمِينَ ذِكْرٌ إِلَّا هُوَ وَمَا ﴿٥١﴾

সূরা কিয়ামাহ, ২২-২৩

﴿٢٣﴾ نَاطِرَةٌ رَبِّهَا إِلَى ﴿٢٢﴾ نَاضِرَةٌ يَوْمَئِذٍ وَجُوهُ

সূরা ইনসান- ৬, ১৮

﴿٦﴾ تَفْجِيرًا يُفْجِرُونَهَا اللَّهُ عِبَادُ بِهَا يَشْرَبُ عَيْنًا

﴿١٨﴾ سَلَسِيلًا تُسَعَّى فِيهَا عَيْنًا

সূরা নাযিয়াত, ৬-৯

أَبْصَارُهَا ﴿٨﴾ وَاجِفَةٌ يَوْمَئِذٍ قُلُوبٌ ﴿٧﴾ الرَّادِفَةُ تَتَّبِعُهَا ﴿٦﴾ الرَّاجِفَةُ تَرْجُفُ يَوْمَ
﴿٩﴾ خَاشِعَةٌ

সূরা গাশিয়াহ- ১২

﴿١٢﴾ جَارِيَةٌ عَيْنٌ فِيهَا

সূরা বালাদ, ৮-১০

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (٨) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (٩) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (١٠)

হাদিসে বর্ণিত কিছু ঔষধি খাবার

মহান আল্লাহ তাঁর বহু সৃষ্টির মধ্যে বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক রেখে দিয়েছেন। তিনি যেমন রোগ সৃষ্টি করেছেন, রোগের প্রতিষেধকও সৃষ্টি করেছেন। এমন অনেক খাবার রয়েছে, যেগুলোর ঔষধি গুণ নিয়ে প্রিয় নবী (সা.) থেকে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এর কয়েকটি তুলে ধরেছেন মুফতি মুহাম্মদ মর্তুজা

আজওয়া খেজুর

মদিনার উত্কৃষ্টতম খেজুর আজওয়া। পবিত্র হাদিস শরিফে এই ফলটিকে জান্নাতের ফল আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসুল (সা.)-এর প্রিয় ফল ছিল খেজুর। এর উপকারিতা অপরিসীমা। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালবেলা সাতটি আজওয়া (উত্কৃষ্ট) খেজুর খাবে, সেদিন কোনো বিষ ও জাদু তার ক্ষতি করবে না’ (বুখারি, হাদিস : ৫৪৪৫)। হৃদে রাগে আক্রান্তদের জন্যও এটি মহা উপকারী ওষুধ। রাসুল (সা.) তাঁর এক সাহাবিকে হৃদে রাগের জন্য আজওয়া খেজুরের তৈরি ওষুধ খেতে পরামর্শ দিয়েছেন।



সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি অসুস্থ হলে রাসুল (সা.) আমাকে দেখতে আসেন। এ সময় তিনি তাঁর হাত আমার বুকের ওপর রাখলে আমি তার শৈত্য আমার হৃদয়ে অনুভব করি। এরপর তিনি বলেন, তুমি হৃদরোগে আক্রান্ত। কাজেই তুমি সাকিফ গোত্রের অধিবাসী হারিসা ইবনে কালদার কাছে যাও। কেননা সে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। আর সে যেন মদিনার আজওয়া খেজুরের সাতটা খেজুর নিয়ে বিচিসহ চূর্ণ করে তোমার জন্য তা দিয়ে সাতটি বড়ি তৈরি করে দেয়। (আবু দাউদ, হাদিস : ৩৮৩৫)

এই হাদিস থেকে আরেকটি জিনিস বোঝা যায়, তা হলো—কোনো ওষুধ গ্রহণ করার আগে অবশ্যই অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কারণ মহান আল্লাহ তাঁর বহু সৃষ্টিতে ঔষধি গুণ রেখেছেন, তবে রোগভেদে তার প্রয়োগেরও ভিন্ন ভিন্ন পন্থা রেখেছেন, যাঁরা তা নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁরাই তা জানতে পারেন।

কালিজিরা

বিস্ময়কর এই জিনিসটির প্রশংসা করেছেন খোদ রাসুল (সা.)। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, কালিজিরায় সব ধরনের রোগের উপশম আছে, তবে ‘আস্সাম’ ব্যতীত। আর ‘আস্সাম’ হলো মৃত্যু। এর ‘আল হাব্বাতুস্ সাওদা’ হলো (স্থানীয় ভাষায়) ‘শূন্য’ (অর্থাৎ কালিজিরা)। (মুসলিম, হাদিস : ৫৬৫৯)



তাই যেকোনো রোগ নিরাময়ে, রোগ থেকে নিরাপদ থেকে অন্যান্য সতর্কতার পাশাপাশি অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে কালিজিরা সেবন করা যেতে পারে। আয়ুর্বেদিক, ইউনানি ও কবিরাজি চিকিৎসায় এর ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে। তাই যারা এসব চিকিৎসা নিয়ে গবেষণা করে, তাদের কাছে রোগ অনুযায়ী সঠিক ব্যবহারবিধি পাওয়া যাবে। কারণ একেক ধরনের রোগের জন্য কালিজিরা ব্যবহারবিধিও একেক রকম।

জয়তুন

প্রিয় নবী (সা.)-এর পছন্দের ফলগুলোর একটি ছিল জয়তুন। এর তেলও শরীরের জন্য বেশ উপকারী। রাসুল (সা.) তা নিজে ব্যবহার করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও ব্যবহার করার তাগিদ দিতেন। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘তোমরা (জয়তুনের) তেল খাও এবং তা শরীরে মালিশ করো। কেননা এটি বরকত ও প্রাচুর্যময় গাছের তেলা’ (তিরমিজি, হাদিস : ১৮৫১)



আরবীয় জলপাই বা জয়তুন



ভারতীয় জলপাই বা অলিভ



তোমরা যাহিহূনের তেল খাও এবং মাথো, কেননা নিশ্চয় এটা কল্যাণময় গাছ থেকে প্রাপ্ত। (তিরমিজী -১৭৭)

কোরআনে বর্ণিত ফলগুলোর অন্যতম একটি ফল জলপাই বা জয়তুন। সুরা ত্বিনের প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ যে ফলের কসম খেয়েছেন। সুরা নূরের ২৪ নম্বর আয়াতে তিনি এই ফলের গাছকে আখ্যা দিয়েছেন মুবারক গাছ হিসেবে। রাসুল (সা.)-এর একটি হাদিস থেকেও জানা যায় যে আগের নবীরাও এই বরকতময় গাছের ফল ও তেল ব্যবহার করতেন। মিসওয়াক হিসেবে ব্যবহার করতেন এই গাছের ডালকো (আল মুজামুল আওসাত)

জমজমের পানি

জমজমের পানি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পানি। পবিত্র জমজম নিয়ে রাসুল (সা.)-এর বহু হাদিস রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পানি হলো জমজমের পানি। তাতে রয়েছে তৃপ্তির খাদ্য ও ব্যাধির আরোগ্য’ (আল-মুজামুল আওসাত, হাদিস : ৩৯১২)। রাসুল (সা.) জমজমের পানি ভীষণ পছন্দ করতেন। বেশির ভাগ সময় তিনি জমজমের পানি পান করার চেষ্টা করতেন। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি জমজমের পানি সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন, আর বলতেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) তা বহন করে আনতেন। (তিরমিজি, হাদিস : ৯৬৩)

মহান আল্লাহ এই পানিতে এতটাই বরকত রেখেছেন, যে কেউ (আল্লাহর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে) কোনো উপকার লাভের আশায় এই পানি পান করলে মহান আল্লাহ

তাঁর আশা পূরণ করেন। জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, জমজমের পানি যে উপকার লাভের আশায় পান করা হবে, তা অর্জিত হবে। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩০৬২)



মধু

মধুর ঔষধি গুণ সবারই কমবেশি জানা। মহান আল্লাহ মধুর মধ্যে বহু রোগের আরোগ্য রেখেছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘তার (মৌমাছির) পেট থেকে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য। অবশ্যই তাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে’ (সূরা : নাহল, আয়াত : ৬৮-৬৯)।

রাসুল (সা.) মধু বেশ পছন্দ করতেন। আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) মিষ্টি ও মধু খুব ভালোবাসতেন। (বুখারি, হাদিস : ৫২৭০)। এ ছাড়া তিনি অন্যদের বিভিন্ন রোগের জন্য মধু পান করার পরামর্শ দিতেন। মহানবী (সা.)-এর কাছে এক সাহাবি এসে তাঁর ভাইয়ের পেটের অসুখের কথা বললে রাসুল (সা.) তাঁকে মধু পান করানোর পরামর্শ দেন এবং এতে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। (বুখারি, হাদিস : ৫৩৬০)

ত্বীন ফল

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ রাসূল (সঃ) এর প্রিয় খাবারগুলোর অন্যতম ত্বীন ফল। >> ত্বীন ফলের আরেক নাম ডুমুর ফল ইংরেজিতে ফিগ (Fig) বলে থাকে।

ত্বীন ফলের উল্লেখ আছে পবিত্র কুরআনের সূরা ত্বীনো। এই বরকতময় ফলের নামেই নামকরণ করা হয়েছে এই সূরার। সূরা নাম্বার ৯৫। সূরা ত্বীনের ১ – ৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ পাক এই ত্বীন আর জৈতুন নিয়ে শপথ করে বলেন- **وَالزَّيْتُونِ وَالتِّينِ** ওয়া আত-ত্বীনি ওয়া আয-জায়তুনী, **By the Fig and the Olive**, ত্বীন আর জৈতুন এর কসম, সিনাই পর্বতের কসম এই নিরাপদ নগরীর, অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠন ও আকৃতিতে >> কেন খাবেন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ত্বীন বা ডুমুর ফল ? * ডুমুর বা ত্বীন ফল নারী-পুরুষের শক্তি বৃদ্ধি করে।



* ডুমুর বা ত্বীন ফলে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম রয়েছে যা ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রনে রাখে। * ডুমুর বা ত্বীন ফল রক্তে ক্ষতিকর সুগারের পরিবর্তে ন্যাচারাল সুগার তৈরি করে ব্যালাপ্স রক্ষা করে। * ডুমুর বা ত্বীন ফল মারণব্যাদি ক্যান্সার থেকে রক্ষা করে। * সম্প্রতি গবেষণায় জানা গেছে ডুমুর বা ত্বীন ফল ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে। ফাইবার সমৃদ্ধ ত্বীন ফল খাদ্য তালিকায় রাখার ফলে ৩৪% নারীর মধ্যে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কম দেখা গিয়েছে। * ডুমুর বা ত্বীন ফল চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়। শিশুদের দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে ত্বীন ফল একান্ত অপরিহার্য। * ডুমুর বা ত্বীন ফল শরীরের অপ্রয়োজনীয় মেদ বা চর্বি কমায়। * ডুমুর বা ত্বীন ফল হাট এটাকের ঝুঁকি কমায়।

* মারণব্যাদি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রনে রাখে। ইনসুলিনের ওপর নির্ভরশীল ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য ডুমুর বা ত্বীন ফল খুবই উপকারী। * ডুমুর বা ত্বীন ফল শরীরের ক্যালসিয়ামের শূন্যতা পূরণ করে। গর্ভবতী মা ও শিশুর রক্তশূন্যতা রোধ করে। ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়। * দুর্বলতায় ভোগেন এমন ব্যক্তির জন্য ত্বীন ফল খুবই উপকারী। বিশেষ করে মুখ, জিভ বা ঠোঁট ফাটার সমস্যা থাকলে তা নিরাময় করতে ডুমুর সাহায্য করে।

* প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকায় ডুমুর কোষ্ঠকাঠিন্য ও পাইলস প্রতিরোধে সহায়তা করে। * ডুমুর বা ত্বীন ফল শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করে। শ্বাসকষ্ট ও হাঁপানি রোগ নিরাময়েও সহায়তা করে। * যাদের দুধ ও দুধের তৈরি খাবারে অ্যালার্জি আছে তাঁরা ক্যালসিয়ামের ঘাটতির পূরণের জন্য নিয়মিত ত্বীন ফল খান। কারণ এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম। * কাঁচা ডুমুর বা ত্বীন ফল চর্মরোগের ওষুধ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। খেঁতো করে ব্রণ ও মেছতায় নিয়মিত লাগালে তা সেরে যায়।

হাদিস, আজওয়া খেজুর এবং বিজ্ঞান:

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, বর্তমান সময়ের বেশিরভাগ মানুষই মনে করে, হাদিসের কোনো একটা অনুবাদ পড়েই তারা এর সবকিছু বুঝে ফেলেছে আর তখন তার ওপর মন্তব্য করারও তারা যোগ্য হয়ে গেছে। এই অভ্যাসের কিছু সাফাইও গাইতে দেখা যায় যদি হাদিস বা এরকম কোনো ইসলামিক লেখা কোনো মৃত ভাষায় থাকে যা অনুসারীরা অল্পই জানে যেমনটা দেখা যায় ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের বেলায়। কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনার অধ্যয়নে মৌলিক নীতিটি হল এর সাথে সম্পর্কিত অবস্থা ও প্রসঙ্গটি অনুধাবন করা যা থেকে এর উদ্ভব ঘটেছে। যখন এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয় খুঁজে পাওয়া যায় না যে কখন ও কোথায় এসকল কথা বলা হয়েছে, তখন অন্য যুক্তিযুক্ত উপায় হল, কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে পরিপূরক বর্ণনাগুলো দেখা।



"সা'দ (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেকদিন সকালবেলায় সাতটি আজওয়া উৎকৃষ্ট খেজুর খাবে, সেদিন কোন বিষ ও যাদু তার ক্ষতি করবে না।"

[সহীহ বুখারী (তাওহীদ) ৫৪৪৫/হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)]

"ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া, ইবনু আয়্যুব ও ইবনু হুজর (রহঃ) ... আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মদিনার আলিয়া অঞ্চলের (উঁচু ভূমির) আজওয়া খেজুরে শেফা (রোগমুক্তি) রয়েছে। অথবা তিনি বলেছেনঃ প্রতিদিন সকালের এর আহার বিষনাশক (ঔষধের কাজ করে)।"

[সহীহ মুসলিম (ইফাঃ) ৫১৬৮/হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)]

"আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল-'আলিয়ার আজওয়া খেজুর খেয়েই সকালের উপবাস প্রথমে ভাঙলে তা (সর্বপ্রকার) যাদু অথবা বিষক্রিয়ার আরোগ্য হিসেবে কাজ করে।"

[মুসনাদে আহমাদ, হাদিস ২৩৫৯২]

আল-'আলিয়া বলতে বোঝানো হয় মদিনার পূর্বদিকের কয়েক মাইল দূরের কতগুলো গ্রামকো।

"উরওয়া (রহ.) বর্ণনা করেন: আয়েশা (রাঃ) পরপর সাতদিন সাতটি আজওয়া খেজুর খেয়ে সকালের উপবাস ভাঙার অথবা এই অভ্যাস তৈরি করার জন্য নির্দেশ দিতেন।"

[মুহান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, হাদিস ২৩৯৪৫]

এখন এই সকল বর্ণনাগুলিকে বিবেচনা করে এটা পরীক্ষার হয় যে, উপকারিতার যে কথা বলা হয়েছে তা কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত।

১) আজওয়া খেজুরের ব্যাপারটি মদিনার নিকটবর্তী নির্দিষ্ট অঞ্চল আল-আলিয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

২) খুব সকালে এগুলো খেয়ে রাতের উপবাস ভাঙাতেই এর উপকারিতা রয়েছে।

৩) এই উপকারিতা তার বেলায় প্রযোজ্য যে এগুলো নিয়মিত খায় যেভাবে আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) লোকদের নির্দেশ দিতেন। তাঁর নির্দেশের বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু তিনি প্রশ্নের ক্ষেত্রে হাদিসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন। এখন কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যা করা যাক:

"বিষ (The Poison)/উপবিষ (Toxin)": যে শব্দটি আসলে ব্যবহৃত হয়েছে (উচ্চারণে) তা হল "সাম্" (summ) যার অর্থ হল বিষ (poison) অথবা উপবিষ (Toxin)। সমস্যাটা হল কিছু মানুষ মনে করে যে, এর মানে হল তৎক্ষণাৎ মৃত্যু আনয়নকারী কোনো উপাদান। কিন্তু হাদিসের বর্ণনায় এর উপকারিতা রয়েছে খুব সকালে প্রথমে এটি (আজওয়া খেজুর) খাওয়ার মধ্য দিয়ে এবং নিয়মিতভাবে খাওয়ার মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় যে, এই ব্যাপারটি 'উপবিষ' (toxin) সম্পর্কিত যা প্রকৃতিই বিষধর্মী এবং শরীরের জন্য ক্ষতিকারক।

ইবনে কাইয়িম তাঁর Tibb al-Nabawi গ্রন্থে লিখেছেন: "আল-মদিনার মানুষের জন্য শুকনো খেজুর তাদের প্রধানতম খাদ্য যেমনভাবে গম অন্য লোকদের প্রধান খাদ্য। উপরন্তু মদিনার আল-আলিয়া অঞ্চলের শুকনো খেজুর হল অন্যতম সেরা এক ধরনের খেজুর..."

খেজুর এমনই এক ধরনের ফল যেটি পুষ্টিকর এবং ঔষধি গুণসম্পন্ন, যা অধিকাংশেরই শরীরের জন্য অনুকূল এবং প্রাকৃতিক তাপ উৎপাদনে বলকারক ভূমিকাসম্পন্ন। তদুপরি খেজুর, অন্যান্য খাবার আর ফলের মত ক্ষতিকারক বর্জ্য উৎপাদন করে না। বরং খেজুর শরীরের বর্জ্যকে পচন হতে রক্ষা করে বিশেষ করে তাদের জন্য যারা শুকনো খেজুর খেতে অভ্যস্ত।"

"For the people of al-Medina, dried dates are their staple like wheat is to other people. In addition, dried dates from the area of al-Aliyah in al-Medina are one of the best kinds of dates ... Dates are a type of fruit that is also used for its nutritional and medicinal value, being favorable for most bodies and for their role in strengthening the natural heat. Moreover, dates do not produce harmful wastes or excrement like other types of food and fruits. Rather, dates preserve the body wastes from being spoiled and from rotting, especially for those who are used to eating dried dates." (Healing with the Medicine of the Prophet, Translated by Abd el-Qader bin Abd el-Azeez, Dar al-Ghadd al-Gadeed, al-Mansoura (Egypt), 2003 p.121)

আরও কয়েকটি বর্ণনা দেওয়া হল,

"সা‘দ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসলেন এবং আমার বুকে তাঁর হাত রাখলেন। আমি আমার হৃদয়ে তাঁর হাতের শীতলতা অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি বললেনঃ তুমি হৃদরোগী, তুমি সাকীফ গোত্রের হারিস ইবনু কালাদাহর নিকট যাও; কারণ সে এসব রোগের চিকিৎসা করে। সে যেন মদীনার আজওয়া খেজুর থেকে সাতটি খেজুর নিয়ে বীচিসহ চূর্ণ করে সেগুলো তোমার মুখে ঢেলে দেয়।"

[সুনান আবু দাউদ (তাহকিককৃত) ৩৮৭৫]

যদিও এই বর্ণনাটি একটি যঈফ বা দুর্বল বর্ণনা, তবুও আলি (রাঃ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি সাতটি আজওয়া খেজুর প্রতিদিন আহার করে, তার পাকস্থলীর প্রতিটি রোগ নির্মূল হয়ে যায়।" (কানজুল উন্মাল, হাদিস ২৮৪৭২)

এসব থেকে দেখা যায়, এগুলো হৃদরোগ ও পাকস্থলীর পীড়া নিরাময়ে ভূমিকা পালন করে।

আর আমাদের নিকট বৈজ্ঞানিক প্রমাণও[১] রয়েছে যে, খেজুর ধমনীসমূহ (arteries) সুরক্ষিত করে এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায়। কোলেস্টেরল নিজেই এক ধরনের উপবিষ (toxin)[২] যা হৃদরোগজনিত সমস্যা উৎপন্ন করে। অধিকন্তু খেজুরের কিছু উপাদান হৃদমজানিত সমস্যার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করে যেমন, dietary fiber সাহায্য করে human intestinal toxic substances দূরীভূত করতে যেমনটা গবেষকরা বলে থাকেন।[৩]

যাদু: যাদুর ক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনা থাকতে পারে। যদি এটি আক্ষরিকভাবে যাদুর কোনো প্রসঙ্গ হয় যা পূর্বে ছিল এবং যা জানা যায়, তাহলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে এ সম্পর্কে আমরা খুব বেশি বলতে পারব না। আমার সর্বাধিক জানা মতে, এটি নিয়ে পশ্চিমা বিজ্ঞানের ধারণা সন্দেহপ্রবণ যার কোনো প্রকৃত মূল্য নেই।

এটাও হতে পারে যে, এখানে নিছকই কিছু রোগ এর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যা আপাতভাবে অজানা বিষয়সমূহের কারণে উৎপন্ন এবং যাকে এহেন প্রকাশভঙ্গিতে ব্যক্ত করা হয়েছে সেই সময়ের অবস্থা বিবেচনা করে, যে সময়ে এই উক্তি করা হয়েছিল।

"শিহ'র" (Sihr) এর প্রচলিত একটি অর্থ হল "it changes health and soundness to disease" (see E.W. Lane's Lexicon Book I p.1316) যার মানে দাঁড়ায়, "এটি স্বাস্থ্য এবং সুস্থতাকে রোগে পরিণত করে" এবং সেক্ষেত্রে এটি হবে নিছকই কোনো বিষয়ের প্রসঙ্গ যা রোগের উদ্ভবের জন্য দায়ী, যেমনভাবে উপবিষ (toxin) শব্দের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বোঝানো হয়ে থাকে

বিষ (poison) এবং বিভিন্ন বর্ণনায় তার ইঙ্গিত দেওয়া হয় "অথবা" ("or") শব্দের দ্বারা। এটা কোনো নির্দিষ্ট বিকিরণ এর প্রসঙ্গও হতে পারে যা মানুষের শরীরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। আর আমরা জানি, খেজুরের নির্দিষ্ট কিছু উপাদান যেমন ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সেলেনিয়াম, জিঙ্ক, ভিটামিন সি ইত্যাদি বিকিরণসমূহের বিরুদ্ধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।[৫]

উপসংহার:

উপরিউক্ত বর্ণনায় দুটি সাধারণ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং হাদিসের বর্ণনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, আল-মদিনার আল-'আলিয়া অঞ্চলের আজওয়া খেজুর বিশেষভাবে এমনকি বিশেষ পরিবেশে অধিক উপকারী।



উপবিষ (toxin) এর ব্যাপারে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, খেজুরসমূহ প্রকৃত রোগ নিরাময়কারী। যাদুর ক্ষেত্রে আরও গবেষণার অবকাশ রয়েছে। তবে তা সত্ত্বেও উপরিউক্ত লেখনি হাদিসটি সম্পর্কে সন্দেহজনক মনোভাব দূর করার জন্য যথেষ্ট।

যারা হাদিসটি নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে, তারা আসলে তাদের কোনো ধারণাই এথেকে প্রমাণ করতে পারে না। তবে অন্ততপক্ষে আমাদের গবেষণামূলক প্রবন্ধের সমর্থনে কিছু ন্যায্য পরিমাণ তথ্য আমাদের কাছে আছে।

হাদিসের বর্ণনা বলছে, পরপর ৭ দিন সকালে উঠে নিয়মিত খালি পেটে আল-আলিয়ার আজওয়া খেজুর খেলে সেটি উপবিষ (toxin) এর বিরুদ্ধে আরোগ্য হিসেবে কাজ করে, ঠিক তেমনভাবেই যেমনভাবে সেগুলি হৃদরোগ এবং পেটের সমস্যার বিরুদ্ধেও প্রতিষেধক হিসেবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আসুন অভিযোগখানা এবার ঘুরিয়ে দেওয়া যাক!

যদিও উপরের ব্যাখ্যা একজন উৎসাহী ও ন্যায়সঙ্গত দ্রষ্টার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু তবুও ঘৃণার ব্যবসাপাতা খ্রিস্টান মিশনারির লোকজনদের জন্য এসকল লাইনের ওপর আমার একখানা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আর চ্যালেঞ্জটি হল "যে কোনো প্রাণনাশকারী দ্রব্য" পান করা এবং অক্ষত অবস্থায় থাকা। এটা হল সেই বিষয় যার প্রতিশ্রুতি বাইবেল প্রদান করেছে যীশুর (ঈসা আলাইহিস সালাম) মুখনিঃসৃত বাণীর মাধ্যমে। "তারা হাতে করে সাপ তুলবে এবং প্রাণনাশের মত কিছু খেলেও তাদের কোন ক্ষতি হবে না; আর তারা অসুস্থ লোকের ওপর হাত রাখলে তারা সুস্থ হয়ে যাবো" (বাইবেল, মার্ক, ১৬:১৮)

“They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.” (KJV, Mark 16:18)

আমি সর্বদা অবাক হই এটা ভেবে যে, ইসলামবিদ্বেষী মিশনারিদের কীভাবে সাহস সঞ্চয় হয় ইসলাম সম্পর্কে কথা বলার! একবারও কি তারা নিজেদের বিষয়গুলো পিছন ফিরে দেখে না?

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: (এই লেখনির মূল লেখক) তার কাছে ঋণী।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই ভাল জানেন।

তথ্যসূত্র:

[১] <http://guide2herbalremedies.com/dates-protect-arteries/>

[২] <https://ezinearticles.com/...>

[৩] <http://en.ytyaoye.com/.../newsId=df4178ce-cc72-497a-beb0...>

[৪] <https://www.letmeturnthetables.com/.../understanding...>

[৫] <http://www.moondragon.org/health/disorders/radtox.html>

১৪০০ বছর আগে হযরত মুহাম্মদ সা: এর দেয়া চিকিৎসা পদ্ধতি:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে এসেছিলেন মানবজাতি কে এক আল্লাহ তায়ালা দিকে আহ্বান করার জন্য। রাসূল সা. মানব জাতিকে হেদায়েতের দিকে আহ্বান করার পাশাপাশি মানুষের দৈনন্দিন জীবন কিভাবে পরিচালনা করবে সেই পদ্ধতিও দেখিয়ে দিয়েছেন।

তার পরিপ্রেক্ষিতেই দেখিয়েছেন মানুষ অসুস্থ হলে কিংবা স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য কি ধরনের নিয়ম কানুন অনুসরণ করতে হবে।

চিকিৎসা পদ্ধতি

অনেকে অসুস্থাকে অভিশাপ হিসেবে মনে করে, আসলে অসুস্থতা আখিরাতে সফলতা অর্জনের জন্য একটি পরীক্ষা বিশেষ। কেননা আল্লাহ মানুষকে ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পদ, অসুস্থতা ও ফল ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করে।

এসব পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমানের কাজ। আজকে আমরা ১৪০০ বছর আগে হযরত মুহাম্মদ সা: এর দেয়া চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো।

জ্বর হলে ঠান্ডা পানি

ঠান্ডা পানিকে রাসূল সা. একটি চমৎকার চিকিৎসা হিসেবে বিবেচনা করতেন। তিনি জ্বর হলে মাথায় ঠান্ডা পানির পট্টি ব্যবহার করতেন। রাসূল সা. বলেন, জ্বর হল দোষখের তাপ, সুতরাং পানি দিয়ে ঠান্ডা করো। [১]

কঠিন আঘাতে লবণ-পানির চিকিৎসা

বিচ্ছু আর সাপের কামড়ের বিষ নামানোর জন্য রাসূল সা. লবণ ব্যবহার করতেন। রাসূল সা. কখনো ঔষধ ব্যবহার ত্যাগ করেননি কিংবা ঔষধের উপর অত্যধিক নির্ভর করেনি।

বিষাক্ততা নিরাময়ের জন্য রাসূল সা. বিষাক্ত স্থানে লবণ-পানি মালিশ করতেন। আবার এর সাথে রাসূল সা. কোরআনের আয়াত পড়তেন। [২]

রক্তক্ষরণ বন্ধে ছাই ব্যবহার

ওহুদ যুদ্ধের সময় আঘাতে রাসূল সা. এর মাথার রক্তে তার মুখমণ্ডল ভরে যায়। আলী রা: তাঁর বর্মের পানি এনে দিলেন আর ফাতিমা রা: তাঁর মুখমণ্ডল ধুয়ে দিলেন। ফাতিমা রা: দেখলেন রক্ত প্রবাহ বেড়ে যাচ্ছে।

তখন তিনি খেজুর পাতার পাটি পোড়ালেন আর তার ছাই রাসূল সা. এর ক্ষতস্থানের উপর প্রলেপ দেন। এরপর রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। [৩]

এই হাদিস দ্বারা খুব সহজেই ছাইয়ের উপকার অনুমেয় হয়।

শিঙ্গা লাগানো

শিঙ্গা লাগানো হলো একটি ছোট অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে দেহ হতে দূষিত রক্ত বের করে দেয়া। বর্তমান যুগে এই চিকিৎসা খুব একটা হয় না। কিছুদিন আগেও বেদের

মেয়েরা শিঙ্গা লাগাতেন। তবে চীনে এই চিকিৎসা যৎসামান্য পরিবর্তন করে করা হয় যা আকুপাংচার নামে পরিচিত।[২]

রাসূল সা. বলেন তিনটি জিনিসের চিকিৎসা আছে মধু, শিঙ্গা লাগানো এবং আগুনের সেকা। তবে আমি আমার উম্মতকে আগুনের সেকা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছি।[৪]

রোগের জন্য অস্ত্রোপচার

আলী ইবনে আবি তালিব রা: বলেন জনৈক রোগীকে দেখতে যাওয়ার সময় আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। রুগি ব্যক্তির কোমর ফুলে যায়। লোকজন বলাবলি করছিল যে এর ভিতরে পুঁজ আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ফোঁড়ার উপর অস্ত্রোপচার করতে বলেন। আমি তাঁর উপস্থিতিতে সাথে সাথে ঐ লোকটির ফোঁড়ায় অস্ত্রোপচার করি।[৫]

বোঝা যায় আলী রা: ছোটখাটো অস্ত্রোপচারের দক্ষ ছিলেন, তা না হলে তিনি তাৎক্ষণিক ভাবে এই অস্ত্র প্রচার করতেন না।

ঔষধ হিসাবে গরুর দুধ

আরবের লোকেরা দুটি জিনিস উটের দুধ আর খেজুর এর জন্য গর্ভবোধ করে। এর যথেষ্ট কারণও রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা রাসূল সা. কে বলতে শুনেছেন, “তোমাদের গরুর দুধ পান করতে হবে কারণ এর মধ্যে ঔষধি গুণ আছে। দুধের তৈলাক্ত পদার্থের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে তবে এর মাংস রোগ সৃষ্টি কারক।” [৫]

দুধ খাদ্য আর পানীয়ের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। গরুর দুধ মহিষ, ভেড়া এবং ছাগলের দুধের চাইতে উত্তম ও সুস্বাদু পানীয়। এটা মহিষ, ছাগল এবং ভেড়া দুধের চেয়েও ভাল।

গরুর দুধ অনেক রোগের ঔষধ হিসেবে কাজ করে। চিকিৎসকগণ গরুর দুধকে রোগের স্বাস্থ্যহানির পর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ঔষধ হিসাবে গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকে।

দুধের বেশ কিছু উপকারিতা:

- দুধ দাঁত ও হাড়ের গঠন মজবুত করে।
- মানসিক চাপ ও নিদ্রাহীনতা দূর করে।
- কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।
- মাংসপেশি গঠনে সাহায্য করে।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- বুক জ্বালাপোড়া ও পাকস্থলী ঠান্ডা রাখে দুধ। [৬]

ঔষধ হিসাবে কালোজিরা

কালোজিরা কে সর্বরোগের ঔষধ বলা হয়। রাসূল সা. বলেন, “মৃত্যু ছাড়া সর্ব রোগের চিকিৎসা আছে কালোজিরাতে” [৭]

তাই আশাকরি কালোজিরার গুরুত্ব নিয়ে আর কিছু বলতে হবে না। এছাড়া কালোজিরার বেশ কিছু উপকারিতা:

- ত্বকের বিভিন্ন রোগ দূর করতে দারুণ উপকারী কালোজিরা।
- মাথাব্যথা দূর করে কালোজিরা।
- ওজন এবং রক্তচাপ সামলাতে সাহায্য করে কালোজিরা।
- হাড়ের ব্যথা ও দাঁত শক্ত করে কালোজিরা।
- স্মৃতিশক্তি ও অ্যাজমা দূর করে কালোজিরা।
- ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
- এছাড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। [৮]

ঔষধ হিসাবে মধু

মধুকে স্বয়ং আল্লাহ তায়লা পবিত্র কুরআনে ঔষধ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন,

“তার (মৌমাছির) উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য” [৯]

মধু কেবল ঔষধ হিসাবে নয়, পানীয় হিসাবেও পান করা যায়। মধু পান এর মাধ্যমে চিকিৎসা একটি সুপরিচিত চিকিৎসা পদ্ধতি সকালে খালি পেটে মধু খেলে অনেক রোগ সেরে যায়। মধুর সাথে পানি মিশাতে হয় সারা রাত্রি নির্জীব ভাবে কাটানোর পর ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্য মধু মিশ্রিত পানি পান করতে হয়।

রাসূল সা. সাধারণত সকাল বেলা খালি পেটে এর চিকিৎসা গ্রহণ করতেন। মধু ক্ষুধা বৃদ্ধি করে তিনি সকালের নাস্তা খেতেন। আসরের নামাজের পরে ওই রকম পান করতেন।

চর্ম রোগে মধু ব্যবহার করতেন। তিনি পোড়া ও চর্ম রোগের স্থানে মধু মালিশ করে দিতেন। রাসূল সা. নিয়মিত মধুপান করতেন আর মধুর প্রশংসা করতেন।

রাসূল সা. বলেন কোন ব্যক্তি মাসে তিন দিন সকালে মধু পান করলে তার গুরুতর কোন সমস্যা হবে না [১০]

মধুর বেশ কিছু উপকারিতা

- রক্তচাপ দূর করে মধু।
- দাঁতের ব্যথা দূর করে।
- রূপচর্চা এবং যৌবন ফিরিয়ে আনতে মধুর উপকারিতা অনস্বীকার্য।
- কাশি ও ঠান্ডা দূর করে মধু।
- ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে মধু।
- কোষ্ঠকাঠিন্য ও নিদ্রাহীনতা দূর করে মধু[১১]

ঔষধ হিসাবে খেজুর

খেজুরের ব্যাপারে নতুন করে কিছু বলার নেই। প্রত্যেক মুসলমান খেজুরের উপকারিতা সম্পর্কে জানে। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানও খেজুরের উপকারিতা স্বীকার

করেছে। যাই হোক খেজুর সম্পর্কে রাসূল সা. কি বলেছেন সে সম্পর্কে জানা থাকা জরুরি। রাসূল সা: বলেন,

“যে ব্যক্তি দৈনিক সাতটি আযওয়া খেজুর খাবে সে সেদিন কোন বিষাক্ত রোগে কিংবা জাদুমন্ত্রে আক্রান্ত হবে না” [১২]

অন্যত্র বলেন,

“আযওয়া বেহেশতি ফল, এতে বিষ জাতীয় রোগ আরোগ্য হয়” [১৩]

খেজুরের বেশ কিছু উপকারিতা

- খেজুর শক্তি বৃদ্ধি এবং দুর্বলতা দূর করে।
- ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে।
- কোষ্ঠকাঠিন্য এবং হজম শক্তি বৃদ্ধি করে।
- রুচি বৃদ্ধি ও রক্তস্বল্পতা দূর করে।
- হৃদরোগ ও কলেস্টেরল থেকে মুক্তি দেয়। [১৪]

রাসূল সা. নিজে যেমন খেজুর খেতেন তেমনি তাঁর উম্মতকেও এর উপকারিতা বর্ণনা করেন।

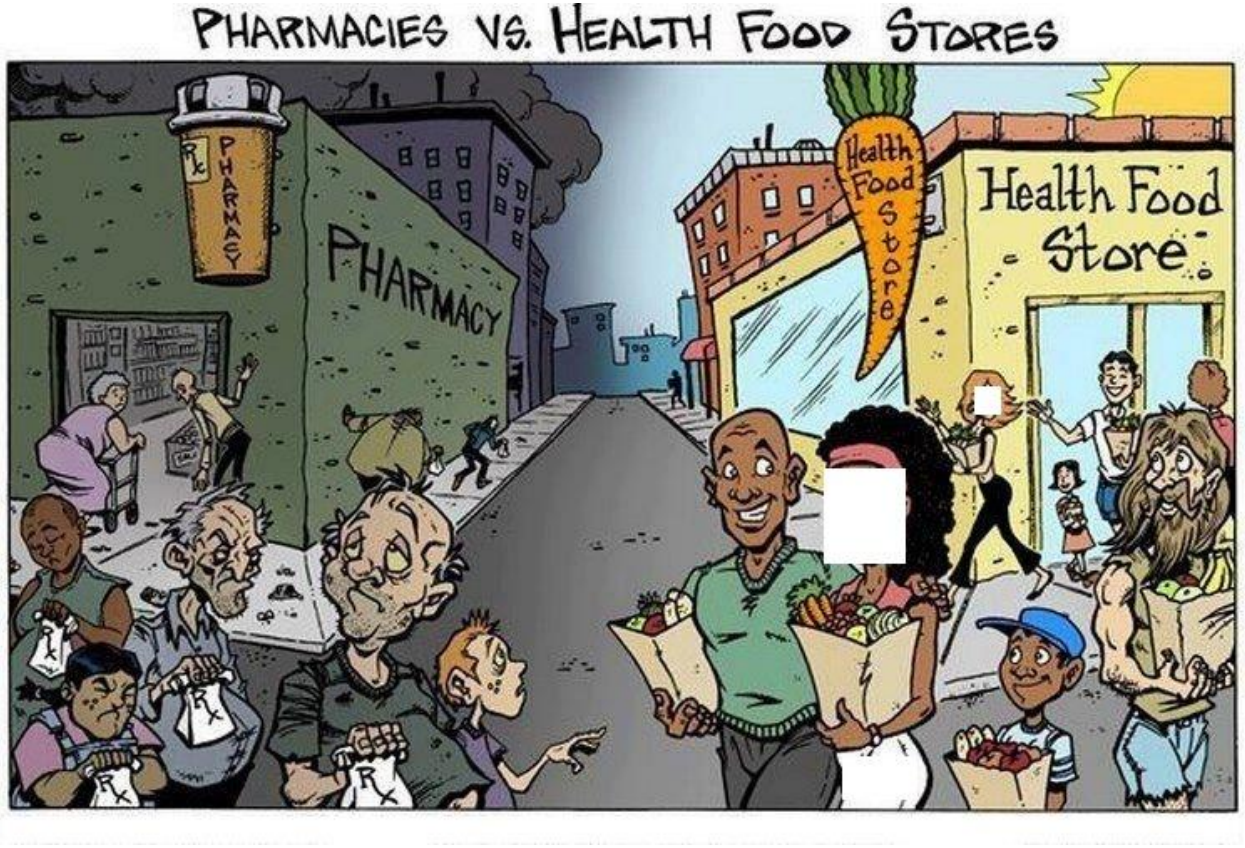
শেষ কথা

উপরে উল্লেখিত পদ্ধতি ব্যতীত চিকিৎসার জন্য আরও অনেক পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। ১৪০০ বছর আগে রাসূল সা. চিকিৎসা যুগান্তকারী কিছু পদ্ধতি উম্মতকে দিয়ে দেন যা বর্তমান আধুনিক যুগের জন্য এক বিস্ময়কর বিষয়।

সূত্র:

১. সহিহ আল বুখারী ৭ম খন্ড হাদিস নং – ৬১৯
২. মহানবী সা: এর আদর্শ ও বিজ্ঞান – মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান তালুকদার
৩. সহিহ আল বুখারী হাদিস নং – ৬১৮
৪. সহীহ বুখারী ৭ম খন্ড ৫৮৬, ৫৮৭
৫. যাদুল মা’আদ
৬. সমকাল ৩১ জুলাই ২০১৭

৭. সহিহ আল বুখারি হাদিস নং-৫৯২
৮. কালের কণ্ঠ অনলাইন ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬
৯. সূরা নাহল: ৬৯
১০. সহিহ তিরমিজি হাদিস নং – ৪৫৭০
১১. দৈনিক ইনকিলাব ৮ জুন, ২০১৬
১২. সহিহ আল বুখারী খন্ড ৭ হাদিস নং – ৩৫৬, ৬৬৩, ৬৭১
১৩. সহিহ তিরমিযী হাদিস নং ৪২৩৫
১৪. বাংলাদেশ প্রতিদিন ১২ অক্টোবর, ২০১৭



R:M: এই কিতাবটিতে প্রত্যেকটি সমস্যার পাশাপাশি পূর্ণ সমাধানও তুলে ধরা হয়েছে। তাই সমস্যা কে বুঝতে পেরে সমাধান অনুযায়ী জীবনকে গঠন করে নিলে, আশা করা যায় অনেকাংশে দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচা যাবে ইনশাআল্লাহ। তাই আসুন, আমরা না পারলেও আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে দাজ্জালি শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও চিকিৎসা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন।

উপসংহার:

প্রথমে চেয়েছিলাম একটাই কিতাব বানাবো। কিন্তু দাজ্জালি ফেতনা এতো ব্যাপক যে, একটায় আনা সম্ভব হয়নি। ফলে ৩ খন্ড হয়েছে। কিন্তু আফসোস, এ খন্ডেও শেষ করতে পারলাম না। আরো একটি খন্ড বানাতে হবে।

বিজ্ঞ পাঠক নিশ্চই খেয়াল করেছেন, এই কিতাবটিতে প্রচ্ছদের ২ টি বিষয় আসেনি। ধর্ম ও অন্যান্য। আসলে আনতে পারিনি। কারণ এগুলোতেই প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা হয়ে গেছে। তাই, ওই ২ টিপিকে ৪র্থ খন্ড বানাবো, ইনশাআল্লাহ। দোয়ার দরখাস্ত। জাযাকুমুল্লাহু খাইর।

-THE END-